মরিয়ম জামিলা

ফিলিস্তিনের আকাশ

ভাষান্তর

হোসেন মাহমুদ

ফিলিস্তিনের আকাশ

মরিয়ম জামিলা

ভাষান্তর

হোসেন মাহমুদ

ঝিঙেফুল ◆ ঢাকা

প্রকাশকের নিবেদন

২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। 'ফিলিস্তিনের আকাশ'-এর প্রকাশনা বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, সুহৃদবর বিশিষ্ট কবি ও লেখক মুকুল চৌধুরী। তিনি আমাকে বলেন, আপনার ঝিঙেফুল তো উন্নত মানের বই প্রকাশ করে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। একটি ভালো অনুবাদ উপন্যাস আছে। বের করতে রাজি থাকলে পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারি। আশা করি, এক চমৎকার প্রকাশনা হবে এটা। বললাম, ঠিক আছে দেখাবেন। একদিন তিনি পাণ্ডুলিপিটি দিলেন। নেড়ে চেড়ে দেখলাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মরিয়ম জামিলার লেখা উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন হোসেন মাহমুদ। নাম 'ফিলিস্তিনের আকাশ'। বিশ শতকের অন্যতম মানবিক ট্রাজেডির শিকার ফিলিস্তিনিদের নিয়ে ইহুদী ষড়যন্ত্র, জন্মভূমি থেকে তাদের নির্মমভাবে বিতাড়ন, তাদের উদ্বাস্তু, জীবন, ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তির লড়াইকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের কাহিনী মর্মস্পর্শী, অনুবাদকের ঝরঝরে অনুবাদ, সর্বোপরি মরিয়ম জামিলার মত বিশ্বখ্যাত মহিলার লেখা উপন্যাস। সিদ্ধান্ত নিলাম–বইটি আমি প্রকাশ করব। ক'দিন পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গেলাম। জনাব মুকুল চৌধুরীর সাথে দেখা হল। আমার সিদ্ধান্তের কথা তাকে জানালাম। তিনি বললেন, অনুবাদককে চেনেন? বললাম – না। বললেন, আসুন, আলাপ করিয়ে দেই।

অনুবাদকের সাথে আলাপ হল। জনাব হোসেন মাহমুদ একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। অনেক দিন থেকে লেখালেখি করছেন। ইতিমধ্যে মৌলিক, সম্পাদনাগ্রন্থ মিলিয়ে এগারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ফিচার ও কলাম লিখে থাকেন। অনুবাদেও অত্যন্ত ভালো হাত তাঁর। একটি গবেষণাগ্রন্থ, এ উপন্যাস এবং বেশ কিছু গল্প ও কবিতা তিনি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর আরো একটি পরিচয় জানালেন মুকুল চৌধুরী। জনাব হোসেন মাহমুদ বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত কবি-সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর দৌহিত্র। সমৃদ্ধ পারিবারিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যে স্নাত এ লেখক নিজের লেখালেখির ক্ষেত্রে সুস্থ ধারা ও রুচিকে লালন করে চলেছেন। যাহোক, 'ফিলিস্তিনের আকাশ' উপন্যাসটি একুশে বই মেলা ২০০৬-এ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলাম। তদনুযায়ী তা প্রকাশিত হল। ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী ও তাদের মুক্তি সংগ্রাম ভিত্তিক আর কোন উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সে হিসেবে এ অনুবাদ উপন্যাসটির বিশেষ মূল্য রয়েছে বলে মনে করি। আশা করি 'ফিলিস্তিনের আকাশ' দেশের পাঠকদের সমাদর লাভে সক্ষম হবে।

– প্রকাশক

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আমি তখন তোপখানা রোডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা বিভাগীয় অফিসে কাজ করি। ১৯৮৬ সালের কথা। এ অফিসের লাইব্রেরিতে বাংলা-ইংরেজি অনেক বই ছিল। ইংরেজি বইয়ের প্রতি বরাবরই আমার আগ্রহ কম। তবু দু' এক সময় ইংরেজি বইয়ের শেল্‌ফগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বই কৌতূহল নিয়ে দেখতাম। এভাবেই একদিন চোখে পড়ল বইটি ঃ আহমদ খলিল। বড় করে ছাপা নামের নিচে ছোট টাইপে লেখা-স্টোরি অব এ প্যালেস্টেনিয়ান রিফিউজি এ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি। পাকিস্তানের লাহোর থেকে বইটি প্রকাশিত। প্রকাশক ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স। প্রকাশকাল ১৯৬৮। পেপার ব্যাক কভার, দু' রঙের প্রচ্ছদে লেলিহান আগুনে জ্বলছে বাড়ি-ঘর। নিঃসন্দেহে কাঁচা হাতের কাজ। সুতরাং প্রচ্ছদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কোন পাঠক যে বইটি নেড়ে চেড়ে দেখবে-এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সে রকমই হতে যাচ্ছিল। কিন্তু লেখকের নামের দিকে চোখ পড়তেই আমি বইটির প্রতি আগ্রহ বোধ করলাম– মরিয়ম জামিলা। তাঁর সম্পর্কে আমার যৎসামান্য জানা ছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মরিয়ম জামিলা একজন আমেরিকান। তাঁর আসল নাম মার্গারেট মার্কুইস - ইহুদী পরিবারে জন্ম। তরুণী অবস্থায়ই তিনি ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হন। পরবর্তীতে বসবাসের জন্য পাকিস্তানে চলে আসেন তিনি। ইসলাম বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। তো, মরিয়ম জামিলার মত প্রখ্যাত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ফিলিস্তিনিদের জীবন সংগ্রাম ভিত্তিক একটি উপন্যাস লিখেছেন দেখে আমি খুব বিস্ময় বোধ করি। প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায় এ উপন্যাস সম্পর্কে তৎকালীন 'পাকিস্তান রিভিউ' ও 'দি ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকার মন্তব্য ছাপা যাতে উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। বইটি ইস্যু করে নিয়ে পরবর্তী কয়েকদিন তাতে চোখ বুলিয়ে মনে হল – এটি অনুবাদ করলে মন্দ হয় না। তারপর কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে অনুবাদের কাজ চলতে থাকে। কিছুদূর এগোনোর পর লক্ষ্য করলাম, মরিয়ম জামিলা ফিলিস্তিনি জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করে তার মূল স্পন্দনটিকে নিজের কলমে তুলে নিয়েছেন। তারপর এ উপন্যাসের কাহিনী একটি আকাশের বিশালতা নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে যার সামিয়ানাতলে গাছের চারার মতই বেড়ে উঠেছে কিছু মানুষ – শেখ ইসহাক বিন ইবরাহিম, মালেক ওহাব, ইউসুফ মালিক, মনসুর, আহমদ খলিল, আসমা, রশিদ, খলিফা, ইসমাইল, আবদুর রাজিক প্রমুখ। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আহমদ খলিল। মূলত উপন্যাসটি তারই জীবন কাহিনী। আর তাকে কেন্দ্র করেই ফিলিস্তিনিদের জীবনের চালচিত্র, ইহুদী আগ্রাসনের মুখে মরণপণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, ফিলিস্তিনি তথা আরবদের ইহুদী বিরোধী লড়াইয়ে ব্যর্থতার কারণ, তাদের উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা ও দুর্ভোগ, দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে

আহমদ খলিলের মদীনা গমন, সেখানে অপরিচিত পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু, খলিফার ক্ষণস্থায়ী জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া, ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে তার স্বপ্ন ভঙ্গ, পোষ্যপুত্র আবদুর রাজিককে দিয়ে অপূর্ণ স্বপ্নপূরণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে তার জীবনের শেষমুহূর্তটি ঘনিয়ে আসার মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন লেখিকা। দেখা যায়, মরিয়ম জামিলা তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদেরকে জীবনের ঝড়ো বাতাসের প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন যারা কেউই প্রায় কখনোই পরিপূর্ণ স্থিরতা বা স্বস্তির দেখা পায় নি যা কিনা ফিলিস্তিনিদের জাতীয় জীবনের এক শতাব্দীর অনিশ্চয়তার ইতিহাসকেই মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে ১৯৬৭'র আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালকে তিনি মোটামুটিভাবে তুলে এনেছেন। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের চিরায়ত মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব ইত্যাদিও তার নজর এড়ায়নি। এ উপন্যাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে লেখিকা প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয় ও বক্তব্যের প্রয়োজনে অন্য কিছুর দ্বারস্থ না হয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন যা প্রকারান্তরে এ উপন্যাসকে এক ভিন্ন স্বাদ ও মর্যাদা দিয়েছে। সব মিলিয়ে এ উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে এক সরল, ঋজু অথচ অসাধারণ আবেদন যা সকলের হৃদয়কেই গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়।

তখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের জাতীয় জীবনের ভয়াবহ বিপর্যয় ও তাদের দুর্বার মুক্তি সংগ্রাম নির্ভর কোন উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে কিনা, তা আমার জানা ছিল না। যাহোক, ঐ সময় মাসিক 'কলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। তাকে উপন্যাসটির কথা জানাতেই তিনি তার পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশ করতে সম্মত হন। তদনুযায়ী ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রতি মাসে 'কলম' পত্রিকায় ছাপা হয়। সে সময় কোন কোন পাঠক পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখে উপন্যাসটির বিপুল প্রশংসা করেন।

'কলম'-এ ছাপা শেষ হওয়ার পর একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ অনুবাদ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোন সুযোগ হয় নি। অবশেষে ২০০৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বন্ধুপ্রতীম বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক মুকুল চৌধুরী বইটি প্রকাশের ব্যাপারে ঝিঙেফুল প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী গিয়াসউদ্দীন খসরুর সাথে আলাপ করেন। পরে তার সাথে আমারও কথা হয়। ২০০৫ সালের একুশে বই মেলায় উপন্যাসটি প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি। তবে অনিবার্য কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। এবার ২০০৬ সালের একুশে মেলায় বইটি প্রকাশিত হল। এ জন্য আমি উভয়কেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

হোসেন মাহমুদ
৪৩৯, উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা-১২১৭

১.

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। বিদায়ের আগে সারা আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে রঙের গাঢ় আলপনায়। নীরবে বসে প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ চেয়ে চেয়ে দেখছিল আহমদ খলিল। তার দৃষ্টি নেমে আসে নিচে। সামনে যতদূর চোখ যায় – ছড়িয়ে আছে ফসল ভরা মাঠ। দু'এক দিনের মধ্যেই ফসল তোলার কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রতিদিন এ সময়টায় এসে এখানে বসে থাকে আহমদ খলিল। তার মনে হয় – ঐই ফসল ভরা বিশাল প্রান্তরটি যেন এখনো তাদেরই আছে। তার মনে পড়ে পবিত্র কুরআনের বাণী –

"এবং (হে মুহাম্মদ!) তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক ও প্রাণহীন, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"

প্রত্যেক বছরই আল্লাহর তরফ থেকে অলৌকিক রহমত হিসেবে এ বৃষ্টিপাত হতে দেখে আহমদ খলিল। শীতের শেষে বিরান মাঠ বিকশিত হয়ে ওঠে অফুরান সবুজের সমারোহে। সেই দ্রুত বেড়ে ওঠা সবুজের রংয়ে খুব তাড়াতাড়িই আবার পরিবর্তন ঘটে। চারদিকে তখন সোনারং আভার ঝলমলানি। মাঠের পর মাঠভরা পাকা ফসলের সোনালি রঙের কাছে আসল সোনাও যেন একান্ত তুচ্ছ মনে হয় আহমদ খলিলের। এ সোনার আরেক অর্থ জীবন। বিগত বছরগুলোর কথা মনে পড়ে তার। নিজে, এক চাচার ছেলে এবং আরো কয়েকজন ফেলাহীন (কৃষক) কে সঙ্গে নিয়ে খাবার সংগ্রহের জন্যে কি দুঃসাহসিক কাজই না করত তারা। প্রায়ই, রাতের আঁধারে ইহুদীদের দেয়া কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে তারা প্রবেশ করত দখলীকৃত এলাকায়। একবার ইহুদী সৈন্যরা তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। সাথে সাথে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। মেশিন গানের অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাঝে সেদিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই কঠিন হয়ে উঠেছিল। আহমদ খলিল ভেবে পায়নি, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের এ ক্ষুদ্র ভূখন্ড, যা তাদের (জীবিকা) পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, ইহুদীরা তা কি করে নিজেদের বলে দাবি করতে পারে?

অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে, আহমদ খলিল বসে থাকে নীরবে। সে ক্রমশঃ–ডুবে যেতে থাকে অতীত দিনের গভীরে। সব ঘটনাই তার মনে স্মৃতি হয়ে জমে আছে। তার এই সতেরো বছরের জীবনে ঘটনাতো কম ঘটেনি। এ বছরগুলোতে গোত্রের তিনশো'রও বেশি মানুষকে তারা হারিয়েছে। সে নিজে, তার ভাই, চাচা-চাচী ও তাদের ছেলে রশিদ এবং মামাতো বোন আসমা ছাড়া তার গোত্রের আর কেউ বেঁচে নেই। একদিকে অনেকটা দূরে, মরুভূমির মধ্যে আবছাভাবে তার নজরে পড়ছিল চ্যাপ্টা ছাদের ঘরগুলো। দেখতে অনেকটা তার নিজেরই গ্রামের মতো যা গুঁড়িয়ে দিয়েছে হানাদার ইহুদীরা। আহমদ খলিলের মনে হয় –যদিও এখান থেকে অনেক দূরে, তবুও ফেলে

আসা নিজের গ্রামের ছবিটা সে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে প্রসারিত দিগন্তের শেষে নেগেভের মরুভূমি। পাথর আর মোটা বালিতে ভরা সে মরু প্রান্তরে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত সূর্য সারাদিন আগুন ঢেলে যায় অবিশ্রান্ত ধারায়। কোথাও একটি গাছ কিংবা এক গোছা ঘাসেরও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। নেগেভ ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে নেফুদ অঞ্চল। আহমদ খলিলদের বাস্তুভিটা ছিল সেখানেই। তেরশ' বছর আগে আজকের সউদী আরব থেকে মুসলিম বিজয়াভিযানে অংশ নিয়ে ফিলিস্তিনে এসেছিলেন তার পূর্বপুরুষেরা। পরে এখানেই তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সময় স্থানীয় বহু খৃষ্টান তাদের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আরো পরে, ক্রুসেডে পরাজিত, এদেশে বসবাসে আগ্রহী বহু ক্রুসেডারও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধনে মিশে একীভূত হয়ে যায় তাদের গোত্রের সাথে।

নেফুদ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর আহমদ খলিলের পূর্ব-পুরুষরা জীবিকার পেশা হিসেবে কৃষিকাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী ধরে তারা ফেলাহীন (কৃষক), কৃষিকাজ তাদের পেশা। আর এ পেশা অবলম্বনের জন্যে অপরাপর মরুবাসী গোত্র ও শহরবাসীদের কাছে তারা ছিল উপেক্ষিত ও ঘৃণিত। কিন্তু কৃষিকাজের সুকঠিন পরিশ্রমে কড়া পড়ে যাওয়া হাত, পোশাক, ব্যক্তিত্ব, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির জন্যে মরুচারী বেদুইনদের থেকে তাদের আলাদা মনে হত না। অন্যান্যদের উপেক্ষা ও ঘৃণা সত্ত্বেও তাদের গোত্রের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। আর এ জন্যই, আগের তুর্কী শাসনকালে কিংবা কিছুকাল পূর্বের বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরি শাসনব্যবস্থায়ও তাদের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়নি। তাদের শাসক ছিল তারা নিজেরাই এবং যে কোন শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের ক্ষেতের ফসল, ভেড়ার পাল, ছাগল এবং উটগুলোকে রক্ষা করতে তারা নিজেরাই ছিল যথেষ্ট।

আহমদ খলিলের চোখের সামনে এ মুহূর্তে ভেসে ওঠে তার ফেলে আসা গ্রাম ইরাক আল-মানশিয়ার সবুজ গম এবং যবের চারা, মসুর, পিয়াজ ও শস্য ক্ষেতের ছবি। মায়ের কথা মনে পড়ে তার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মায়ের মুখটি মনে আনতে পারে না সে। এমন কি তার কণ্ঠস্বরও স্মরণ করতে পারে না। তার শুধু মনে পড়ে, সংসারের অজস্র, আয়াসসাধ্য কাজ সম্পাদনের জন্যে তার মায়ের কঠোর পরিশ্রমের কথা। সংসারের কঠিন ভার বহন করতে মায়ের মুখে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার যে ছাপটি সে আঁকা দেখতে পেত–তা আহমদ খলিলকে মনে করিয়ে দিত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিনী হযরত খাদিজার (রা) কথা। তার মায়ের নামও ছিল খাদিজা। এ জন্যে সে খুবই গর্ববোধ করত।

আহমদ খলিলের শৈশবের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সে দিনগুলোতে কখনোই সে তার মায়ের কাছ ছাড়া হয়নি। তার মা শিশুকাল থেকেই, যেখানেই হোক না কেন, যাবার বেলায় শিশু আহমদ খলিলকে সাথে নিয়ে যেতেন। একেবারে ছোট্ট অবস্থায় কাপড়ের দোলনায় এবং পরে তাকে কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন তিনি। এমনকি, গাজা শহর থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন–লবণ, ম্যাচ, কাঁচা তুলা,

সেলাইয়ের সূঁচ এবং স্বামীর রাইফেলের বুলেট সংগ্রহের জন্যে যখন তিনি জরুরী ভিত্তিতে নিজের তাঁতে কাপড় বুনতেন, তখনো আহমদ খলিলকে চোখের আড়াল করতেন না তিনি। শিশুটি কোন কারণে হঠাৎ কেঁদে উঠলে সাথে সাথে হাতের সব কাজ ফেলে তাকে কোলে তুলে নিতেন খাদিজা। স্তন মুখে দিয়ে থামিয়ে দিতেন তার সকল কান্না। এরপর মৃদু দুলুনিতে আহমদ খলিলকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দিতে কালেমা পড়তে থাকতেন তিনি। আর কখনো খাদিজা একান্তই ছেলেকে কোলে নিতে না পারলে আব্বা, চাচা অথবা চাচীদের কারো না কারো কোলে সে আশ্রয় পেত।

কিন্তু দু'বছর বয়স থেকে আহমদ খলিল আর মায়ের বুকের দুধ খুব একটা পায়নি। খাদিজাকে এ সময়ই সারাদিনই কাজ করতে হত মাঠে গিয়ে। কখনো ক্ষুধায় আহমদ খলিল তীব্র চীৎকার শুরু করলে আশ-পাশের কোন মহিলা এসে তাকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে যেত। কিন্তু এ অবস্থাও বেশিদিন চলেনি। প্রায়ই সে দুধ খেতে পেতনা, খাদিজাও শিশু বড় হয়ে ওঠার জন্যে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। এ সময় আহমদ খলিলকে ধীরে ধীরে তেলে ভেজানো রুটি, সিদ্ধ পিঁয়াজ অথবা কাঁচা শসা খাওয়া শিখতে হয়।

মাঠের কাজের অবসরে খাদিজা আহমদ খলিলকে জোর করে হাঁটতে শেখানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু এক পা, দু'পা এগিয়েই সে হুমড়ি খেয়ে পড়তো মাটির ওপর। অন্য ছেলে-মেয়েরা এ সময় তাকে উৎসাহ দিত। ফেরার সময় বড় এক ঝুড়ির মধ্যে তাকে বসিয়ে মাথায় তুলে নিয়ে নীরবে ঘরে ফিরতেন খাদিজা।

মালেক ওহাব, আহমদ খলিলের আব্বা– ঘরে ফেরা মাত্রই দরজায় তাকে দেখে সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করত। মাসুম শিশুটির দু'টি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো গভীর আনন্দে। আব্বা! আব্বা! বলে কচি গলায় সে শোরগোল শুরু করে দিত। সে উচ্ছল ডাকের 'আওয়াজে' সারা ঘরের জমাট নীরবতা দেয়ালের ফাঁক-ফোঁকর গলে বেরিয়ে যেত বাইরে। মালেক ওহাব ছেলের ডাকে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি হাতের জিনিসপত্র নামিয়ে তাকে কোলে তুলে নিতেন। তার বিশাল বুকের উষ্ণ উত্তাপে ও গভীর আদরে তিনি ভরিয়ে দিতেন, শিশুটিকে। সে মুহূর্তে তার প্রতিটি আচরণেই সন্তানের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠত।

২.

আহমদ খলিল যে বেঁচে থাকবে–তার পরিবারের কেউই এ কথা ভাবতে পারেনি। তার জন্মের আগে তিন ভাই ও এক বোন এবং জন্মের পরে আরো দু'টি ভাই ও বোন তার মায়ের বুক শূন্য করে ঢলে পড়েছে হিমশীতল মৃত্যুর কোলে। জন্মের পর থেকেই শরীরে বাসা বাঁধা অসুস্থতা ও দুর্বলতার জন্যে তারা কেউই শৈশবের সীমা পেরোতে পারে নি। শারীরিক দিক দিয়ে শিশু আহমদ খলিলের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। হাঁটতে না শেখা পর্যন্ত সে শুধু ঘরের মধ্যে হামাগুড়ি দেয়াটাই রপ্ত করেছিল। দু'চারটে করে কথাও বলতে শিখেছিল সে। এই কথা বলায় তার উৎসাহ ছিল অপরিসীম। যে ঘরে তারা থাকত সে ঘরটা শুধু তাদের একার ছিল না। তার দাদা, চাচা এবং সন্তান সম্ভবা চাচীও ওদের সাথে একই ঘরে থাকতেন। এর ফলে, আহমদ খলিলের চারপাশে লোক জুটেছিল প্রচুর এবং তার নতুন কথা ফোটা মুখে মওকা পেয়ে অবিশ্রান্তভাবে কথার ফুলঝুরি ছুটতে লাগল। অবাক ব্যাপার যে এ সময়েই দাদা ও মায়ের মুখ থেকে শোনা কবিতার লাইনগুলো পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করত সে। আরবী ভাষার অতুলনীয় ধ্বনি গাম্ভীর্য এবং অপরূপ ছন্দের দোলা এক অপূর্ব আবেশে তাকে মুগ্ধ করে দিত।

মাঠে কাজের চাপ বেড়ে উঠেছিল ভীষণভাবে। আহমদ খলিলের মা খাদিজা আর আগের মতো শিশু পুত্রটির কাছে আসতে বা থাকতে পারতেন না। এত অল্প বয়সের জন্যে বাইরে যাওয়াও সম্ভব হতো না আহমদ খলিলের। ফলে, তার সারাটি দিন কাটতো ওই পাথুরে দেয়াল ঘেরা বদ্ধ ঘরের আবেষ্টনীতে। সে এক মর্মান্তিক সময়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অস্থির একটি অসহায় শিশুর চিৎকার এবং আর্ত কান্নায় ভারী হয়ে উঠতো সে বদ্ধ ঘরের আবহাওয়া। তার কান্না ও চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে কেউ এগিয়ে এসে খাবার কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কিছুই করার থাকতো না তার।

নিজেদের ঘরটি প্রথম দৃষ্টিতে শূন্য এবং অনাকর্ষণীয় মনে হলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরটিই আহমদ খলিলের কাছে হয়ে উঠেছিল এক বিরাট আনন্দের উৎস। ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিছানো বিরাট মাদুরের ওপর হাত এবং পায়ের সাহায্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। এটাই ছিল তার প্রধান খেলা। এ খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে আরেকটি নতুন খেলা শুরু করত। ঘরে দেয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা ছিল বিরাট বিরাট মাটির পাত্র। পানি এবং শস্য রাখার কাজে ব্যবহার করা হত এগুলো। আহমদ খলিল লুকোচুরি খেলতো এগুলোর আড়ালে একা একাই। এ খেলাতেও ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে এগিয়ে যেতো ঘরের কোণে। সেখানে বসানো তাঁতে মায়ের বোনা সুন্দর কারু-কাজ করা কাপড়গুলোর দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে কেটে যেত তার অনেকটা সময়। কখনো বা সে এগিয়ে যেত ঘরের মাঝখানে চুল্লির দিকে। এর উপরে রাখা থাকত বিশাল

এক তামার ডেকচি। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এ পাত্রটি তার মায়ের হাতে এসেছিল। এর পাশেই একটি চ্যাপ্টা লোহার থালায় রুটি তৈরীর জন্যে মাখানো ময়দা রাখা হত। এগুলোতে ময়দা মাখা দেখতে খুব ভালো লাগত তার। সে বয়সেই খাবারের একটি কণাও নষ্ট করা বা বাইরে ছুঁড়ে না ফেলার শিক্ষা পেয়েছিল সে মায়ের কাছে। খাদিজা বলতেন ঃ 'নষ্ট করা বা ফেলে দেয়া খাবার কণাগুলি শয়তান কুড়িয়ে খায়। তাই এটা যারা করে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেন।' ছোট ছেলে-মেয়েদের কেউ খেতে বসে অসাবধানে রুটির কোন টুকরো মাটিতে ফেলে দিলে খাদিজা তাকে তিরস্কার করতেন। সেটাকে পরম যত্নে তুলে নিতেন তিনি, রেখে আসতেন বাইরের দেয়ালের খাঁজে যাতে বিড়াল, কুকুর বা কোন পাখি ওগুলো খেয়ে যেতে পারে।

আহমদ খলিল জানত না, তার জন্মের মাত্র কয়েকমাস আগে তার গোত্রের ওপর অত্যাচারের কি ভয়ঙ্কর গজব নেমে এসেছিল। এর ফলে পুরো গোত্রটিই শিকার হয় এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের। একদিন গোত্রের কিছু ক্ষুধার্ত লোক পার্শ্ববর্তী দখলদার ইহুদী বসতি থেকে কিছু ভেড়া এবং মুরগী ধরে নিয়ে আসে। জোর করেই অবশ্য এগুলো আনা হয়েছিল। তারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ইসরাইলী সৈন্যরা সারাটি গ্রাম ঘেরাও করে বাসিন্দাদের সমস্ত গৃহপালিত পশু ধরে নিয়ে যায়। এসবের মধ্যে উটগুলো ছিল তাদের জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, ইহুদীরা জমি চাষের কাজে ট্রাক্টর ব্যবহার করত, তাছাড়া উটের দুধ বা গোশ্‌ত তারা খেত না। তাই, গ্রামবাসীদের সমস্ত উট তারা গুলী করে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় খোলা আকাশের নীচে। কয়েকটি মাত্র পশু তাদের নারকীয় আক্রোশ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। গোত্রের অসহায় মানুষদের পক্ষে এ ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারটি নীরবে এবং বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। জমি চাষের জরুরী প্রয়োজনে এক বস্তা শস্যের বিনিময়েও আহমদ খলিলের আব্বা মালেক ওহাব ধার হিসেবে কোন উট যোগাড় করতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে স্বয়ং খাদিজাকেই তখন ঘাড়ে জোয়াল রেখে লাঙ্গল টানতে হয়েছে জমিতে। যাদের লাঙ্গল টানার মত কোনই লোক ছিল না, জমি চাষে ব্যর্থ হয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত করে তার মধ্যে শস্যের বীজ পুঁতে দেয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। আর এটাও তারা পেরেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে তাদের জমির পরিমাণ ছিল নেহায়েতই কম।

ঘরের একদিকের কোণায় ছিল পরিবারের অস্ত্রাগার। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা তেল চকচকে রাইফেলগুলো দেখে আহমদ খলিল নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করত। তার নানা, আব্বা এবং চাচারা তাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন–এ ব্যাপারে সে ছিল নিশ্চিত।

আহমদ খলিলদের ঘরটি তৈরি হয়েছিল শক্ত পাথরের দেয়াল গেঁথে। এ সব ঘর ছিল অত্যন্ত মজবুত, টেকসই। দেয়ালগুলো ছিল অত্যন্ত পুরু যা ভেদ করে সূর্যের প্রখর তাপ ঘরের মধ্যে পৌছতে পারত না। কোন জানালা না থাকায় ভিতরটা ছিল আলো আঁধারিতে ভরা। তবে গরমের দিনে এ ঘর অত্যন্ত আরামদায়ক হলেও শীতকালের বৃষ্টির সময়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হত।

এক বছর খুব ভালো ফসল হয়েছিল। খাবার জন্যে দুধ এবং কোন কোন সময় গোশ্ত পাওয়া যাচ্ছিল। মালেক ওহাব খাবার সময় তার থালায় খাদিজার তুলে দেয়া গোশ্তের টুকরোগুলো থেকে কয়েকটি টুকরো লুকিয়ে ফেলতেন। খাদিজা একটু অন্যদিকে তাকালেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলো পুরে দিতেন আহমদ খলিলের মুখে। আবার রাতে বিছানায় শুয়েও অন্ধকারের সুযোগে অতিরিক্ত একটু দুধ কিংবা কমলা তাকে খাইয়ে দিতেন।

আহমদ খলিল এ ব্যাপারে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। রাতে মালেক ওহাব ঘরে ফিরতেই সে হামাগুড়ি দিয়ে যতদ্রুত সম্ভব তার দিকে এগিয়ে যেত। তার ক্ষুদে হাত দু'টি কোন কিছু পাওয়ার আশায় তার আব্বার এ পকেট-সে পকেট ঘুরে ফিরত। আর কোনদিনই সে আশাহত হত না। মালেক ওহাব তার একমাত্র সন্তানটির জন্য রোজই দু'- তিনটে সিদ্ধ আলু কিংবা নিদেন পক্ষে একটি কমলা অবশ্যই নিয়ে আসতেন।

একদিনের ঘটনা। সকালে কাজে বের হবার আগে মালেক ওহাব তার গোপনে সঞ্চিত খাবারটুকু সযত্নে ছেলের মুখে তুলে দিচ্ছেন। খাওয়া শেষ হতেই আহমদ খলিল তার আব্বাকে অবাক করে দিয়ে বসে থাকা অবস্থা থেকে পায়ের ওপর ভর করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বিরাট কোন কাজ সমাধা করার মতো এক আনন্দোজ্জ্বল অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার চোখ-মুখ। বিস্ময় ও আনন্দে চিৎকার করে খাদিজাকে ডাকলেন মালেক ওহাব। খাদিজা দৌড়ে এসে তার সন্তানকে জীবনে এই প্রথমবারের মতো কোন অবলম্বন ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। মালেক ওহাব একটু দূর থেকে হাত দু'টি প্রসারিত করে আরো এগিয়ে আসার জন্যে তাকে উৎসাহ দিতে শুরু করলেন। আহমদ খলিল তার দিকে কয়েক পা এগিয়েই তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আবার উঠে দাঁড়ায় এবং ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায় গুটি গুটি পায়ে।

নিজের চোখে দেখেও খাদিজা ব্যাপারটি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার ধারণা ছিল, আহমদ খলিল কোনদিন হাঁটতে পারবে না, বড়জোর বসে থাকার মত শক্তিটুকু সে অর্জন করতে পারবে। কারণ এই চার বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও এতদিন একটি অপরিণত শিশুর মতোই তাকে কোলে রাখতে হত। আহমদ খলিলের এই হাঁটতে পারার সাফল্য খাদিজার অন্তরকে ভরে তোলে এক অবর্ণনীয় আনন্দে।

উজ্জ্বল সূর্যতাপের মাঝ থেকে সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করে যেমন বেড়ে ওঠে মাঠের ফসলগুলো এবং পায় পূর্ণতা, আহমদ খলিলের শরীর এবং স্বাস্থ্যের বেলাতেও ঠিক সে রকমই ঘটেছিল। সন্ধ্যায় মাঠের কাজ শেষে ঘরে ফিরতে শুরু করত লোকজন, ফিরে আসতেন খাদিজাও। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় তিনি ডাকতেন আহমদ খলিলকে। কিন্তু সে তখন ব্যস্ত থাকতো গ্রামের রাস্তায় অবিরাম ছুটোছুটিতে। অবশেষে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলে খাদিজা তাকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরতেন বুকে। এক অদ্ভুত অনিবর্চনীয় আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠতো তার সারা শরীর। পরপর ছয়টি সন্তানের মৃত্যুর পর সেই খাদিজার একমাত্র সন্তান যে এখন পর্যন্ত জীবিত। এ জন্যে আল্লার দরবারে তিনি সারা দিনে অসংখ্যবার শোকর আদায় করতেন।

আহমদ খলিল ধীরে ধীরে বেশ শক্ত সমর্থ হয়ে উঠছিল। তার প্রধান খেলার সাথী ছিল দু'জন, চাচাতো ভাই আবদুল আজিজ ও চাচাতো বোন আসমা। খুব ভোর বেলায় ইরাক আল মানশিয়া গ্রামের কেউ জেগে ওঠার আগেই ওরা তিনজনে উঠে পড়ত বিছানা ছেড়ে। এরপর শুরু হতো ঘরের ছাদে উঠে হুটোপুটি, এক ছাদ থেকে লাফিয়ে যাওয়া আরেকটায়। যতক্ষণ না সব ঘরের লোকজন জেগে উঠত ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে চলত তাদের এ লাফালাফি। তবে, গোত্রের অন্য ছেলে-মেয়েদের মতো প্রবীণ এবং মুরব্বীদের উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপারটি কখনো বিস্মৃত হত না তারা।

রাতে শোবার সময় মালেক ওহাব ছেলেকে পাশে রাখতেন। আহমদ খলিলের চোখে ঘুম নেমে না আসা পর্যন্ত তিনি মধুর স্বরে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। আহমদ খলিল অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহ নিয়ে তা শুনত। খুবই ভাল লাগত তার। এর অন্যতম কারণ ছিল, এ পবিত্র গ্রন্থের বাণী সমুহের অর্থ বোঝায় তার কোন অসুবিধা হত না। কারণ, কুরআনের ভাষা-রীতির সঙ্গে শহর বা নগরে চর্চিত ও বিকশিত আরবীর মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য সৃষ্টি হলেও আরবের বেদুইন গোত্রগুলির মধ্যে প্রচলিত আরবীর সঙ্গে কুরআনের ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই।

মালেক ওহাব ছেলেকে প্রায়ই নানা ধরনের গল্প শোনাতেন। এ প্রসঙ্গে নিজের প্রথম জীবনের কষ্টকর অধ্যায়ের কথাও কখনো কখনো গল্প করতেন। তার জীবনের একটি বিরাট অংশ কেটেছে তুর্কী সুলতানের এক ফিলিস্তিনী সেবাদাস মুস্তফা এফেন্দীর প্রাসাদোপম বাড়িতে একজন দাস হিসেবে। তবে প্রায় সময়ই নিজের কথা বাদ দিয়ে শহরগুলোর কথাই তিনি বেশি করে বলতেন। তার মনে এগুলোর স্মৃতি ছিল উজ্জ্বল। গাজা শহরটি ছিল একেবারে ক্ষুদ্র এবং গুরুত্বহীন–শহর না বলে এটিকে বরং বেদুইনদের কোন ব্যবসা কেন্দ্র বলতেই তিনি পছন্দ করতেন। এ তুলনায় কায়রো ছিল তার কাছে অনেকটা স্বপ্নপুরীর মতো। গভীরতম বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে আহমদ খলিল তার আব্বার কাছে শুনতো কায়রোর বিশাল বহুতল বিশিষ্ট বাড়িগুলোর কথা। সে আরো শুনতো দিনের আলোকে প্রায় হার মানানো বৈদ্যুতিক বাতি, বাস, ট্রাক, কার প্রভৃতি যন্ত্রযানের দ্রুত ধাবমানতার ক্ষেত্র সুবিশাল রাজপথ; নুতন পোস্ট অফিস, শিল্প কারখানা এবং সর্বাধুনিক উপকরণে সুসজ্জিত হাসপাতালের কথা। তবে তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গেল উড়োজাহাজের বেলায়। আহমদ খলিল উড়োজাহাজে চড়ে পাখির চেয়েও দ্রুত গতিতে আকাশে উড়ে বেড়াতে চায় কিনা – একথা জিজ্ঞেস করতেই সে প্রচণ্ড খুশিতে লাফিয়ে ওঠে বলে, হ্যাঁ, আব্বা, অবশ্যই। আমি আপনার সাথে ওই রকম একটি উড়ন্ত মেশিনে চড়তে চাই। পরক্ষণেই তার গলায় আকুল আগ্রহ ফুটে ওঠে ঃ আপনি আমাকে কখন নিয়ে যাবেন আব্বা? আমরা কি এখনি রওনা হতে পারি না?

মৃদু হাসিতে ভরে ওঠে মালেক ওহাবের মুখ। বলেন ঃ বাবা, সবুর কর। ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তুমি উড়োজাহাজে চড়তে পারবে। কারণ, তোমার সারাটি জীবনই এখানে এভাবে কাটুক–তা আমি চাই না।

এরপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতো তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন ঃ সমগ্র ফিলিস্তিনের মধ্যে আমরা সবচেয়ে নিঃস্ব, অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত। আমি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি যাতে একটি আধুনিক স্কুলে তোমাকে লেখাপড়া করাতে পারি। আমার ইচ্ছা, স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে তুমি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে এবং একজন সামান্য ফেলাহীন হওয়ার বদলে হবে একজন শিক্ষক, সমাজকর্মী; আইনজীবী অথবা একজন ডাক্তার।

পাঁচ বছরের আহমদ খলিল এসব কথাবার্তা খুব কমই বুঝতো। কিন্তু তার পিতার ধীর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং স্বপ্নময় অথচ সংহত আবেগ তাকে অভিভূত করত। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শুনে যেত এসব কথা। একসময় গাঢ় ঘুমে ছেয়ে যেতো তার চোখ। নিজের অজান্তেই সে হারিয়ে যেত আরেকটি অস্পষ্ট অচেনা জগতের গভীরে।

একমাত্র পুত্রকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার আগ্রহের পিছনে মালেক ওহাবের একটি কারণ ছিল। একবার হজ্ব পালন উপলক্ষ্যে মক্কা যাওয়ার পথে কায়রো গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সাইয়িদ রাশিদ রিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইসলামী চিন্তানায়ক শাইখ মুহাম্মদ আবদুহু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন। এ সাক্ষাতের ঘটনা তার চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস জাগে, কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জীবন গঠন এবং তার সাথে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করা জরুরী। নইলে ফিলিস্তিনের মত সারা দুনিয়ার মুসলমানরা শুধু ধ্বংস এবং নিগ্রহের অসহায় শিকারে পরিণত হবে।

এক রাতে আব্বার কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল আহমদ খলিল। এক সময় মালেক ওহাবের উঁচু গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দেখে, ঘরের কোণার দিকে রাখা ট্রাংকগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তালা খুলে তিনি এক প্রস্থ পোশাক বের করলেন। নিজের কাফিয়া এবং অন্যান্য কাপড় খুলে একে একে পরলেন শার্ট, জ্যাকেট, টাই, প্যান্ট, এবং জুতা। এরপর হ্যাট বের করে মাথায় দিতে যেতেই পাশে দাঁড়ানো খাদিজা ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন সেটা। পর মুহূর্তেই পায়ের তলায় ফেলে সেটাকে দলা-মোচড়া করে ফেললেন। রাগে কাঁপছিলো তার সারা শরীর। আহমদ খলিল আর কোনদিন তার মাকে এভাবে রাগতে দেখেনি।

মালেক ওহাব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেও কিছু না বলে এগিয়ে গিয়ে হ্যাটটি হাতে তুলে নিলেন। আহমদ খলিলের দিকে ফিরে বললেন – আজকের দিনের সভ্য মানুষ কোন পোশাক পরে, আমি সেটাই তোমাকে দেখাতে চাচ্ছি। এখানে আসার আগে আমি সব সময় এ পোশাকই পরতাম। অগ্রগতির স্পর্শ যখন এখানে এসেও লাগবে–দেখবে, তখন সবাই এ পোশাকই পরিধান করেছে। তা এ পোশাক তোমার কেমন মনে হয় বলতো?

ঃ একেবারে বিশ্রী, আপনাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা চোখে কেঁদে ফেলে আহমদ খলিল। পরমুহূর্তেই বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে সে, যেন বাঁচতে চায় এ পোশাকধারীর কাছ থেকে।

ঃ খুলে ফেল ওগুলো। শান্ত কিন্তু কঠিন স্বরে বললেন খাদিজা।

ঃ না, খুলবো না।

ঃ আমি বলছি – তুমি খুলে ফেল ওগুলো। আর কোনদিন তুমি আমার সামনে এই পোশাক পরবে না।

খাদিজার কালো চোখ দু'টি থেকে যেন আগুন ঝরছিল। তার তীক্ষ্ণ নাক এবং শক্ত চিবুকে ফুটে উঠেছিল কর্তৃত্বের ছাপ। কিন্তু তা সত্বেও তখনো ধীর, স্থির, শান্ত ছিলেন তিনি।

মালেক ওহাবের মধ্যে পোশাক খোলার কোন আগ্রহ দেখা গেলনা। অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

আরো কয়েকটি মুহূর্ত। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা গুলী ভরা রাইফেল হাতে তুলে নিলেন খাদিজা। চোখের পলকে চেম্বারে গুলী তুলে মালেক ওহাবের বুক বরাবর নিশানা করতেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি–

ঃ না, না, গুলী করো না। তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

ঃ আমি জানতে চাই, তুমি আমাদের না ওদের? খাদিজার গলায় ইস্পাতের কাঠিন্য— তুমি এগুলো এখনো খোল। নইলে সবাইকে আমি জানিয়ে দেব যে তুমি গোত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী একজন ব্রিটিশ স্পাই। আমার আব্বাকেও আমি কথাটা জানাব। আমার বিশ্বাস, গোত্রের প্রধান হিসেবে তোমার অপরাধের উপযুক্ত বিচার করবেন তিনি।

আহমদ খলিল দেখলো, তার শক্তিশালী পিতার মাথা অবনত হয়ে এসেছে। খাদিজা পাথরের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছেন। রাইফেলটি তখনো হাতে ধরা রয়েছে তার। মালেক ওহাব ধীরে ধীরে ইউরোপীয় পোশাকগুলো খুলে ফেললেন। আগের পোশাকগুলো পরার পর ওগুলো পুনরায় তুলে রাখলেন ট্রাংকটিতে। বন্ধ ট্রাংকটির গায়ে তালাটা পূর্বের মতই ঝুলতে থাকলো।

৩.

ইহুদী দখলদারদের বিরুদ্ধে জেরুজালেমের মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনী যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন ইরাক আল মানশিয়া গ্রামের অধিবাসীরাও তাতে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়ে। এ সময় আহমদ খলিলের নানা শেখ ইসহাক বিন ইবরাহীম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। আহমদ খলিলের জীবনের এ সময়টুকু কেটেছিল তার নানার কাছেই।

শেখ ইসহাক বিন ইবরাহীম আদতে ছিলেন একজন গোত্রপ্রধান। প্রকৃত অর্থে তিনিই ছিলেন সমস্ত গোত্রের দন্ডমুণ্ডের মালিক। একজন পেশাদার কৃষিজীবী হিসেবে আর দশজন ফেলাহীনের সাথে তার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তার মেজাজটি ছিল একেবারে রাজকীয়। যে কেউই তাকে দেখামাত্র বুঝে ফেলত যে এ লোকটির জন্মই হয়েছে হুকুম করার জন্যে এবং অন্যদের সে হুকুম মানতেই হবে। আগের গোত্র প্রধানের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার বা অন্য কোন সূত্রে নয়, শুধুমাত্র প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরেই তিনি গোত্রের নেতা হয়ে ওঠেন।

মরুভূমির বেদুইনদের তাঁবুতেই একদিন তার সাক্ষাৎ হয় সউদী আরব থেকে আগত কয়েকজন ওহাবীর সাথে। ওহাবীরা তখন সুলতান ইবনে সউদকে রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করছিল। এ সাক্ষাৎ তার জীবনে এক বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা করে। তিনি গতানুগতিক অভ্যাস ও প্রথার নিগড়ে বাঁধা ফেলাহীনদের জীবনধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার দুরুহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অচেতন, উদাসীন, নিরক্ষর ফেলাহীনের দল যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারতোনা– শেখের এ প্রয়াস তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে। তারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায় তার কর্মকাণ্ডে সমর্থন যোগাতে। শিশু এবং বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যে গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যে গাজা এবং অন্যান্য শহর থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের নিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু এখানে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বহিরাগত ও শিক্ষিত লোকগুলি ফেলাহীনদের তাদের নিজেদের চেয়ে অনেক নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করত। উপরন্তু, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় চৌকস হলেও নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। ফলে শেখ এক্ষেত্রে ইপ্সিত সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু এতে দমে না গিয়ে মসজিদগুলোতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার কাজ চালাতে শুরু করেন। বেশ কিছুদিন একটানা প্রচার চালাবার ফলে দেখা যায় যে, গোত্রবাসীদের মধ্য থেকে অনেক কুসংস্কারসহ পীরপূজা, কবরপূজা, গান-বাজনা, নৃত্য, ধূমপান, মৃতের জন্যে উচ্চৈঃস্বরে কান্না প্রভৃতি জঞ্জালগুলো একেবারে বিদায় নিয়েছে।

শেখ ইসহাক বিন ইবরাহীমের বয়স তখন সত্তর চলছিল। তবে বয়সের ভারে তখনো নুয়ে পড়েননি তিনি। মেদহীন ঋজু দেহ। জীর্ণ গাউনের ওপর ভারী এক

আঙরাখায় তার দেহ ঢাকা। সে আঙরাখার নানা জায়গায় অসংখ্য তালি লাগানো সত্বেও ফুটো-ফাটার অভাব ছিল না। শুভ্র কেশভরা মাথায় জড়ানো একটি কাফিয়াহ্। সাদা দাড়ি এবং ঈগল চঞ্চুর মতো খাড়া নাকের ওপর জ্বল জ্বল করা একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত গভীর কালো চোখ। জীর্ণ পোশাক পরিহিত, নগ্ন পা মানুষটির প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য কেউ তাকে উপেক্ষা করতে পারত না।

হালকা-পাতলা নাতিদীর্ঘ দেহের শেখ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন। একটানা পরিশ্রমের ক্ষেত্রে এ বয়সেও তিনি ছিলেন একজন যুবকের মতই উৎসাহী এবং অক্লান্ত।

মালেক ওহাবের সাথে ঝগড়ার ব্যাপারে খাদিজা তার আব্বাকে কিছুই জানাননি। আসলে স্বামীকে অপমানিত বা অপদস্থ করার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। কারণ সমস্ত গ্রামের মধ্যে মালেক ওহাবই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত লোক যিনি একাধিক ভাষা লিখতে ও পড়তে জানতেন। আর এ গুণগুলোর জন্যে তিনি কার্যতঃ হয়ে উঠেছিলেন একাধারে শেখের সেক্রেটারী এবং দোভাষী।

আহমদ খলিল তার নানাকে লক্ষ্য করছিল। ঘরের কাঠের আলমারী থেকে তিনি একে একে বের করে আনলেন কাগজ, খাম, টিকিট, লেখার কলম এবং এক দোয়াত সুন্দর ভারতীয় কালি। উপকরণগুলো মালেক ওহাবের হাতে দিয়ে তাকে প্রস্তুত হয়ে বসতে বললেন শেখ। হাত দু'টি পিছনের দিকে বেঁধে পায়চারী করতে করতে চিঠির ভাষ্য বলতে থাকলেন তিনি। দ্রুত কলম চলতে থাকে মালেক ওহাবের। একে একে তিনটি চিঠি লেখা হল ঃ প্রথমটি রিয়াদে সুলতান ইবনে সউদের কাছে, দ্বিতীয়টি কায়রোতে হাসান আল বান্নার কাছে এবং সর্বশেষটির প্রাপক জেরুজালেমের মুফতি হাজী আমিন আল হুসাইনী। সবগুলো চিঠিতেই মুস্তফা এফেন্দী কর্তৃক ইহুদী দখলদারদের কাছে ক্রমাগত ফিলিস্তিনী জমি বিক্রির ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে ইরাক আল মানশিয়া গ্রামটিকে রক্ষার কাজে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানানো হল।

মালেক ওহাব চিঠিগুলো পোষ্ট করে আসার পর থেকেই শুরু হয় শেখের অধীর প্রতীক্ষা। কিছুদিনের ভেতরেই দু'টি চিঠির জবাব মেলে। সুলতান ইবনে সউদ কোন সাড়া না দিলেও উত্তর থেকে হাজী হুসাইনী এবং দক্ষিণ থেকে ইখওয়ান আল মুসলেমুনের স্বেচ্ছাসেবীরা জমায়েত হতে থাকে ইরাক আল মানশিয়াতে। শেখ স্বেচ্ছাসেবীদের সবার জন্যেই খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এ স্বেচ্ছাসেবীদের আগমনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হল তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় আশে পাশের বসতিগুলোর ফেলাহীনরাও এসে শেখের পাশে দাঁড়াল।

সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। একদিন এক তুমুল যুদ্ধে ইহুদীদের অনিয়মিত সেনাদল 'হোগানা'র বিশজন তরুণ যোদ্ধা গ্রামের মধ্যে ঘেরাও হয়ে পড়ে। পালানোর কোন পথ তাদের ছিলনা। বাধ্য হয়ে তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তার পুত্র ইউসুফ মালিক চাইছিলেন, এদেরকে সাথে সাথেই হত্যা করা হোক। কিন্তু তাদের এভাবে হত্যা করা ইচ্ছা শেখের ছিলনা। তাই, গ্রামের একটি বড় ঘরে তাদের বন্দী করে রাখা হলো। উত্তেজিত ফেলাহীনরা যাতে বন্দীদের হত্যা করতে না পারে সে জন্যে একদল সশস্ত্র ইখওয়ান সদস্যকে রাখা হলো কড়া পাহারায়।

আরো বেশ কয়েকটি বড় ধরণের সংঘর্ষের পর নেগবার দখলদার ইহুদীরা শান্তি প্রার্থনা করলে শেখ রাজী হলেন। উভয় পক্ষেই জীবিত বন্দী এবং মৃতদেহ বিনিময় হল।

ইহুদীদের লাশগুলোর মধ্যে শেখ এক তরুণীর লাশ দেখতে পেলেন। তার পোশাক ছিল ছিন্নভিন্ন, চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছিল এবং কেটে নেয়া হয়েছিল নাক ও কান। সাথে সাথে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় অপরাধীকে হাজির করা হল শেখের সামনে। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, সমবেত জনতার মধ্যে শেখ তাকে হাঁটু গেড়ে বসার জন্যে আদেশ দিলেন। পরমুহূর্তেই তার সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারের এক আঘাতে অপরাধীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তধারা এবং মৃতদেহ দেখে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছয় বছরের বালক আহমদ খলিল চিৎকার করে উঠলো ভয় ও আতঙ্কে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে ধীর গম্ভীর গলায় শেখ বললেন–'ভাইয়েরা, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে যারা ঘৃণ্য ও বর্বর পন্থা অবলম্বন করে আমরা তাদের দলে নই। আমরা জিহাদ করছি আল্লাহর নামে। যারা শিশু এবং নারীদের হত্যা করে আল্লাহ তাদের জন্যে জিহাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। জিহাদের নীতিতে শত্রুর লাশের অবমাননা করা জঘন্যতমর অপরাধ। মনে রাখা দরকার, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে যুদ্ধ করে তারা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। শরীয়তের আইনে ন্যায়বিচার পাবার বেলায় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

শেখ নিজেদের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই, পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীদের নিত্য নতুন দখল বিস্তারের কাজ প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনি আশে পাশের সমস্ত গ্রাম ও গোত্রগুলির সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের কাজ শুরু করেন। ইহুদী বসতিগুলোতে পানি সরবরাহ বন্ধ এবং সেগুলো ঘেরাও করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই ছিল শেখের পরিকল্পনা। একই সাথে আর কোন আরব ভূমি যাতে ইহুদীদের হাতে না যায়, সে ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট হন। তবে যে সকল এলাকায় মুসলিম আইনের প্রচলন রয়েছে সে এলাকাগুলোকে ঘেরাও পরিকল্পনার বাইরে রাখা হল। আত্মসমর্পণের পর যদি ইহুদীরা বিদ্রোহ করে তবে পুরুষদের হত্যা, মহিলাদের দাসী হিসেবে নিয়োগ এবং শিশুদের মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে শেখ জানতেন, এ ক্ষেত্রে বৃটিশরা তাকে বাধা দেয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আর এর পরিণতিও তার জানা ছিল। তাই নিজেকে ভাগ্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম বলে মনে হল তার। তার বিশ্বাস ছিল, কাজ শুরু করতে পারেন তিনি, কিন্তু তার সাফল্য বা ব্যর্থতা সবই আল্লাহর হাতে। তবে, সমস্ত ফেলাহীন এবং বেদুইন গোত্রগুলোর বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন। তারা তার নির্দেশে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার জন্যেও প্রস্তুত ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, হানাদারদের বিতাড়িত করার কাজে তিনি সফল হবেন এবং এটা তার মর্যাদাকে পূর্বের চেয়ে বহুশত গুণে বৃদ্ধি করবে।

সংঘাতমুখর জীবনের এ পর্যায়ে ইউসুফ মালিক এবং বালক দুই নাতি ছয় বছরের আহমদ খলিল ও আট বছরের আবদুল আজিজ ছিল শেখ ইসহাক বিন ইবরাহীমের সব সময়ের সাথী। বালক দু'টি ছিল তার কাছে মূল্যবান রত্নের মত। যেখানেই তিনি যেতেন তারা দু'জনেই তাঁর সাথী হত। পথ চলতে গিয়ে ছোট আহমদ খলিল যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন শেখ পরম স্নেহে তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন।

পায়ে হেঁটে শেখ কখনো যেতেন আশে পাশের গ্রামগুলোতে, কখনো যেতেন নেগেভের মরুভূমিতে কালো ছাগলের পশমে তৈরী বেদুইন তাঁবুতে কিংবা ইহুদী বসতিগুলোতে। কখনো জেলা সদরে 'হোগানার' সদর দফতরে, এমনকি অত্যন্ত চরমপন্থী ইহুদী ঘাতক সংগঠন ইরগুন-এর গোপন দফতরেও। বৃটিশ এবং ইহুদীদের সাথে দেন-দরবার করতে গিয়ে তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিব্রু এবং ইংরেজী বলতে শিখেছিলেন। বহু সময় তিনি বৃটিশ কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তবে এ সব ক্ষেত্রে ভালো কোন ফল তিনি পান নি। বরং তাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার এবং বন্দী করে রাখার হুমকিই শুধু তাকে দেয়া হয়েছে।

একবার গাজার বৃটিশ গভর্ণরের সাথে দেখা করা প্রয়োজন পয়ে পড়েছিল। এ উদ্দেশ্যে শেখ একদিন তার প্রাসাদোপম বাড়ীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৃটিশ গভর্ণর দেখলেন নগ্নপদ একটি লোক, জীর্ণ-শীর্ণ, ধুলি ধূসরিত পোশাক তার গায়ে। সাথে উলঙ্গ প্রায় দু'টি শিশু। ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন তিনি –

ঃ বের হও। ভিক্ষুকের জায়গা এটা নয়।

প্রচণ্ড অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো শেখের। তবু নিজেকে সংযত রেখে বললেন ঃ আমরা ভিক্ষুক নই। আপনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন এবং সে জন্যেই আমি এসেছি।

তার কথায় গভর্ণরের চোখ গিয়ে পড়ে আগন্তুকের কোমরের বেল্টে ঝোলানো মূল্যবান তলোয়ারের দিকে। তিনি দেখলেন, তার সামনে দাঁড়ানো লোকটির ঋজু ভঙ্গী, প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল এবং রাজকীয় অভিব্যক্তি। অপশেষে তার মনে হল, লোকটি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতেও পারে।

ঃ আমি ইরাক আল মানশিয়ার শেখ

চমকে উঠলেন গভর্ণর। শেখের কথা শেষ হওয়ার তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন......

ঃ আমি খুবই দুঃখিত। আসুন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

গভর্ণর সাদরে শেখকে নিয়ে তার ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। সোফা দেখিয়ে বললেন ঃ বসুন।

আহমদ খলিল অবাক চোখে সব কিছু দেখছিল। এর আগে সে কোন ইউরোপীয়ের বাড়িতে আসেনি। সোফায় আবদুল আজিজের পাশে বসল সে। কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তার। সে দেখল, তার নানা খুব আরামের সাথে সোফায় বসে কথা বলে চলেছেন। ওদিকে একটু দূরেই সহজ ভঙ্গিতে বসে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছেন মালেক ওহাব।

শেখ ইসহাক বিন ইবরাহীম গভর্ণরের সাথে আলোচনাকালে পূর্ণ কূটনৈতিক নিয়মনীতি পালনের দাবি জানালেন। গভর্ণর সে দাবি পূরণ করলেন। অন্যান্য বৃটিশ কর্মকর্তারা এসে পৌঁছলে শেখ তার বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি জানালেন, ফিলিস্তিনে পুনরায় ইহুদী আগমন নিষিদ্ধ করে এবং আরবদের বিনা অনুমতিতে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রয় বন্ধ করার বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। সমস্ত বিকেল ধরেই আলোচনা চলল।

কিন্তু আহমদ খলিল এ সব কথাবার্তার কিছুই শুনছিল না। সে বারবার গভর্ণরের স্ত্রীকে দেখছিল। কারণ, এর আগে এত কাছ থেকে সে কোন শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখেনি। তার দৃষ্টি ছিল গভর্ণরের স্ত্রীর মাথার বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল, হাঁটু পর্যন্ত স্বচ্ছ নাইলন মোজায় আবৃত সুগঠিত দু'টি পা এবং উঁচু হিলের জুতার দিকে। ভরাট স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যদীপ্ত রমণী মুখটির উপর বারবার ঘুরে ফিরছিল তার দৃষ্টি।

লম্বা লাল তারবুশ এবং সাদা টিউনিক পরিহিত পরিচারক মেহমানদের জন্য একটি বিশাল ট্রের ওপর খাবার নিয়ে এল। নামিয়ে রাখলো পালিশ করা মেহগণি কাঠের তৈরি টেবিলের ওপর।

অবশেষে শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটির ওপর আহমদ খলিলের আগ্রহে ভাটা পড়লো। তার চোখ গিয়ে পড়ল সামনে রাখা খাবারের দিকে। অনেক কষ্টে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে নিজেকে বেশ কিছুক্ষণ বিরত রাখল। কিন্তু কেউ তাকে খেতে বলল না। সে গভর্ণরের স্ত্রীর খাওয়া দেখছিল। তার মনে হল, নিজের খাওয়া শেষ হলে বোধহয় তিনি আহমদ খলিলকে খেতে বলবেন। তার সামনে ছিল কেক এবং পেষ্ট্রি ভর্তি প্লেট। আহমদ খলিল অবাক হয়ে দেখলো, আধাআধি পরিমাণ খেয়েই তিনি প্লেটটি পিছন দিকে সরিয়ে রাখলেন। পরিচারককে ডেকে বললেন সেগুলোকে ফেলে দিয়ে আসতে। আহমদ খলিলের পক্ষে আর আত্মসংবরণ করা সম্ভব হল না। সে ছোঁ মেরে প্লেটটি তুলে নিল এবং গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

ইংরেজ মহিলাটি ভীষণ অবাক হয়েছেন বোঝা গেল। তার লিপষ্টিক চর্চিত ঠোঁট দু'টিতে ফুটে উঠলো কাঠিন্য। শীতল দৃষ্টিতে বালকটির দিকে তাকালেন তিনি। মুখ ভর্তি কেক চিবুতে থাকা আহমদ খলিল সে দৃষ্টি দেখে কেঁদে ফেলল।

ঃ আমার মনে হয়, আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, বলে উঠলেন শেখ। এখন যেতে চাই আমি।

কথাগুলো বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আহমদ খলিলের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। তার কান্না তখনো থামেনি। পথ চলতে চলতে সে শেখকে জিজ্ঞেস করলো ঃ মহিলাটি আমার দিকে ওভাবে তাকাল কেন ?

ঃ তোমাকে খেতে না বলা পর্যন্ত খাওয়া উচিত হয়নি। তাছাড়া ওরা তোমাদের জন্যে খাবার আনেওনি— শেখ বললেন। তবে, তুমি এখনো ভদ্রতা শেখোনি বলে ঠিক শাস্তিই পেয়েছ।

গাজা থেকে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। একদিন রাতে এক তরুণ এসে হাজির হয় শেখের কাছে। উত্তরের এক গ্রামের গরীব চাষী বলে নিজের পরিচয় দেয় সে। বলে– আপনার সাহসের প্রশংসা আমি বহুজনের কাছেই শুনেছি। হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই আমি। আর সে জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি। তবে, সাথে কিছু আনতে পারিনি আমি। এখন বলুন, আমি কি করবো। খুব লজ্জিতভাবেই যুবকটি শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করে।

ঃ ঠিক আছে, চিন্তা করোনা। তোমাকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেয়া হবে। যুবকটিকে সান্ত্বনা দিলেন শেখ।

ঃ কিন্তু, আমি একেবারে রিক্ত হাতে আসিনি– বলে সে সাথে আনা ময়দার ব্যাগটি দেখায়। এটা আপনার জন্যে আমার উপহার। তবে এখন আমি চলে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকালে এসে আপনার সাথে দেখা করব।

ঃ না, না, তা কি করে হয় ! প্রতিবাদ করে উঠলেন শেখ। তুমি আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতটা এখানেই থাক।

শেখ খাদিজাকে ডেকে ময়দার ব্যাগটি তার হাতে তুলে দিয়ে জলদি করে রুটি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন।

আহমদ খলিল এবং আবদুল আজিজ মেঝেতে বসে বুলেটের শূন্য খোল নিয়ে খেলা করছিল। আগন্তুক সে দিকে এগিয়ে গেল। ওদের দেখিয়ে শেখকে জিজ্ঞেস করলো ঃ ছেলে দু'টি কি আপনার ?

ঃ না, ওরা আমার নাতি। উত্তর দিলেন শেখ।

আগন্তুক আহমদ খলিলকে কোলে তুলে নিল। রুগ্ন দেহে হাত বুলোতেই চামড়া ঠেলে বের হয়ে থাকা হাড়ের অস্তিত্ব টের পেল সে। বসে যাওয়া পেট দেখে দারিদ্রের ব্যাপারটি বুঝতে দেরী হল না তার।

ইতিমধ্যে খাবার তৈরী হয়ে এল। আগন্তুক একটা রুটি নিয়ে আহমদ খলিলের মুখে দিতে যেতেই শেখ বাধা দিলেন—

ঃ রাখো, আগে আমি দেখে নেই খাবারটা ঠিক আছে কিনা। একটুকরো রুটি মুখে দিলেন তিনি।

ঃ বাজারের সব থেকে সেরা ময়দা এটা। আমি নিজে কিনেছি। আগন্তুক বলে চলেছে এবং তার কথা শেষ না হতেই হঠাৎ পেট চেপে ধরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন শেখ।

ঃ এ ময়দায় বিষ মাখানো—

শরীরের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে কথাগুলো বলেই নীরব হয়ে গেলেন তিনি। আহমদ খলিল ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল না কি ঘটছে। তার মা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন। ইউসুফ মালিক এক লাফে উঠে গিয়ে ধরে ফেললেন আততায়ীকে। মালেক ওহাব একটি ছুরি নিয়ে দৌড়ে এলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই এসে ভিড় জমাল বাড়িটিতে।

ঘাতককে হত্যা করতে চাইলেন ইউসুফ মালিক। মালেক ওহাব বাধা দিলেন তাকে। হাত বেঁধে কড়া প্রহরায় তাকে গাজা পুলিশের কাছে পাঠালেন তিনি।

ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবীরা শেখের দাফনের ব্যবস্থা করলো। তার ইচ্ছা অনুসারে কোন নারী উচ্চস্বরে কিংবা বুক চাপড়িয়ে কাঁদলোনা। শেখের অনুসারীদের চোখ থেকে নেতার শোকে শুধু নামতে থাকলো অনিঃশেষ অশ্রুধারা। আহমদ খলিল নীরব বিস্ময়ে তার মায়ের হাত ধরে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার নানার অন্তিম যাত্রা, মুর্দা বহনকারী খাটিয়ার পিছনের শত শত মানুষের শোকার্ত মিছিলের নিঃশব্দ অনুগমন।

পুলিশের অনুসন্ধানে জানা গেল, আততায়ী ইরাক আল মানশিয়া গ্রামসহ আশপাশের বিপুল ভূখণ্ডের জমিদার মুস্তফা এফেন্দীর জ্ঞাতি ভাই। মুস্তফা এফেন্দী নিজেও এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। আততায়ীর পকেটে তেল আবিবের ইহুদী সংগঠনের একটি টাইপ করা চিঠিও পাওয়া গেল। চিঠিতে শেখকে হত্যা করতে পারলে আততায়ীকে পাঁচ শত বৃটিশ পাউণ্ড পুরস্কার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে, এ ঘটনার মাত্র দশদিন পরই গাজার বৃটিশ গভর্ণরের নির্দেশে ছাড়া পেয়ে গেল আততায়ী। সাথে সাথে সে পালিয়ে গেল উত্তরে– হাইফাতে। ইরাক আল মানশিয়ার অধিবাসীরা আর কোন দিন তাকে দেখতে পায়নি।

৪.

ঃ তোমরা কি ইহুদীদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলে? – মায়ের কাহিনী শুনতে শুনতে প্রশ্ন করে আহমদ খলিল। কাহিনী শোনার আগ্রহ ও উত্তেজনায় চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠেছে তার।

হ্যাঁ বাবা – খাদিজা উত্তর দেন। আমরা ওদেরকে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছি। বহুবারই অনেক সাথীর মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা। এমন কি নিহতদের অস্ত্রগুলো নিয়ে যাওয়ার অবকাশ পর্যন্ত তারা পায়নি। বিগত পনের বছর ধরে ইহুদীরা এখানে বসতি স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে, আমাদের জমি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিতে শক্তি প্রয়োগ করেছে। গবাদিপশুগুলোসহ পানি ও ঘাস থেকে আমাদের বঞ্চিত করারও চেষ্টা করেছে তারা। কিন্তু সফল হতে পারেনি।

একটু বিরতি নেন খাদিজা। তারপর আবার বলে চলেনঃ সে সময় আমার আব্বা এবং আমার সাতটি ভাই মরুভূমির দুর্ধর্ষ গোত্রগুলোকে এই আগ্রাসনের মুখে ঐক্যবদ্ধ করে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইহুদীদের প্রত্যেকটি আক্রমণের মোকাবেলা করে তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন তারা।

কথা বলতে বলতে মরহুম পিতার কথা মনে করে অবর্ণনীয় দুঃখ ও ব্যথায় ভরে ওঠে খাদিজার হৃদয়। তিনি ছিলেন মরুভূমির এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। উট এবং খাঁটি আরবী ঘোড়াগুলো ছিল আব্বার জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ। এগুলোর প্রতি তার ভালবাসা ছিল অপরিসীম। খাদিজার চোখে ভেসে ওঠে সেই দিনগুলোর ছবি। বাড়ির আঙিনায় ঘোড়া এবং উটগুলোকে সাজানো হয়েছে কোন অভিযানের যাওয়ার জন্যে। একে একে উঠে বসেছে তাদের সওয়াররা। কদমে কদমে ছুটতে শুরু করেছে প্রাণীগুলো। মরুভূমির দুরন্ত হওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে সওয়ারদের দীর্ঘ আলখাল্লা, মাঝে মাঝেই তার প্রান্তভাগ তীক্ষ্ণচাবুকের মত এসে আঘাত করেছে প্রাণীগুলোর পশ্চাৎ দেশে। সওয়ারদের গতি হচ্ছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। উজ্জ্বল রোদের আলোয় ঝকমক করছে তাদের অস্ত্র, দৃষ্টি নিবদ্ধ মরুভুমির দূর দিগন্তরেখায়। খাদিজার মনে হয়, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য তিনি কোনদিন দেখেননি, দেখবেনও না। আব্বার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ হয় তার। অন্য যে কোন বেদুইনের মত তিনিও ঘোড়ায় চড়তে, দ্রুত হাতে গুলি ছুঁড়তে এবং যুদ্ধকৌশলে ছিলেন সুদক্ষ। এ দক্ষতা তাকে করে তুলেছিল দুর্ধর্ষ এবং অপরাজেয়। তার নামে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল বৃটিশ ও ইহুদীরা। এর ফলে তার আসল নামটি ঢাকা পড়ে গিয়ে তিনি শুধু 'মরুভূমির সন্ত্রাস' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

আব্বার মৃত্যুর বহু দিন পরও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে খাদিজার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। তার সেই গভীর ব্যথাভরা অনুভূতির প্রকাশ ঘটত তারই গর্ভজাত সন্তানের কাছে– যে কিনা একটি অবুঝ শিশু ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শুধু তার আব্বার কথাই নয়, কাজকর্মের ফাঁকে কিংবা সন্ধ্যাবেলায় কখনো একটু অবসর পেলে শিশু আহমদ খলিলকে নিজের শৈশবের কথা শোনাতেন খাদিজা। সে শৈশব ছিল সুখস্মৃতি ভরা অনন্ত সুমধুর।

খাদিজার জীবনে তার শৈশব কালটি ছিল সবচেয়ে আনন্দময়। তাদের বাড়িতে সব সময় মেহমানের ভিড় লেগেই থাকত। মেহমানদারীতে তার আব্বার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। শেখ নিজেও তা জানতেন। আর এ জন্যেই তার বাড়িতে সব সময় মজুদ থাকত যথেষ্ট পরিমাণ গোশ্‌ত, চাল, মাখন, খেজুর এবং দুধ। অতিথিদের জন্যে ঘরের এক কোণায় প্রস্তুত রাখা হতো স্তূপীকৃত কম্বল যা ছিল খাদিজার আম্মার নিজের হাতে সযত্নে বোনা। আরামে বসার জন্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হতো তাকিয়া, ঘুমানোর জন্যে মেঝে ঢাকা ছিল সুদৃশ্য গালিচায় এবং প্রচন্ড ঠাণ্ডার সময় শরীরকে উষ্ণ রাখার জন্যে ছিল তুলার পুরু লেপ। বাড়িটাকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হত। খাদিজার আম্মা ছেলে মেয়েদের পোষাকগুলোতে নানারকম সূচিকাজ করে ভারি চমৎকার করে তুলতেন। খাদিজা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অবাক হন। তখনকার দিনগুলোতে রোগ ভোগ ছিল বিরল। সারা গোত্র খুঁজেও একজন অসুস্থ লোককে খুঁজে পাওয়া যেতোনা। ফলে গোত্রের লোকবল এবং শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে চলেছিল দিনকে দিন। আর এখন? এখন প্রতি বছরেই গোত্রের লোকসংখ্যা শুধুই কমছে আর কমছে ...।

খাদিজা যখন তার শৈশবের কথা শোনাতেন, শিশু আহমদ খলিলের চোখের সামনে যেন তার মায়ের সেই দিনগুলোর ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। খাদিজার পুরো শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে যুদ্ধের ডামাডোলে। আহমদ খলিল যেন দেখতে পায়– ঘরের মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ইহুদীদের কাছ থেকে দখল করা রাইফেল, রিভলবার এবং পিস্তল। মেঝেতে বসে খাদিজা দ্রুত হাতে সেগুলো সাফ করে তেল মাখিয়ে চলেছেন যাতে ব্যবহারের সময় কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। খাদিজা বলে চলেন ভাইদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে তলোয়ার এবং ছোরাগুলো তীক্ষ্ণধার করার জন্যে তার কাজের কথা। বলেন ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন বুলেটগুলো ফুরিয়ে যেত তখন শেখ ইব্রাহিম শত্রু খতমের জন্য ব্যবহার করতেন বিষ মাখানো প্রাণঘাতী তীর। তাছাড়া আমার ভাইয়েরা যখন ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করত, আমি তাদেরকে সাহায্য করতাম। কিন্তু এক এক করে তারা প্রত্যেকেই শহীদ হয়ে গেল।

খাদিজা বলতে থাকেন মুস্তফা এফেন্দীর কথা। এ সময় ভীষণ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। কারণ, এই লোকটি যেমন অর্থপিশাচ তেমনি নীতিবোধ বিবর্জিত এক ঘৃণ্য শয়তান। নগদ অর্থ হাতে পাওয়ার লোভে ইহুদীদের সাথে কোন দরদাম না করেই একের পর এক আরবভূমি সে তুলে দিয়েছে তাদের হাতে। খাদিজাদের গ্রামটিও এ থেকে রেহাই পায়নি। ইতিমধ্যেই গ্রামের প্রায় অর্ধেকটা জমি সে বিক্রি করে দিয়েছে। আর ইহুদীরাও আছে সুযোগের অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিদের বহু জমি তারা দখল করে নিচ্ছে এ বেঈমানের অর্থলিপ্সার সুযোগে।

আহমদ খলিলকে খাদিজা বলেন ঃ কিন্তু বাবা, দেখ, এখানেই এর শেষ নয়। আমাদের সব কিছু গ্রাস না করা পর্যন্ত লোভী ইহুদীরা সন্তুষ্ট হবে না।

ঃ কিন্তু ওরা আর কোথাও না গিয়ে শুধু এখানে আসছে কেন? আহমদ খলিল প্রশ্ন করে।

ঃ ওরা বলে– ওদের কোন দেশ নেই। এ দেশটা নাকি ওদেরই ছিল। বহুকাল আগে জোর করে ওদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এ দেশ থেকে— পুত্রের কথার জবাব দেন খাদিজা। ওরা আরো বলে, যে করেই হোক এদেশ তারা অধিকার করবেই– কারণ এটাই নাকি ছিল তাদের পূর্ব পুরুষের বাসভূমি।

ঃ ওরা কি অন্য কোথাও যেতে পারে না?

ঃ অন্য দেশগুলো ওদের চায়না। তাই পৃথিবীর আর কোথাও ইহুদীদের যাবার জায়গা নেই। খাদিজা ছেলেকে ব্যাপারটি যতটুকু সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ঃ পবিত্র কোরআনে বনি ইসরাইলীদের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কুকর্ম ও পাপের জন্যে আল্লাহ তাদের যে শাস্তি নির্ধারণ করেন তারই ফলে তারা হয় গৃহহীন এবং স্বদেশভূমি থেকে নির্বাসিত।

ঃ আজকের ইহুদীরাই কি সেই বনি ইসরাইলীদের বংশধর? প্রশ্ন করে আহমদ খলিল। তার আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে ওঠে।

ঃ কেন, তোমার আব্বার কোরআন তেলাওয়াত কি তুমি শোন নি? আল্লাহ বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (স) এর পূর্বে আগত নবীদের অধিকাংশই ছিলেন বনি ইসরাইল জাতির। তাদের সবার উপরেই আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছিলেন বলে তারা আহলুল কিতাব। বনি ইসরাইলের এ নবীদের প্রতি আমরা অর্থাৎ মুসলমানরাও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

বল (হে মুহাম্মদ), আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং তাতে যা তিনি নাযিল করেছেন আমাদের উপর এবং যা নাযিল হয়েছিল ইবরাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং তাদের জাতির উপর এবং যা নাযিল হয়েছিল মুসা এবং ঈসার উপর– তাদের প্রভুর তরফ থেকে। বল, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তাঁর প্রতি যার কাছে আমরা আত্মসমর্পিত... ।”

কিন্তু কালক্রমে ইহুদীরা ক্রমশই আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়। আকণ্ঠ ডুবে যায় পাপ ও অনাচারে। অবশেষে তারা পরিণত হয় এক অভিশপ্ত জাতিতে। আল্লাহ ভয়ানক রুষ্ট হয়ে তাদের উপর গযব নাযিল করলে তারা স্বদেশভূমি ত্যাগ করে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে গমন করে। তাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এককালে হুবহু আমাদের মতো থাকলেও পরে তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন তাদের এবং খৃষ্টানদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। তারা এখন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসী। অন্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই, নিজেদের ধর্মেই ওরা এখন কতটা বিশ্বাস রাখে তা বলা মুশকিল।

ঃ কেন? কেন এমন হল? আহমদ খলিলের গলায় ধ্বনিত হয় অন্তহীন প্রশ্ন।

ঃ একমাত্র আল্লাহই তা জানেন– উত্তর দেন খাদিজা। আমার আব্বা এবং ভাইদের কাছে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। ইহুদীদের সাথে শান্তি আলোচনার জন্যে তারা বহুবার নেগবায় গিয়েছেন। নামাজের সময় হতেই তারা জামাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন ইহুদী ছেলেমেয়েরা তাদের ঘিরে দাঁড়াত, ধুলা ছুঁড়ে দিত তাদের গায়ে এবং নানা প্রকার অপমানজনক মন্তব্য করত। শুধু তাই নয়– 'আল্লাহ বলে কিছু নেই, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি না' প্রভৃতি কথা বলেও তারা চিৎকার করত।

এসব কথা শুনে আহমদ খলিল অবাক হয়ে যায়। সে ভেবে পায় না– এসব কথা ওরা কি করে বলতে পারে। এরপরে যখনি সে ঘরের মধ্যে একা থেকেছে তখনি সে ভেবেছে– আল্লাহ কেন এই বেঈমান ছেলে-মেয়েগুলোকে শাস্তি দেন না। একটা গভীর বেদনাবোধ তার ক্ষুদ্র বুকে চেপে বসে থাকে। কিন্তু সেই সকালে তার এই বেদনাবোধ সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল যখন সে শুনল তার আব্বা পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করছেন ঃ

"হে মুহাম্মদ! জেনে রাখ, প্রত্যেক জাতিকেই তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে– সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে।"

৫.

আহমদ খলিলের বয়স সাত বছর চলছে। তার আর কোন ভাইবোন নেই। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় সে। তার মনে হয়- ইস্! আল্লাহ যদি তার একটা ভাই কিংবা বোন দিতেন, তাহলে কি মজাই না হত।

নামাজ কায়েম করার বয়স হয়েছে আহমদ খলিলের। আব্বা এবং মাকে দিনে পাঁচবার নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করতে দেখে সে। নামাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন এখনো শেখা হয়ে ওঠেনি তার। তবে তাদের নামাজ পড়তে দেখে তার নিজের মধ্যেও একটা ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল। এ সময় একদিন মালেক ওহাব তাকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। শ'খানেক লোকের বিরাট জামাতে নামাজ আদায় করে আনন্দ ও গর্বে বুকটা যেন ভরে ওঠে তার।

মিনার ছাড়া মসজিদটি ছিল দেখতে গ্রামের আর দশটা বাড়ির মতোই। ইট বিছানো মেঝেয় পেতে দেয়া মাদুর এবং দেয়ালে পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা মসজিদটি ছিল খুবই ছিমছাম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রামের কল-কোলাহল এবং একঘেয়ে ক্লান্তিকর পরিবেশের মধ্যে এটি ছিল যেন প্রশান্ত বেহেশ্‌ত। প্রথম দিনেই আল্লাহর ঘরটিকে গভীর ভালবেসে ফেলে আহমদ খলিল।

একদিন এশার নামাজ আদায় করে ঘুমানোর আগে আব্বা-আম্মার মধ্যকার টুকরো টুকরো কয়েকটি কথা কানে আসে তার। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে। তার একটি ভাই কিংবা বোন আসছে শিগগিরই। এতদিন সে একা ছিল, এবারে একজন সাথী পাবে–এ আনন্দে মন ভরে ওঠে তার। তার মনে হয়- অবশেষে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেছেন। খুশিতে সারারাত ভালো করে ঘুমাতে পারে না সে।

খাদিজার সন্তান জন্মদানের সময় ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে। যে কোন নারীর জন্যেই সন্তান জন্মদানের সময় একটি নিরিবিলি ঘর প্রয়োজন। কিন্তু মালেক ওহাবই শুধু নয়, ইরাক আল মানশিয়া গ্রামে কারোরই একটির বেশি দু'টি ঘর ছিল না। এর ফল হয়েছিল এই যে, গ্রামের একেবারে ছোট্ট ছেলেটিও যাবতীয় কিছু জেনে ফেলত। এমন কোন ব্যাপারই ছিল না যা তাদের কাছে গোপন রাখা যেত। তবে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত লাভ করা এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনার কোন সুযোগ তারা পেত না। অথবা বলা যায়, বড়রা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল বলেই অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এগুলোর চর্চা বা রসালো আলাপ সম্ভব হত না।

আসন্ন সন্তান সম্ভবা খাদিজা একদিন রাতে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন ঃ চারদিক ঘন অন্ধকার। এমন সময় কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল। কণ্ঠস্বরটি কোন পুরুষের, শান্ত এবং ভরাট। এদিক ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলেন না তিনি।

ঃ আপনি কে? কেন আমাকে ডাকছেন? অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন খাদিজা।

ঃ আল্লাহর ইচ্ছায় খুব শিগগিরই তোমার কোলে এক পুত্র সন্তান আসবে। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বলে চললেন– এই ছেলেটি হবে আর সবার চাইতে আলাদা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ঃ আপনি কে? খাদিজা আবারো জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কোন উত্তর এলোনা।

অবশেষে তাকে দেখতে পেলেন খাদিজা। তিনি দেখলেন– দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী একটি মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছেন। উজ্জ্বল জ্যোতি। তাঁর মাথায় বাঁধা কাফিয়াটি দিয়ে মুখটার প্রায় সবটুকু ঢাকা। সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দু'হাতে একটি শিশু। নিজের অজান্তেই খাদিজা হাত বাড়িয়ে দিলেন শিশুটিকে নিজের কোলে নেয়ার জন্যে। মহাপুরুষ পরম যত্নে খাদিজার হাতে তুলে দিলেন শিশুটিকে। বলেন– খাদিজা, আল্লাহ এ শিশুটিকে তোমায় দিয়েছেন। তুমি সব সময় এর প্রতি খেয়াল রেখ। মহাপুরুষের ভরাট কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে গেল চারদিকে। কিন্তু খাদিজা আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তখনি ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। কানে এল গ্রামের মসজিদ থেকে ভেসে আসা মুয়াজ্জিনের গলায় ভোরের সুমধুর আজানের ধ্বনি।

সকাল বেলায় মালেক ওহাব, ইউসুফ মালিক এবং আহমদ খলিলকে নাস্তা দিতে গিয়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল খাদিজার। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গেলেন তিনি। তারপর স্বামীকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে মাথা নাড়লেন মালেক ওহাব–

ঃ আমি কি করে জানব এ স্বপ্নের অর্থ? তবে স্বপ্ন স্বপ্নই। তা কখনো সত্য হয় না।

মালেক ওহাবের কথা শেষ হতেই কথা বলে উঠলেন ইউসুফ মালিক–

ঃ স্বপ্নে আপনি নবী করিম (স) কে দেখেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যখন কাউকে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দেন তখন তার মুখ একটা আবরণে ঢাকা থাকে।

মালেক ওহাবের নিষেধে খাদিজা এ দিন আর কাজের জন্যে মাঠে গেলেন না। মালেক ওহাব নিজেও ঘরেই থাকলেন। দুপুরের দিকে খাদিজা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। রাস্তায় খেলা করছিল আহমদ খলিল। বেশ কিছুক্ষণ পর ভাইয়ের জন্ম সংবাদ কানে যেতেই এক দৌড়ে ঘরে চলে আসে সে।

ঃ আমার ভাই কোথায়? আমার ভাইকে দেখতে দাও। সে চিৎকার শুরু করল।

আহমদ খলিলের চাচী হালিমা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ধমকে উঠলেন তিনি–

ঃ এভাবে চিৎকার কর না। এখন যাও, পরে দেখতে এসো ভাইকে।

ঘরের ভিতর থেকে খাদিজার ক্লান্ত গলা ভেসে এল। ছেলেকে ভিতরে যেতে দিতে বলছেন তিনি।

আহমদ খলিল ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দেখতে পেল তার ছোট্ট ভাইটিকে। তার আম্মা দু'হাতে তুলে ধরেছেন পুতুলের মতো শিশুটিকে যাতে আহমদ খলিল ভালো করে দেখতে পায়। আহমদ খলিল ভাইকে দেখছিল। ছোট্ট অথচ স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল তামাটে রং, মাথা ভরা কালো চুল। হঠাৎ করেই এ সময় তার মনে পড়ে যায় আম্মার দেখা স্বপ্নের

কথা। আরো ভালো করে সে ভাইকে লক্ষ্য করতে শুরু করে। হঠাৎ তার মনে হয়, আর দশটি নবজাত শিশুর মত নয় তার ভাই। শিশুটি এখনই অদ্ভুত রকমের শান্ত এবং স্থির। তার চোখ দু'টি অসাধারণ উজ্জ্বল, আর তাতে জড়িয়ে আছে যেন একরাশ মমত্ব ও সারল্য। আহমদ খলিল খুব আশ্চর্য হয়ে যায়।

ভাইয়ের আগমনে আহমদ খলিলের ছোট্ট জীবনের সবকিছুতেই পরিবর্তন ঘটে যায়। নবজাতকের নামা রাখা হয়েছে খলিফা– অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি। কিছুদিন পর খলিফাকে দেখা শোনার দায়িত্ব তার উপরেই পড়লো। মাঠের কাজে না গিয়ে উপায় ছিল না খাদিজার। ইরাক আল মানশিয়ার অধিবাসীদের জীবন ধারণের কঠোর কঠিন সংগ্রামে অংশগ্রহণ থেকে সরে থাকার কোন পথ খাদিজার ছিল না। এরপর আরো মুশকিল হল যখন শীতকালে একটু বৃষ্টিও হল না। জমিগুলো ফসলশূন্য হয়ে দীর্ঘশ্বাস এবং হাহাকার তোলে সবার মাঝে। মালেক ওহাবকে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হত।

অবস্থা শেষপর্যন্ত খুবই সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল।গ্রামের অন্য পরিবারগুলোর মতো মালেক ওহাবের সংসারটিও প্রায় অচল হয়ে পড়ল। বৃষ্টি ছাড়া মাঠ থেকে ফসল পাবার কোন উপায় ছিল না। তাই মালেক ওহাব সম্পূর্ণরূপে ঘরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। খাদিজা ঘরের তাঁতে যে কাপড় বুনতেন সেগুলো গাজাতে নিয়ে বিক্রি করে পাওয়া অর্থই ছিল সংসার চলার একমাত্র উপায়। ফলে দুর্বল শরীরের আহমদ খলিল নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারের অভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে যাওয়া কিংবা সঙ্গীদের সাথে খেলতে যাবার শক্তিটুকুও তার রইল না।

আবার শীত এসে গেছে। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এবার। চারদিকের ধূসর প্রান্তর ইতিমধ্যেই সবুজের চাদর গায়ে হেসে উঠেছে। মরুভূমির ঝাঁঝালো গরম হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ। সূর্যের আলো সারা গায়ে ছড়িয়ে দেয় আরামের মধুর পরশ। মাঠে ফসলের অবস্থা খুবই ভালো। ইরাক আল মানশিয়ার মানুষগুলোর জীবনে আবার স্বস্তি ও আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে।

ঘরের বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন মালেক ওহাব। তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন শ্রোতা। ইউসুফ মালিক এবং মনসুরও ছিলেন তাদের মধ্যে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল আসরে। মালেক ওহাবের হাতের কাগজটি ছিল প্রায় এক মাসের পুরনো। ইরাক আল মানশিয়ার মতো গ্রামে খবরের কাগজ পাওয়ার ব্যাপারটি ছিল এক আশ্চর্যপ্রায় ঘটনা। মালেক ওহাব কিভাবে খবরের কাগজ পেতেন এটি ছিল সবার কাছেই এক রহস্যের ব্যাপার।

আহমদ খলিল তার আব্বার খবরের কাগজ পাঠ এবং লোকদের আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝল– এখান থেকে বহদূরে শীতপ্রধান দেশগুলোতে যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধের কারণ তার জানা ছিল না। সে উঠে গিয়ে মালেক ওহাবের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে খবরের কাগজটি দেখতে থাকল। একটি ছবির উপর চোখ আটকে যায়

তার। এ লোকটির ছবি আগেও দেখেছিল সে। লোকটি হলেন উইনস্টন চার্চিল, ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী। লন্ডনে জার্মানরা বোমা ফেলেছে। এ প্রেক্ষিতে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে চার্চিলের দেয়া ভাষণের আরবী অনুবাদ পড়ছিলেন মালেক ওহাব। এরপর আরেকটি ফটো এবং তাঁর বিবরণ পড়ে শোনালেন তিনি। এ ফটোটি ছিল হাজী আমিন আল হুসাইনী এবং এডলফ হিটলারের মধ্যকার বৈঠকের একটি দৃশ্য। তারা দু'জনে একটি সোফায় পাশাপাশি উপবিষ্ট অবস্থায়ই ফটোটি তোলা হয়েছে।

কাগজ পড়া বন্ধ করে কথা বলে উঠলেন মালেক ওহাব ঃ

ঃ হিটলার আমাদের বন্ধু। জার্মানরা যদি যুদ্ধে জিতে যায় তবে ইহুদীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইংরেজদের ম্যাণ্ডেটের কোন দাম তখন থাকবে না। এর ফলে ফিলিস্তিন একটি আরব রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করবে।

ঃ না, এতে কোন লাভই হবে না। প্রতিবাদ করলেন ইউসুফ মালিক। তিনি বললেনঃ এতে শুধু শাসকের বদল হবে মাত্র। মালেক ওহাবের দিকে তাকালেন তিনি– কেন, আপনি কি জার্মানদের অত্যাচারের কথা ভুলে গেলেন ! হিটলার লোকটি ভয়ানক নিষ্ঠুর। ওরা যেস্থানই দখল করছে সেখানেই চলছে, হত্যা, নির্যাতন এবং সন্ত্রাস। নারী এবং মাসুম বাচ্চাদের হত্যা করতেও ওদের হাত কাঁপেনা। তাছাড়া ওরা যে শুধু ইহুদীদেরই হত্যা করেছে তা তো নয়। ওদের অত্যাচার থেকে কেউই আসলে রেহাই পাচ্ছে না। কুখ্যাত বন্দীশিবিরগুলোর কথা তো আপনি শুনেছেন। তাই, আমার মনে হয়, আপনার ধারণা ভুল। হিটলার আমাদের শত্রু। আর তা এ কারণে যে আজ বন্যাস্রোতের মতো ফিলিস্তিনে ইহুদী আগমনের জন্যে মূলতঃ সেই দায়ী। সে যদি ইহুদীদের অপরাধের জন্যে উপযুক্ত ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা নিত তবে এভাবে তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে আমাদের জায়গায় এসে চেপে বসার প্রয়োজন হত না।

ঃ আচ্ছা ফিলিস্তিনেও কি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে? তোমার কি মনে হয়! মনসুর প্রশ্ন করেন। অনাগত বিপদের আশংকায় তার মুখটি কালো হয়ে উঠেছে। আমি শুনেছি, মিসরে ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া ইদানিং জার্মানদের স্বস্তিকাচিহ্ন অংকিত যুদ্ধ বিমানগুলো আমাদের এলাকার উপর দিয়েই উড়ে যাচ্ছে। তোমাদের কি মনে হয়, জার্মানরা শীঘ্রই এদিকে আসবে? মনসুরের গলায় জিজ্ঞাসা।

ঃ একমাত্র আল্লাহই জানেন কি হবে। হতাশ গলায় বললেন ইউসুফ মালিক।

এর পরপরই আসর ভেঙ্গে গেল। সবাই চলে গেল যে যার ঘরে।

দুপুর বেলায় আহমদ খলিলকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলেন খাদিজা। খুবই ক্লান্ত মনে হল তাকে। খাদিজা তাকে জাগানোর জন্যে কয়েক বার ঝাঁকুনি দিলেও ঘুম ভাঙল না তার। বিরক্ত হয়ে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করলেন খাদিজা। মালেক ওহাব মাঠে গিয়েছিলেন একা। আহমদ খলিল তাকে সাহায্য করতে না গেলে খুবই অসুবিধায় পড়বেন তিনি। এ সময় জোর ধাক্কায় জেগে ওঠে আহমদ খলিল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে সে।

খাদিজা অবাক হয়ে তার মাথায় হাত রেখেই চমকে উঠলেন। একি! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আহমদ খলিলের। বুকটা কেঁপে ওঠে তার। ঘরের এক কোণ থেকে কয়েকটি ময়দার বস্তা এনে সুন্দর করে বিছিয়ে মোটামুটি নরম একটি শয্যা তৈরি করে ছেলেকে তার উপর সযত্নে শুইয়ে দেন তিনি। এরপর কাপড় ভিজিয়ে কপালে পানি-পট্টি দিতে শুরু করেন।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল আহমদ খলিলের। তার মনে হচ্ছিল যে মাথাটা যে কোন মুহূর্তে বোধ হয় ছিঁড়ে অথবা ফেটে যাবে। যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু, মা রেগে যাবেন মনে করে মুখ বুঁজে সহ্য করতে থাকল সে। এ সময় জোহরের নামাজের আযান কানে ভেসে আসে। হঠাৎ করেই তার মনে হয়– মাথার অসহ্য যন্ত্রণাটি অনেকখানি যেন কমে গেছে।

আযানের আওয়াজে উঠে গিয়েছিলেন খাদিজা। অযু সেরে এসে নামাযে দাঁড়ান তিনি। এক অদ্ভুত আত্মমগ্নতা লক্ষ্য করে আহমদ খলিল তার মায়ের মধ্যে। নিবিষ্ট মনে মায়ের রুকুতে যাওয়া, সিজদায় নত হওয়া, আবার উঠে দাঁড়ানো– সবকিছুই লক্ষ্য করছিল সে। অন্যান্য দিনগুলোর চেয়ে আজকে অনেক সময় ধরে মাকে মোনাজাত করতে দেখে একটু অবাকই হয় সে।

রাত অনেক হয়ে গেছে। আহমদ খলিলের জ্বর ক্রমশই বেড়ে চলেছে। দেয়ালের একটি খাঁজের মধ্যে রাখা বাতি থেকে ঘরখানায় হলুদাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। পাংশু মুখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন মালেক ওহাব। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না আহমদ খলিলের। হঠাৎ তার মনে হলো, ঘরের মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। সে আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে গলা শুকিয়ে আসে তার। তার মনে হলো, পানির অভাবে বুকটা ফেটে যাবে। পানি পানি— বলে চিৎকার করে ওঠে সে।

প্রায় সাথে সাথেই একটি কোমল হাতের মমতা মাখানো ছোঁয়া পায় আহমদ খলিল। হাতটি ছিল তার মায়ের। ছেলের পানির পিপাসা লেগেছে বুঝতে পেরে তাকে পানি খাইয়ে দেন খাদিজা।

৬.

মালেক ওহাব খাদিজাকে ডাকছিলেন।

আহমদ খলিল দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘুমিয়েছিল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে সে শুনলো, মালেক ওহাব তার মায়ের নাম ধরে ডাকছেন।

ঃ খাদিজা! খাদিজা! তুমি কোথায়? মালেক ওহাবের ডাক ঘরের পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

মনসুর উঠে আসেন। তার বিশাল হাতটি গভীর সহানুভূতির সাথে মালেক ওহাবের কাঁধে রেখে বলেন ঃ ভাইজান, খাদিজা আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ থেকে দু'প্তাহ আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আপনি এবং আহমদ খলিল তখন এত অসুস্থ যে আপনাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। হালিমার প্রাণপণ সেবায় আপনারা এখন অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছেন। তবে আমরা খাদিজার দাফনের ব্যাপারে কোন গাফলতি করিনি। শেষ ইচ্ছানুসারে খাদিজাকে তার আব্বা ও ভাইদের কবরের পাশেই দাফন করা হয়েছে।

মালেক ওহাব অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন ঃ না! না! আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। এ হতে পারে না। খাদিজার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। এতো অল্প বয়সে সে মরতে পারে না। আমি চিৎকার করে ডাকলে সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে।

মনসুর গভীর মমতায় মালেক ওহাবকে জড়িয়ে ধরে বলেন ঃ ভাইজান, আপনি শত চিৎকার করলেও খাদিজা আর ফিরে আসবে না। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা যে আল্লাহরই নিয়ম। দুঃসহ হলেও এ সত্য আমাদের মেনে নিতেই হবে।

ঃ না না। অদম্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মালেক ওহাব। পাথরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে তার আক্ষেপ। আহা! আমরা যদি মূর্খ না হয়ে শিক্ষিত হতাম, যদি গ্রহণ করতাম আধুনিক জীবনযাত্রা তবে কিছুতেই এ রকম ব্যাপার ঘটতে পারত না। নেগবায় ইহুদী বসতির লোকেরা কি এভাবে অসুখে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়? আমাদের মধ্যে শুধু অভাব আর অভাব। অভাব ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। আমাদের কী জীবন আর তাদের কি জীবন! এক ফোঁটা পানির জন্যে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়-আর তাদের খাবার, রান্নার এবং গোসলের পানির কোন অভাব নেই। এই কি আল্লাহর ইচ্ছা? আমি এ জায়গাকে ঘৃণা করি। ভীষণ ঘৃণা করি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন তিনি। অবশেষে তার ক্লান্ত শরীর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

ঃ ভাইজান, নিয়তির বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করতে পারিনা। আপনি খুবই দুর্বল। একটু সবর করুন। একটু শান্ত হোন। আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

ঃ বিশ্রাম! কিসের বিশ্রাম। আমি এভাবে আর ফাঁদে আটকা পড়ে মরতে চাইনা। আমি এখনি আমার সন্তানদের নিয়ে এখান থেকে শহরে চলে যাচ্ছি।

আহমদ খলিল এবং খলিফাকে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হন মালেক ওহাব।

ঃ ভাইজান, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? টাকা-পয়সা ছাড়া আপনি শহরে থাকবেন কি করে?

ঃ আমি খুব ভালোভাবেই শহরে থাকতে পারব। মালেক ওহাবের চোখেমুখে দৃঢ়তা। আরবীর মতোই আমি ইংরেজি ও তুর্কীভাষা যথেষ্ট ভালো জানি। মাধ্যমিক এবং অনার্স পরীক্ষা পাশ করার সময় এ ভাষাগুলো আমাকে শিখতে হয়েছিল।

মালেক ওহাব ঘরের কোণায় রাখা তার ট্রাংকটার কাছে গিয়ে তালাটা খুলে ফেললেন। বিজয়ীর মতো তিনি একটি জড়ানো পার্চমেন্ট কাগজ বের করে এনে তার ভাঁজ খুলে ভাইয়ের চোখের সামনে মেলে ধরেন –

ঃ দেখ, দেখ, এই যে আমার সার্টিফিকেট। সরকারী চাকুরী করার যোগ্যতা আমার আছে। আর তা যদি নাও হয় তবে অন্ততঃ কোন স্কুলে শিক্ষকতা তো করতে পারব? যাই হোক, আমি আর এখানে থাকছি না। আমার সন্তানদের জীবনকে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেব না। মালেক ওহাবের গলার স্বর প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে ওঠে।

ঃ ভাইজান, আজ তের বছর ধরে আপনি আমার সাথে রয়েছেন। আর আজ ।

মনসুরকে কথা শেষ করতে দিলেন না মালেক ওহাব। বললেন ঃ হ্যাঁ ছিলাম। থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ খাদিজার আব্বা আমাকে শহরে যেতে দেননি। যদি আমি শহরে থাকতাম, তবে আমার সাতটি সন্তানই আজ সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকত। কিন্তু খাদিজা তার আব্বার কথা শুনে কখনোই শহরে যেতে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে কিছু বললেই সে বলতো – এটা আমার জন্মভূমি। এ জায়গা ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না। এ ব্যাপারে তার বড় বোনের সঙ্গে খাদিজার যে কত পার্থক্য ছিল

মালেক ওহাব মনসুরকে বলছিলেন ঃ তোমার কি মনে নেই যে খাদিজার বোন গোপনে এক ইহুদী সৈন্যের প্রেমে পড়েছিল? ইহুদী মেয়েরা খুব জাঁহাবাজ। ওরা পুরুষদের মতো চুল কাটে, খাকি শার্ট গায়ে দেয়, খাকি প্যান্ট কিংবা শর্টস পরে। ওদের মধ্যে লালিত্য, কমনীয়তা নেই বললেই চলে। সে তুলনায় আমাদের মেয়েরা অনেক বেশি আকর্ষণীয়া। খাদিজার বোন হঠাৎ করেই সে ইহুদীটার প্রেমে পড়ে গেল।

খাদিজার আব্বা ব্যাপারটা সম্পর্কে শুনলেও সত্য প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে সেই দিন এল। আমার চোখে এখনো স্পষ্ট হয়ে ভাসে সে দৃশ্যের কথা। খাদিজার বোন এবং তার প্রেমিক ইহুদী সৈনিকটি মাঠের মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছিল। এরপর ইউসুফ মালিক এবং খাদিজার আরো দু'ভাই ওদের দু'জনকে ছুরি মেরে হত্যা করে। শেখ তার বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েকে কবর পর্যন্ত দিতে রাজি হননি। খোলা প্রান্তরে ওদের যুগল মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে লোকজন। তবে এরপর আর কোন ইহুদী কোনদিন আমাদের কোন মেয়ের দিকে নজর দেয় নি।

আহমদ খলিল অবাক হয়ে শুনছিল। তার মা তাকে কোন দিন এ ব্যাপারে কিছু বলেননি কিংবা ভুলেও কখনো তার খালার কথা উচ্চারণ করেন নি। তবে এ ঘটনা নিশ্চয়ই তার জন্মের পূর্বের বলেই আহমদ খলিলের মনে হয়।

মালেক ওহাব মনসুরকে বলে চলেছেন–খাদিজা ছিল তার বাপের ছোট মেয়ে। হয়ত ছোট বলেই সে ছিল শেখ ইবরাহিমের নয়নের মণি। বড় বোনের কেলেঙ্কারির ঘটনার ফলে কেউ খাদিজাকে হয়ত বিয়ে করতে চাইবে না— এ জন্য শেখ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় আমি খাদিজাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। আমার গায়ের রং কালো এবং এক সময় আমি ক্রীতদাসের জীবন যাপন করলেও তিনি কোন আপত্তি করেন নি। তবে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার কারণে এবং বড় মেয়ের ব্যাপারে সমাজে তার যথেষ্ট সম্মানহানি ঘটেছিল। দারিদ্রের কারণে আমাদের বিয়ে হয়েছিল একেবারে সাদামাটা ভাবে। তোমার কি মনে পড়ে যে ইউসুফ মালিক এবং তুমি এ বিয়েতে সাক্ষী হিসবে উপস্থিত ছিলে? মালেক ওহাব মনসুরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন। বলে চলেন তিনি ঃ এ বিয়েতে কোন উৎসব এবং খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তখন আমি ছিলাম ত্রিশ বছরের এক পরিণত যুবক, আর খাদিজা ছিল তের বছরের এক কিশোরী মাত্র। খাদিজার মত স্ত্রী পাওয়া যে কোন লোকের জন্যেই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমি চেয়েছিলাম একজন আধুনিক, শিক্ষিত স্ত্রী। আমি কোনদিন খাদিজাকে বুঝতে পারিনি। সে জীবনধারার পরিবর্তনকে ভয় করত। আধুনিকতার ছিল প্রচণ্ড বিরোধী। সে নিজেও কোনদিন আমাকে বুঝতে পারেনি। সমুদ্রের এপার এবং ওপারের মধ্যে যেমন ব্যবধান; নতুন এবং পুরনোর মধ্যে যেমন ফারাক– তেমনি ব্যবধান ছিল আমার এবং খাদিজার মাঝে। আমি জানিনা, এ সত্বেও কেন তাকে আমি এত গভীরভাবে ভালোবাসতাম। হয়তো বা সে অতুলনীয়া সুন্দরী ছিল বলেই। কিন্তু আমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি, তার সাথে সংসার করেছি–আর এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ...।

রাত নেমে আসে। সমস্ত ঘর ঢাকা পড়ে যেতে থাকে আঁধারের কালো আবরণে। গ্রামের মসজিদ থেকে এক সময় এশার আজান শোনা যায়। কিন্তু আজ আজানের ধ্বনি আহমদ খলিলের কাছে কোন মাধুর্য বয়ে আনে না। নিজেকে তার বড় একা এবং অসহায় মনে হয়। মাকে বড় ভালোবাসত সে। প্রিয়তম নানাও আজ তার পাশে নেই। আব্বাকে কোন দিনই তার খুব একটা আপন মনে হয়নি–সে তাকে কোনদিন ভালোবাসতে পারেনি। তার মা-ই ছিল তার সব কিছু, তার কাছেই সে খুঁজে পেত আশ্রয়। তার মনে হয়, তার আব্বা তাকে যেভাবে গড়ে তুলতে চান –সেরকম হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আহমদ খলিলের বুক ফেটে কান্না আসে। সে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। সে কান্নার শব্দ কারো কানে পৌঁছে না। কেউ তাকে একটু সান্ত্বনা দিতেও এগিয়ে আসে না। আহমদ খলিল উপলব্ধি করে, সে যাদের গভীর ভাবে ভালোবাসত তাদের কেউই বেঁচে নেই। এমন কেউ নেই যে আজ তাকে ভালোবাসবে, আদর করে বুকে টেনে নেবে। এই বিশাল পৃথিবীতে আজ সে একা, সম্পূর্ণ একা।

৭.

ইরাক আল মানশিয়ার মানুষেরা আগে কোনদিন এরকম অবস্থায় পড়েনি। হঠাৎ করে সংক্রামক জ্বর মহামারী আকারে গ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। অবাক ব্যাপার যে, আশে-পাশে আর কোথাও এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। ইরাক আল মানশিয়ার এ এ মহামারী যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেজন্য গাজার বৃটিশ গভর্ণরের গৃহীত ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের দুর্দশা আরো বেশি বাড়িয়ে তোলে। বাইরের সাথে যোগাযোগের সমস্ত পথই বন্ধ করে দেয়া হল। এমন কি সামান্যতম করুণা দেখাতেও ঔষধপত্র কিংবা কোন ডাক্তারকে তারা ইরাক আল মানশিয়ায় পাঠাল না। গ্রামবাসীরা নিজেদের চেষ্টায় বাইরে থেকে যে কাউকে আনাবে তারও কোন উপায় রইল না।

ইহুদীরা এমনিতেই ফিলিস্তিনীদের দু'চোখে দেখতে পারত না। বহু সংঘর্ষে তারা হার মেনেছে। তাদের বহু লোকও নিহত হয়েছে গ্রামের লোকদের সাথে লড়তে এসে ইহুদীরা তা ভোলেনি। এক সময় তারা পুরো গ্রামটিকেই সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বৃটিশরা অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করায় ইহুদীরা তাদের একান্ত ইচ্ছেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছিল না। এ সময়েই এল মহামারী। খবরটা কানে পৌছতেই উল্লসিত হয়ে উঠল তারা। মূল্যবান গোলাগুলী খরচ এবং তারও চেয়ে বেশি মূল্যবান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামবাসীদের উৎখাত করার চেয়ে ভয়ঙ্কর রোগেই যদি সব কিছু শেষ হয়ে যায় তা হলে আর চাই কি! ইহুদীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে ইরাক আল মানশিয়ার অসহায় মানুষগুলোর করুণ মৃত্যু দেখতে লাগলো। এক সময় মহামারীর তাণ্ডবলীলা আপনা আপনিই থেমে গেল বটে– তবে গ্রামের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী মানুষের মুল্যবান জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে গেল।

দিনের পর দিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বন্যাস্রোতের মতো ইহুদীরা আসছে তো আসছেই। ইরাক আল মানশিয়ার প্রায় চারদিক ঘিরেই তারা বসতি বানানোর কাজ শুরু করেছে। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট অনুভব করে, লোভী ইহুদীদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার নয়। ওদের জমি চাই, আরো জায়গা চাই। তাদের ক্ষুধার শেষ নেই। কিন্তু এটা বুঝেও ইরাক আল মানশিয়ার লোকদের কিছু করার ছিল না। মহামারী তাদের মেরুদণ্ডটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ইহুদী দখলদারদের সাথে লড়ার মতো মনোবল বা শক্তি আর তাদের ছিল না।

আহমদ খলিলের ছোট ভাই খলিফার বয়স এখন দু'বছর। কিন্তু আহমদ খলিল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, তার শিশু ভাইটি একটু যেন অন্যরকম। খলিফা কোন সময় হাসে না। সারাদিন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে। নিশ্চুপ, নির্বিকার। আশে পাশে যা কিছুই হোক, সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। মালেক ওহাবের মনে খলিফার বেঁচে থাকার ব্যাপারে কোন আশা ছিল না। তার করুণ আর্তিভরা চোখের দিকে তাকালেই তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা জেগে ওঠে। তার বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে–আহা! আজ যদি খাদিজা বেঁচে থাকতো!

আহমদ খলিল তার চাচাতো-মামাতো ভাই-বোনদের সাথে মাঠে এসেছিল। তাদের সাথে ভেড়া আর ছাগলের পাল। অবোধ পশুর পাল নিয়ে খোলা প্রান্তরে চরাতে এসে আহমদ খলিলের খুশি উপচে পড়ছিল। কাজটা তার ভারি পছন্দের। এর তুলনায় ঘরে বসে লেখা-পড়া করাটা নিতান্তই বিরক্তিকর বলে মনে হয়। পশুর পাল নিয়ে মাঠে আসা মানেই যেন স্বাধীন জীবনের স্বাদ পাওয়া। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। যতদুর দু'চোখ যায় উধাও প্রান্তর আর মুক্ত হাওয়া তাকে পাগল করে তোলে। এখানে মালেক ওহাবের শাসন নেই, গলা খুলে চেঁচামেচিতে কেউ বাধা দেবার নেই–এর চেয়ে ভাল কিছু আহমদ খলিল আর কল্পনা করতে পারে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাবিল আনন্দময় একটা দিনের সন্ধান পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে সে।

প্রান্তরে ছুটোছুটি করতে করতে আহমদ খলিলের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসে। প্রান্তরের শেষ সীমার দিকে তাকায় সে। এ মালভূমির যেখানে শেষ সেখান থেকে নেগবার সীমানা শুরু। অর্থাৎ, এ মালভূমিটাই ইরাক আল মানাশিয়াকে নেগবা থেকে আলাদা করে রেখেছে। নেগবা হলো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদীদের বড় ঘাঁটির একটি। কথাটা মনে হতেই ঘৃণা এবং প্রতিশোধের ইচ্ছার এক শিহরণ বয়ে যায় তার সারা শরীরে। কিন্তু কিশোর আহমদ খলিল খুব ভাল ভাবেই জানে, তার করার কিছুই নেই। আর তখনি বুদ্ধিটা মাথায় আসে তার। আর কিছু না হোক, একটা নতুন খেলার আয়োজন তো করা যেতে পারে।

আহমদ খলিল তার সাথীদের ডাকে, মাথায় গজিয়ে ওঠা নতুন খেলাটার কথা সে জানায় তাদের। এখান থেকে কয়েকশ' গজ দূরে নেগবার সীমানার মধ্যে একটা উঁচু মতো টিলা। তার ওপাশে যেন লুকিয়ে আছে ইহুদী হানাদাররা। আমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি–পরিকল্পনাটা বেশ ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে দেয় সে। তারপরই কচি কণ্ঠের রণহুঙ্কারে প্রান্তর কাঁপিয়ে ছুটে চলে চার শিশু সৈনিক টিলার দিকে ইহুদী শত্রুর সন্ধানে।

হাঁপাতে হাঁপাতে টিলার ওপরে উঠতেই চিৎকার করে উঠে রশিদ–দেখ দেখ, ইহুদীরা সত্যিই রয়েছে এখানে। রশিদের কথায় ঘাড় ফেরাতেই আহমদ খলিল নিজেও একটু চমকে ওঠে। আরে তাই তো! তাদের বয়সী একদল ইহুদী ছেলে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের পরনে শর্টস, গায়ে নীল শার্ট আর পিঠে ঝোলানো ন্যাপস্যাক। আহমদ খলিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে–তাদের কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। সে শুনেছে, দখলদার ইহুদীরা শিশু-কিশোরদের নিয়ে একটা প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেছে। তার নাম 'গাদনা'। এরা 'গাদনার' সদস্য কিনা তা বোঝার জন্যে তাদের গায়ের শার্টগুলোতে পরিচয় চিহ্ন খুঁজতে থাকে সে। অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়। না, এরা স্কুলগামী শিশুর দল। টিলার নীচের রাস্তা দিয়ে ওরা একের পর এক লাইন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। সবারই হাতে চকলেট বার কিংবা ফল দেখতে পায় আহমদ খলিল। নিশ্চিন্ত মনে খেতে খেতে, হাসতে হাসতে সুখী সুন্দর শিশুগুলো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দলের মধ্যে কেউ কেউ এতো ছোট যে, তার গায়ের উজ্জ্বল গোলাপী আভাটি পর্যন্ত এখনো মিলায়নি। আহমদ খলিলের মনটা হঠাৎ করে গভীর বিষাদে ছেয়ে যায়। ওই শিশুগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেদের দুর্দশাভরা জীবনের ছবিটি মূহূর্তে তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

ইহুদী শিশুগুলো টিলার ওপর দাঁড়ানো আরব শিশুদের দেখতে পেয়েছিল। আহমদ খলিলদের দিকে তাকিয়ে বন্ধু সুলভভাবে হাত নাড়াতে শুরু করে তারা। কেউ কেউ চলা থামিয়ে ওদের হাসিমুখে ডাকতে থাকে নেমে আসার জন্যে। কিন্তু ওরা কোন উত্তর দেয় না। এ সময় ইহুদী শিশুদের দু'একজন হঠাৎ করেই বিদ্রূপ করতে শুরু করে। ক্ষেপে ওঠে আহমদ খলিল। চটপট কয়েকটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ইহুদী শিশুগুলোর দিকে ছুঁড়তে শুরু করে সে। সাথে সাথেই আবদুল আজিজ, আসমা এবং রশিদও যোগ দেয় তার সাথে। ভীত-চকিত ইহুদী ছেলে-মেয়েগুলো পড়িমরি করে দৌড়ে পালিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

নেগবার এ অঞ্চলটার সাথে পরিচিত হয়ে আহমদ খলিল ভীষণ খুশী। সেই ঘটনার পর থেকে সুযোগ পেলে সে একাই এখানে চলে আসে। বলা যায়, এলাকাটার প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে। জায়গাটাও খুবই ভালো। অন্ততঃ আহমদ খলিলের তাই মনে হয়। তবে, এখানকার ইহুদীগুলো আরবদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করে না এটা স্পষ্ট বুঝেছে সে। তারা তার দিকে যখন তাকায় তখনি আহমদ খলিলের মনে পড়ে গাজার গভর্ণরের স্ত্রীর সেই ঘৃণাভরা দৃষ্টির কথা। গাজার গভর্ণরের স্ত্রী আর ইহুদীদের মধ্যে যে কোনোই পার্থক্য নেই একথাটাও বোঝা হয়ে গেছে তার।

নেগবাতে আহমদ খলিলের সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো ফলের বাগানগুলো। সকাল বেলায় গ্রাম ছেড়ে আসার পর সারদিন তার কাটে শহরের পথে পথে। ক্ষুধা পেলেই কোন বাগানের দিকে এগিয়ে যায় সে। কারণ বাগানগুলোর বাইরে পড়ে থাকে ফেলে দেয়া পচা এবং বেশি পাকা কমলাগুলো। সেগুলো কুড়িয়ে খেয়ে পেট ভরে যায় তার। এর মধ্যে বার কয়েক সে একটি ছোট্ট মুরগীর খামার থেকে গোটা ছয়েক করে ডিমও চুরি করে খেয়েছে কাঁচা অবস্থাতেই। মাঝে মধ্যে রাস্তায় হাঁটতে থাকলে তাকে দেখে চলন্ত কোনো ট্রাকের ড্রাইভার কি মনে করে ছুঁড়ে দেয় কখনো এক টুকরো, কখনো আস্ত একটা রুটি। বেকারীতে তৈরি এ রুটির স্বাদ বড় মজাদার। এভাবে কোন একটা রুটি পেলেই আহমদ খলিল দৌড়াতে শুরু করে গ্রামের দিকে। চাচাতো-মামাতো ভাই-বোনদের সাথে এ সুস্বাদু রুটি ভাগ করে খাওয়ার সম্ভাব্য আনন্দে নিমেষেই যেন ফুরিয়ে যায় পথের দূরত্বটুকু। তারপর সবাই মিলে মহা আনন্দে সে রুটির প্রতিটি কণার সদ্ব্যবহার করে।

একদিন আবদুল আজিজ আহমদ খলিলকে জিজ্ঞেস করে– আচ্ছা, নেগবা জায়গাটা কেমন? আমাদের গ্রামের চেয়ে কি খুব বেশি ভাল?

আহমদ খলিল জানে, আব্বার কড়া নিষেধের ফলে আবদুল আজিজ কোনদিন নেগবা শহরে যায়নি। তাকে সব কথা বলে বোঝানো মুশকিল। তাই সে সংক্ষেপে উত্তর দিল ঃ খুবই ভালো, যদি তার ভিতরের জঘন্য নোংরামি তোমার চোখে না পড়ে।

বারো বছরের আবদুল আজিজের কাছে এ কথার অর্থ অবশ্য পরিষ্কার হয় না।

কয়েকটি মাস পার হয়ে যায়। আহমদ খলিলের স্বাধীন মুক্ত জীবন এখন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে এবং অবিরাম কাজের ভিড়ে বন্দী। সে তার চাচীর কাছে নিজের কাপড়-চোপড় ধোয়া এবং রান্নার কাজ শিখে নিয়েছে। তাছাড়া বসে না থেকে সারাদিনই

কিভাবে কোন না কোন কাজ খুঁজে নিয়ে শেষ করতে হয়, সে শিক্ষাও চাচীর কাছ থেকে পেয়েছে। তাই দশ বছর বয়সেই কিভাবে কাজ করে দিন কাটাতে হয়–আহমদ খলিল তা শিখে ফেলেছে।

একদিন মাগরেবের নামাজ পড়া শেষ করেই আহমদ খলিল এক দৌড়ে চলে আসে মামার বাড়িতে। আবদুল আজিজ রাতের জমে ওঠা আঁধারে চুপ করে শুয়েছিল ঘরের এক কোণে। ক'দিন থেকেই সে অসুস্থ। থেকে থেকে কাশির দমকে কেঁপে উঠছিল সে। এ সময় আহমদ খলিলকে দেখে খুব খুশি হয় আবদুল আজিজ।

ঃ চল, ছাদে যাই আমরা। আবদুল আজিজ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু ছাদে উঠতে পারে না সে। শরীরে শক্তি নেই। ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি বয়ে তাকে ছাদে নিয়ে যায় আহমদ খলিল।

ইরাক আল মানশিয়ায় রাত নেমেছে। বহুদূরে আঁধারে ঢাকা নেগবার প্রান্তর। আকাশে তারার মেলা। নিঃস্তব্ধ চারদিক। দূরের মরুভূমি থেকে বইতে শুরু করেছে ঝিরঝির বাতাস। সে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায় তাদের। পাশাপাশি চুপচাপ শু'য়ে থাকে দু'জনে।

এক সময় কথা বলে আহমদ খলিল ঃ আচ্ছা, আমরা সেদিন যে ইহুদী ছেলে-মেয়েদের দলটার ওপর পাথর ছুঁড়লাম, ওরা যদি আসলেই 'গাদনা'র সদস্য হতো তা হলে?

ঃ তুমি তো এখন শুধু পাথর ছুঁড়ছ– আবদুল আজিজের গলায় প্রাপ্তবয়স্কদের গভীরতা, তুমি যখন বড় হবে তখন আর পাথর নয়, তখন তোমাকে ছুঁড়তে হবে রাইফেলের বুলেট।

একটু থামে আবদুল আজিজ। বলে– খুব শিগগিরই যুদ্ধ শুরু হবে। আমি জানি – যুদ্ধ একটা হবেই। তখন যে কি হবে ।

এর কদিন পরই জ্বরে ইন্তেকাল করে আবদুল আজিজ।

দীর্ঘ শীতের দিনগুলো শুরু হয়েছে। ইরাক আল মানশিয়ার লোকদের ঘরে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। প্রবল বৃষ্টির ফলে গ্রামের রাস্তাগুলো এক হাঁটু কাদার নীচে ডুবে আছে। মাঠেও তেমন কোন কাজ নেই। মালেক ওহাবের মনে হয়, এখনই উপযুক্ত সময়। আহমদ খলিলকে লেখা পড়া শেখানোর কাজটা শুরু করতে হয় এবার। তিনি গাজা থেকে সুন্দর এবং স্পষ্ট ছাপার একখানা কুরআন শরীফ এবং বার বার লেখা ও মোছায় রং চটে যায় না– এরকম একটা যুৎসই ব্ল্যাকবোর্ডও নিয়ে এলেন।

বারবার ডেকেও আহমদ খলিলের কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না মালেক ওহাব। অবশেষে আহমদ খলিল ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে এসে হাজির হয় তার আব্বার সামনে। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, তার আব্বা তার কাছে কি চান।

ঃ শোন– মালেক ওহাবের গম্ভীর গলা শোনা যায়–এখন তো করার মতো কোন কাজ নেই। এ ফাঁকে তোমার লেখাপড়ার কাজটা শুরু করে দাও। আমি তোমাকে সব কিছু শিখিয়ে দেব।

আহমদ খলিল অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে তার আব্বার দিকে তাকায়। সে জানে, তার মাঠে কাজ করার ব্যাপারটি তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি চান, আহমদ

খলিল লেখা-পড়া শিখে বড় হোক এবং শহরে গিয়ে জীবন যাপন করুক। এজন্য তিনি ছেলেকে আধুনিক স্কুলে ভর্তি করতে আগ্রহী। কিন্তু আহমদ খলিলের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। ইরাক আল মানশিয়া এবং নেগবার মালভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার নেই। তবে সে বোঝে, আব্বার তুলনায় সে একেবারেই অজ্ঞ এবং মূর্খ। আর সে সময় হঠাৎ করেই তার মনে হয়; পৃথিবীতে বহু কিছু জানার আছে আর তা জানতে পারলে তারই জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি পাবে। কুরআন পাঠ করতে শেখা এবং এর অর্থ জানার জন্যে তার মনে তখনই এক অদম্য আগ্রহ জেগে ওঠে। তার মনে হয়, তাকে হাদীস পড়তে হবে, আদর্শ সৃষ্টিকারী সাহাবাদের জীবন কাহিনী জানতে হবে, জানতে হবে অন্যান্য নবীদের কথা, এমনকি ইহুদী ও বৃটিশদের ইতিহাসও। আর এগুলো জানার জন্যেই সে আজ থেকেই লেখা পড়া শিখবে। আর এতে কোন ফাঁকি দেবেনা বলে মনে মনে শপথ নেয়।

মালেক ওহাব ছেলের ওপর অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে বিসমিল্লাহ্ বলে পড়াতে শুরু করেন। প্রতিটি শব্দ তার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন এবং উচ্চারণ করেন। আহমদ খলিল তাকে অনুসরণ করে। বার বার ভুল হয়। কিন্তু অসীম ধৈর্য নিয়ে মালেক ওহাব তাকে শেখাতে থাকেন।

ছোট্ট খলিফা প্রথম থেকেই আহমদ খলিলের পড়া লেখার বিষয়টি লক্ষ্য করছিল। তার গভীর দু'টি কালো চোখে প্রখর বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। আহমদ খলিলের পড়াশুনা শেষ হতেই ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আরবী অক্ষরগুলো এক এক করে উচ্চারণ করতে শুরু করে সে এবং কোন বাধা ছাড়াই নির্ভুলভাবে শেষ করে। মালেক ওহাব স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার এই চার বছর বয়সের অসাধারণ বুদ্ধিমান সন্তানের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

প্রথমে একটি অক্ষর। এরপর একটি অক্ষরের সাথে আরেকটি অক্ষরের সংযোগ। কয়েকটি অক্ষরে একটি শব্দ এবং কয়েকটি শব্দে একটি আয়াত। এভাবেই এক সময় হঠাৎ করেই আহমদ খলিলের সামনে পবিত্র কুরআনের কালো অক্ষরে ছাপা এতদিনের বন্ধ বাতায়নটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। কি অদ্ভুত শিহরণ! আহমদ খলিল নির্ভুলভাবে তরতর করে পড়ে যেতে থাকে –

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে,
যখন নক্ষত্র খসে পড়বে,
পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে

যখন জীবন্ত কবরস্থ করা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল

যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে
যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে
জাহান্নামে যখন অগ্নি উদ্দীপিত হবে
এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী হবে
তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।"

৮.

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর

গ্রামের মসজিদে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসা সুমধুর আযানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আহমদ খলিলের। উঠে বসে। খলিফা ও রশিদ কম্বলের নীচে গভীর ঘুমে মগ্ন। তাদের গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দেয় সে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সাথে সাথেই জেগে ওঠে তারা। ফজরের নামাজ পড়ে। তারপর দেয়ালের গায়ে বসে পড়ে হেলান দিয়ে। এখন তিনজোড়া চোখই একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হালিমার দিকে। চুলোর ওপরে সকালের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হালিমা। আরো কিছুক্ষণ পরে শুকনো সীম ও যবের রুটির মিশেলে তৈরী খাবার তাদের সামনে এস যায়। 'বিসমিল্লাহ্' বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সে খাবারের ওপর। কয়েকমুহূর্ত পর তাদের আঙ্গুলের ডগাগুলো খাবারের আর একটি দানাও খুঁজে পায় না। 'আলহামদুলিল্লাহ্'! মনসুর শোকরগুযারী করলেন আল্লাহর কাছে। ছেলেদের দিকে ফিরে তিনি বললেন ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের খাবার এবং পানি দিয়েছেন এবং আমাদের সৃষ্টি করেছেন মুসলিম হিসেবে। ছেলেদের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয় সে প্রশংসাবাণী।

এর পর মালেক ওহাব আহমদ খলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন– মাঠে যাবার আগে কুয়া থেকে আজ পানি আনার দায়িত্ব তোমার। হালিমা আজ খুবই ব্যস্ত। পানি আনার পাত্র দেখিয়ে তিনি বললেন – এটা নিয়ে যাবার সময় খলিফাকেও সাথে নিয়ে যেও। সে এখনো খুব ছোট, তাই সব সময় ওর দিকে খেয়াল রেখ।

আহমদ খলিল ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় তার ছোট ভাইয়ের দিকে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হল, খলিফা জন্মগ্রহণ না করলেই যেন ভালো ছিল। আহমদ খলিল ভাবে, সে তো আল্লাহর কাছে একটি ভাই কিংবা বোন চেয়েছিল যাতে একজন সঙ্গী বা খেলার সাথী পাওয়া যায়। তা না হয়ে একটা উটকো ঝামেলা কোত্থেকে এসে তার ঘাড়ে চাপল ? তার বয়স এখন এগারো। খলিফা তার চেয়ে সাত বছরের ছোট। এই ছোট বালকটির দেখাশোনা তাকে করতে হবে ভেবে আহমদ খলিলের মন বিষিয়ে ওঠে।

তবে খলিফা আহমদ খলিলের সাথে গেল না। ছোট্ট শিশুটি তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলো কে জানে, বার বার ডাকা সত্ত্বেও ঘরেই রয়ে গেল। ফলে মালেক ওহাবও বাধ্য হয়ে ঘরেই থেকে গেলেন।

কূয়ার ধারে পানি নেয়ার জন্যে গ্রামের বহু মহিলা ভিড় জমিয়েছিল। দূর থেকে বিরাট কলসি ঘাড়ে আহমদ খলিলকে আসতে দেখেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে তারা। কেউ কেউ আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দেয়। পানি নেয়ার কাজটা একান্তভাবেই মেয়েদের। একে তো মেয়েদের কাজটি পুরুষ হয়েও তাকে করতে হচ্ছে, তারপর এই ঠাট্টা বিদ্রূপে ভীষণ অপমানিত বোধ করে সে। দুঃখে, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে তার মুখ। মেয়েদের ভিড় ঠেলে কোন রকমে পানি ভরে বাড়ি ফিরে আসে আহমদ খলিল।

আহমদ খলিল এবং রশিদ দু'জনে মিলে মাটি খুঁড়ছিল। বেশ কিছুটা গর্ত হওয়ার পর অনেকগুলো বীজ তারা পুঁতে দেয় সেই গর্তে। আকাশের দিকে তাকায় আহমদ খলিল। ঝকঝকে নীল আকাশ। কোথাও মেঘের ছিঁটে ফোঁটাও নেই। নগ্ন সূর্য-তাপে কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। পানি এনে গর্তে ঢেলে দেওয়ার পর সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। বীজ থেকে চারা গজাবে, চারাগুলোর পাতা দোল খাবে মরুর বাতাসে, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষে নেবে প্রখর সূর্যালোক, বেড়ে উঠে এক সময় পরিণত হবে বিশাল মহীরুহ–আহমদ খলিল যেন স্পষ্ট ছবিটা দেখতে পেল। এ বছর ভাল ফসল হবে ইনশাল্লাহ। অন্তর থেকে কথাটার সমর্থন পেল সে। পানি ভেজা কিছু মাটি সে তুলে নেয় হাতে। দু'হাতের আঙ্গুলের চাপে দলা বানিয়ে ফেলে। মরুভূমিতে এ মাটির যে কি মূল্য তা একমাত্র ফেলাহীনরাই জানে। ইরাক আল মানশিয়ার অবস্থান মরুভূমির একেবারেই কিনারে। যতদূর চোখ যায়– রুক্ষ, ঊষর, মরুময় প্রান্তর। বাইরের কোন লোকের পক্ষে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে এখানে কোন শস্য ফলতে পারে। কিন্তু ফেলাহীনরা ঠিকই জানে যে কোথায় মাটি আছে, কোথায় শস্য ফলানো যায়। যেখানে মাটি আছে, নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি যত্ন নেয় তারা সে মাটিটুকুর। জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দই তারা খুঁজে পায় এর মাঝে। তবে মালেক ওহাব এ সবের মধ্যে কোন আকর্ষণ খুঁজে পান না। তিনি এটাও বুঝতে পারেন না যে আহমদ খলিল আর সব কিছুর চেয়ে মাঠে কাজ করতেই কেন বেশি ভালবাসে।

হঠাৎ করে একটা মটর গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। গাড়িটি নজরে আসা মাত্র ভীত সন্ত্রস্ত খলিফা এক দৌড়ে গিয়ে হালিমার পিছনে লুকিয়ে পড়ে। বাড়ির সীমানায় গাড়িটা এসে থামতেই আহমদ খলিল উঠে দাঁড়ায়। ইংলিশ স্যুট এবং লালটুপি পরা মোটা একটি লোক নেমে আসে। মালেক ওহাবের দিকে এগিয়ে যায় সে।

মালেক ওহাব মোটর গাড়ির শব্দ কিংবা তার দিকে লোকটির এগিয়ে আসা কিছুই বুঝতে পারেন নি। এক মনে একটি গর্ত খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। অবশেষে মোটা লোকটি –মুস্তফা এফেন্দী, জোরে তার নাম ধরে ডাকতেই সচকিত হয়ে মুখ তোলেন তিনি। মুস্তফা এফেন্দীকে দেখেই বোঝা যায়– এ লোক শুধু হুকুম করতে চায় এবং চায় লোকেরা তাকে মেনে চলুক। কিন্তু মালেক ওহাব তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালেন তাতে শুধু এফেন্দীর প্রতি তার ঘৃণা, ক্রোধ এবং ক্ষোভই ফুটে উঠলো।

কাজ ছেড়ে উঠে আসেন ওহাব। তার হাত-পা মাটিতে ভরে আছে। কোন ভণিতা না করে সোজাসুজি কাজের কথায় এলেন তিনি – কি ব্যাপার এফেন্দী। আপনার সাথে তো আমার আর কোনদিন দেখা হওয়ার কথা নয়। কি চান আপনি?

ঃ আমি তোমার ছেলে দুটোর কথা শুনেছি। আহমদ খলিলের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায় এফেন্দী– সম্ভবত এটিই তোমার বড় ছেলে। দেখতে তেমন সুবিধের না, তবে স্বাস্থ্যটা ভালোই মনে হচ্ছে ....।

অনেকগুলো মুহূর্ত নিঃশব্দে পার হয়ে যায়। আহমদ খলিল এফেন্দীর দিকে তাকায় এবং প্রথম দৃষ্টিতেই লোকটির প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় তার মন বিষিয়ে ওঠে। সে দেখে, হলদেটে চামড়ায় ঢাকা লোকটির বলি রেখাঙ্কিত মুখ, লালাভ চোখ। সে চোখে শুধু ঈর্ষা,

স্বার্থপরতা আর ধূর্ততার ছায়া। বাঁকানো নাক, মাংসের ভারে ঝুলে পড়া চিবুক। এর আগে এ রকম কুৎসিত ও কদাকার মানুষ আহমদ খলিল আর দেখেনি। সে অনেকটা সম্মোহিতের মতো অবাক বিস্ময়ে, অন্তর্জাত ঘৃণায় লোকটির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে।

মুস্তফা এফেন্দী ঘুরে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় আহমদ খলিলের দিকে। এমনভাবে তার দিকে তাকায় যেমনভাবে মানুষ তাকায় কোন ঘৃণ্য জীবের দিকে।

আহমদ খলিলের দিকে এফেন্দীর তাকানো দেখেই মালেক ওহাবের মনে শংকা জেগে ওঠে। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার? আমার ছেলেকে নিয়ে কি করতে চান আপনি?

ঃ আমার একটা চাকরের দরকার। ঘর পরিষ্কার করবে, মেঝে ঘষে সাফ করবে। এ কাজের জন্যে তোমার ছেলেটাকে খুব উপযুক্ত মনে হচ্ছে। নির্মম নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাগুলো বলে এফেন্দী।

ঃ সে ক্ষেত্রে অন্য কোথাও দেখতে হবে আপনাকে। আমার ছেলেকে দাস বানাবার জন্যে দিতে পারিনা আমি। তাছাড়া আপনি ভুলে যাবেন না যে তুর্কীরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ম্যাণ্ডেটে দাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও যদি আপনি ছেলেকে নিতে চান তবে আমি গাজার পুলিশের কাছে যাবো যাতে ওরা আপনাকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করে।

আত্মপ্রসাদের হাসিতে ভরে ওঠে মুস্তফা এফেন্দীর মুখ। বলে ঃ গাজার ইংরেজ অফিসাররা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর পুলিশ! ওদেরকে ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা করার কায়দা আমার জানা আছে। এই গ্রাম, জমি এবং এখানে বসবাসকারী সব ফেলাহীনই আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আমি এদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি।

মালেক ওহাবের দিকে বাঁকা চোখে তাকায় এফেন্দী ঃ তুমি ভুলে যেও না যে তোমার মা ছিল আমার বাপের এক রক্ষিতা দাসী। তুমি হয় আমার কথা মতো কাজ করবে আর নইলে আমি শস্যের খাজনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেব এবং তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আর পরিশোধ যদি না হয় তবে আর কেউ নয়, শুধু তুমিই এজন্যে দায়ী হবে।

ঃ না! চিৎকার করে উঠলেন মালেক ওহাব। এটা আমি হতে দেবনা। তার আগে আমি তোমাকে খুন করবো।

আহমদ খলিল ভয়ে দৌড়ে পালাতে চাইল। কিন্তু সে নড়ে ওঠার আগেই একজোড়া কঠিন হাত তার কাঁধ চেপে ধরলো। সে হাতে প্রচণ্ড শক্তি। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সে।

এ সময় গাড়ি থেকে আরো দু'জন লোক নেমে আছে। লম্বা চওড়া শক্তিশালী পেশী বহুল শরীর। এফেন্দীর পোষা গুণ্ডা। এফেন্দী ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠে ঃ আরিফ! এখনি একে গাড়িতে তোল।

আহমদ খলিল আবার প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু পারে না। লোক দু'টি দু'দিক থেকে তাকে ধরে ফেলে।

ঃ আব্বা! আব্বা! আহমদ খলিল চিৎকার করে।

একটি লোমশ হাত মুখ চেপে ধরে তার। তারপর শূন্যে তুলে নিয়ে যায় গাড়ির কাছে। আরেকজন দরজা খুলে ধরতেই নির্মম ভাবে আহমদ খলিলকে সে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির মধ্যে। তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় সিটের তলায়।

গাড়ি ছুটে চলে।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আহমদ খলিল ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিল। এখানে আসার দিনটি থেকেই সে পালাবার সুযোগ খুঁজিল। কিন্তু কোন সুযোগই সে পায়নি। মুস্তফা এফেন্দী তার ওপর কড়া নজর রেখেছিল। বাড়ির কারো সাথে দেখা করার অনুমতি তাকে দেয়া হয় নি। মালেক ওহাব বহু কাকুতি মিনতি করেছিলেন ছেলেকে একনজর দেখার জন্য। সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছে এফেন্দী। এমন কি ছেলের জন্যে কাপড় ও খাবার পর্যন্ত দিতে দেয়া হয়নি তাকে।

আহমদ খলিল বড় অসহায় বোধ করে। গ্রামের বা বাড়ির কারো কোন খবরই সে পায়না। তার দিন কাটে শত্রুভাবাপন্ন কিছু মানুষের সাথে। সারাদিন সে বাড়ির মধ্যে বন্দী থাকে। কখনো মেঝে মুছে, দেয়ালের ঝুলকালি সাফ করে, আসবাপত্র পরিষ্কার কিংবা বাগানে মালির কাজ করে তার দিন কাটে। এসব কাজে তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। কাজে কখনো গাফিলতি হলেই তার ভাগ্যে জোটে নির্মম প্রহার।

এর মাঝেই একদিন পালাতে গেল আহমদ খলিল। দুর্ভাগ্য, এফেন্দীর কুকুরটা টের পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। শুধু যে ভাল মত কিছু কামড় খেল সে তাই-ই নয়, এফেন্দী এসে কুকুরটাকে সরিয়ে না নিলে শরীরটা তখনই টুকরো টুকরো হয়ে যেত তার। এফেন্দী জানিয়ে দিল, সে যদি আবার পালাবার চেষ্টা করে তবে রাতে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে। নিজের দুর্ভাগ্য এবং অসহায়ত্বের কথা ভেবে আহমদ খলিলের বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসে।

কুকুরের খাবার তৈরি এবং খাওয়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আহমদ খলিলকে। এফেন্দীর কুকুরের জন্যে মাংস, ডিম এবং দুধের বরাদ্দ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। এত বিপুল পরিমাণ খাবার একটা কুকুরের জন্যে–এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তার। এক সঙ্গে এতটা খাবার এবং এত রকমের, সে জীবনেও দেখেনি। অল্প দিনের মধ্যেই একটা বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। প্রত্যেকবার খাবারের সময় যাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এমন ভাবে বেশ ভালো মত একটা অংশ নিজের পেটে দিতে শুরু করে সে।

আহমদ খলিল দেখে, গাজা থেকে প্রায়ই এফেন্দীর ইংরেজ বন্ধুরা আসে। আর তারা এলেই বিপুল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। ফল, মাখন, জলপাই, সেদ্ধ ডিম, রোস্ট করা মুরগী, ভেড়ার গোশ্‌ত ট্রের ওপর সাজিয়ে ওদের সামনে রাখে সে। পরে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ঈর্ষাতুর চোখে ওদের খাওয়া-দাওয়া দেখে। খাবার শেষে কারো উচ্ছিষ্ট গোশ্‌ত কিংবা অন্য যাই পড়ে থাক, আগ্রাসী ক্ষুধায় পরম পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে নিঃশেষ করে সে।

কখনো কখনো আহ্‌মদ খলিল স্পষ্ট বুঝতে পারে এফেন্দীর পরিবারের লোকেরা এবং ইংরেজ লোকগুলো তার সম্পর্কে আলোচনা করছে। কিন্তু এ বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না সে। তার একমাত্র লক্ষ্য, সুযোগ মতো কিছু খাবার হাতিয়ে নেয়া। এর বাইরে আর কোন ব্যাপারে কোন আগ্রহ তার আছে বলে মনে হয় না। তবে কখনো যদি পেটটা ভরে ওঠে অর্থাৎ ক্ষুধার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পায় তখন সে ড্রয়িং রুমে ইংরেজ অফিসার আর এফেন্দীর মধ্যকার কথাবার্তাগুলো কান পেতে শোনে।

একদিন এরকম খাওয়া-দাওয়ার পর মুস্তফা এফেন্দী তার ইংরেজ বন্ধুদের সাথে ড্রইংরুমে বসে গল্প-গুজব করছে। এগিয়ে যায় আহ্‌মদ খলিল। দেখে, এফেন্দীর হাতে ধরা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে ছাপা এক আরবী খবরের কাগজ। পিছন থেকে উঁকি দিয়ে খবরগুলো পড়ার চেষ্টা করে সে। জার্মানদের আত্ম-সমর্পণ এবং হিটলারের আত্মহত্যার কথা কাগজে লেখা হয়েছে। এর অর্থ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ। এতবড় খবরেও আহ্‌মদ খলিলের কোন ভাবান্তর হয় না। সে স্পষ্টই উপলব্ধি করে, এতে তার কোন আনন্দ বা দুঃখ কিছুই নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান তার দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না-তা সে ভালো করেই জানে।

ম্যাণ্ডেট সম্পর্কে অনেক কথা তার কানে আসে। ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা দিন দিন তাদের তৎপরতা জোরদার করছে। ইংরেজ সরকারের সাধ্য নেই তাদের দমন করা। সরকারের কাছে এমন কোন সমাধানও নেই যাতে আরব ও ইহুদীদের সমানভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। এমন সময় ঘরের মধ্যে কানাকানি শুরু হয়। আহ্‌মদ খলিল সচকিত হয়ে ওঠে কথাগুলো বোঝার জন্যে। সে একজন ইংরেজকে বলতে শোনে– পরিস্থিতি যদি আরো বেশী খারাপ হয়ে পড়ে তবে ইংল্যাণ্ড তার ম্যাণ্ডেট-প্রথার অবসান ঘটিয়ে সৈন্য তুলে নেবে। ইহুদী এবং আরবরা তখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ফয়সালা করে নেবে ফিলিস্তিন কাদের হবে। আহ্‌মদ খলিল কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে যায়। এটাও কি সম্ভব?

রাত গভীর হয়। সেদিনের মত কাজ শেষ হয় আহ্‌মদ খলিলের। এফেন্দী, তার স্ত্রীরা ও ছেলে-মেয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় নিজেদের শোবার ঘরের দিকে চলে যায়। এখন তার ওপর নজর রাখার আর কেউ নেই। এ সময়টা ভীষণ ভালো লাগে তার। পালানোর চিন্তাটা আবার তার মাথায় ঢোকে। কিন্তু সে যাবে কোথায়? আহ্‌মদ খলিল ভাবে। যদি কোন রকমে পালিয়ে সে তার গ্রামে পৌঁছে যায়ও, এফেন্দী সাথে সাথেই তা জানতে পারবে। কোন সন্দেহ নেই, তাকে আবার ধরে আনা হবে এবং তখন তার ভাগ্যে যে কি নির্মম শাস্তি লেখা আছে সেটা তার অজানা নয়। তাই পালানোর চিন্তাটা বাতিল করে দেয় সে।

রাতের গভীর অন্ধকারে আহ্‌মদ খলিল একমাত্র তখনই নিরাপদ বোধ করে যখন ছুরিটা সে হাতে নেয়। পরণের কাপড়ের ভাঁজে সারাদিন এটাকে লুকিয়ে রাখে সে। রাতে শোবার সময় বের করে হাতে নেয়। এফেন্দী যদি আবারো তার ওপর নির্যাতন চালায় তবে উপযুক্ত জবাব এবার সে দেবে।

হঠাৎ করে গায়ের কাপড়ে তার হাতের স্পর্শ লাগে। তার মনে পড়ে, আবদুল আজিজ মারা যাওয়ার ফলেই এগুলো পেয়েছে সে। তার গায়ে আরো যে তিনটি কাপড় আছে তাও আবদুল আজিজেরই। হঠাৎ তার মনে হয়–আবদুল আজিজ তার আশে পাশেই আছে, নিঃশব্দে।

রশিদ এবং খলিফার কথা মনে আসে তার। সে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করে–যদি সে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারে তবে খলিফাকে আর কখনো উত্ত্যক্ত করবে না কিংবা তার অমঙ্গল সূচক কোন কথা বলবে না। মানস চক্ষে সে দেখতে পায় তার গ্রামের প্রসারিত মাঠ। এখন জমি চাষের সময়। খুব শিগগিরই মাটির নীচ থেকে চারাগুলো বেরিয়ে আসবে আলো হাওয়ার স্পর্শ নিতে। যখন সে খুবই ছোট ছিল তখন তার মা মাঠে গিয়ে তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন সব রকমের গাছ-পালা। তাদের নামগুলোও তিনি বলে দিতেন তাকে। একবার নয়, বারবার– যাতে সে কোনদিন ভুলে না যায়।

চোখ ভাসিয়ে নেমে আসা অশ্রুর বন্যা ঠেকাতে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায় আহমদ খলিল। পা টিপে টিপে রান্না ঘরে গিয়ে কলের ট্যাপ খুলে চুপচাপ অজু করে নেয়। তারপর দাঁড়িয়ে যায় নামাযে।

একসময় নামায শেষ হয়– মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে আসে তার। আহমদ খলিলের মনে হয়–সে আর এখন একা নয়। সে আল্লাহকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাকে ভোলেন নি। চোখে ঘুম নেমে আসে। কম্বলটা খুঁজে নিয়ে অন্ধকারে ঢাকা বারান্দায় বেরিয়ে আসে সে, দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে শুয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তলিয়ে যায় গভীর ঘুমে।

৯.

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আহমদ খলিল শুনল, মুস্তফা এফেন্দী তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তাছাড়া, আজ তাকে কোন কাজ করতে হবে না।

অবাক হয় আহমদ খলিল। ব্যাপারটা কি? তবে কি এতদিন ধরে ঘরে ফিরে যাবার যে স্বপ্ন সে দেখে আসছিল তা আজ সফল হতে যাচ্ছে! কিংবা তার আব্বা কোন সহৃদয় বৃটিশ অফিসারকে ধরে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন? মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকা চিন্তাগুলো নিয়ে এফেন্দীর সামনে গিয়ে হাজির হয় সে।

ঃ শোন– মুস্তফা এফেন্দী বলতে শুরু করলো, টুকিটাকি কিছু জিনিস কেনার জন্যে আজ তোমাকে গাজায় যেতে হবে। বাড়িতে বহু মেহমান আসার কথা। তাদের জন্যে মিষ্টি আর তামাক নিয়ে আসবে তুমি।

কোথায় ভালো জিনিস পাওয়া যাবে এফেন্দী তা জানিয়ে দিল। তবে সাবধান করে দেয় সে– পালানোর কোন চেষ্টা করো না। লাভ হবে না। তুমি যেখানেই যাওনা কেন আমি তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করব। অতএব ।

গাজার প্রধান সড়কে এসে পৌঁছে আহমদ খলিল। পথ চিনতে তেমন অসুবিধে হয়নি তার। কারণ ছোটবেলায় তার চাচার সাথে বহুবারই সে এখানে এসেছে। আহামরি কোন শহর নয় গাজা, বরং একটা উন্নত ধরনের গ্রামই বলা চলে একে। বাজারে বেশ কিছু দোকানপাট। জায়গাটা ছোট, নোংরা এবং দুর্গন্ধময়। কিছু ট্রাক এবং স্কুটার দেখা যায় রাস্তাগুলোতে। সে রাস্তায়ও আবার কংক্রিটের কোন আস্তরণ নেই। গাধার চলাচলই বেশি। গাধাগুলোর পিঠে নিজেদের ওজনের চাইতেও বেশি যাত্রীর বোঝা কিংবা গ্যাসোলিনের টিন চাপানো। তবে দীর্ঘদিন ধরে এফেন্দীর বাড়িতে বন্দী আহমদ খলিল খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অনুভব করল, এ ছোট্ট শহরটি তার ভালো লাগছে। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে সে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে।

এফেন্দীর বলে দেয়া দোকানে পৌছে যায় আহমদ খলিল। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। টাকমাথা দোকানী এক কোণায় টুলের ওপর বসে অনবরত হুঁকো টেনে চলেছে। তার পাশেই রাখা একটা ছোট্ট রেডিও। তাতে ভেসে আসছে আরবী গানের সুর। কায়রো স্টেশন ধরা আছে বোধহয়– ভাবে আহমদ খলিল।

সামনে লোক দেখে মুখ তুলে তাকায় দোকানী।

ঃ আমার কিছু তামাক এবং মধু, শুকনো আঙ্গুর দেয়া পঞ্চাশটি কেক দরকার। জানায় আহমদ খলিল। তারপর থলে খুলে রুপো ও তামার মুদ্রাগুলো বের করে দোকানীর বাদামী হাতের তালুর ওপর রাখে।

ঃ মোটে! টাকার পরিমাণ দেখে তাচ্ছিল্য ফোটে দোকানীর গলায়। তা কতখানি তামাক দরকার তোমার? জানতে চাইল সে।

ঃ ছয়জন লোকের সারা দুপুর ও বিকেল ধরে হুঁকো টানার মত।

জিনিসগুলোর ব্যাপারে দর কষাকষির চেষ্টা করে আহমদ খলিল। কিন্তু এজন্যে যতটা চালাক-চতুর হওয়া দরকার, সে তা ছিল না। দোকানী টাকাগুলো আগে হাতে পাবার পুরো সুযোগটাই নিয়েছে। শেষে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হয় তার।

অবশেষে, দোকানী মিষ্টি কেক ও তামাক তার হাতে দিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়। আহমদ খলিলকে চলে যেতে দেখে ডাক দেয় সে—

ঃ শোন, জিনিসগুলো তো পেয়ে গেছ। এখন একটু বসে আরাম করে যাও। বেশ দূর থেকেই তো তুমি এসেছ, তাই না।

একটা টুল এগিয়ে দেয় সে তার দিকে। পাশে রাখা কফিপটটা নিয়ে এক কাপ কফি ঢেলে কাপটা বাড়িয়ে দেয় আহমদ খলিলের দিকে, এবার বলো, কে তুমি?

ঃ আমি মালেক ওহাবের ছেলে ।

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ খলিল।

ঃ মালেক ওহাবের ছেলে তুমি? বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে দোকানী।

এরপর একনাগাড়ে অনেক কথা বলে যায় সে। তার নাম ইসা বরকত। মালেক ওহাব এবং সে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহুদিন এবং রাত তারা কাটিয়েছে এক সঙ্গে। মালেক ওহাব এ দোকানে বসে বহুদিন তার সাথে জিনিসপত্র বিক্রি করেছে, খদ্দেরদের সাথে মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করেছে। প্রায়ই সে উদাত্ত গলায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত। ইসা আবার জাত গায়ক। মালেক ওহাবের আবৃত্তি করা কবিতাগুলোতে সে সুর দিত, গেয়ে শোনাত তাকে। বড়দিনের সময় সবার জন্য কেনাকাটা করতে গেলে মালেক ওহাবও তার সঙ্গে যেত। তাকে বেথলেহেম নিয়ে যেতে পারলে খুব খুশি হতো ইসা। প্রতি বছরই তার সাথে সে যেত পবিত্র স্থানগুলোতে ।

কথার মাঝে হঠাৎ বাধা হয়ে ওঠে আহমদ খলিল–

ঃ আপনি কি হজ্জ করেছেন? মক্কা-মদীনায় কতদিন ছিলেন?

ঃ না- বাবা, মক্কা-মদীনায় কখনো যাইনি আমি। সেখানে তো শুধু মুসলমানরাই যায়। ভরি হয়ে ওঠে ইসার গলা। আমি একজন খৃষ্টান। তোমার আব্বা প্রায়ই কুরআন পড়ে শোনাত আমাকে। যীশু এবং তার মায়ের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফিলিস্তিনের সব জায়গায় আমি ঘুরেছি। জেরুজালেম ও নাবলুসের পবিত্র স্থানগুলোতে আমি বহুবার গিয়েছি। ফলবান আঙ্গুরলতা, জলপাই বাগানে ঘেরা সূর্যতপ্ত ফিলিস্তিন তখন ছিল শান্ত ও সুন্দর। যীশুখৃষ্ট, বহু নবী এবং দরবেশের স্মৃতি এ দেশকে পবিত্রভূমিতে পরিণত করেছে। এ কারণেই এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইনি আমি।

আহমদ খলিল জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা, আপনি কি কখনো আমাদের গ্রামে গিয়েছিলেন? এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু।

ঃ হ্যাঁ, তোমার আব্বার খোঁজে একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবার তাকে পাইনি। ইসা বরকত জানালেন।

ঃ কেন, এমন তো হওয়ার কথা নয়। আমি জানি, আব্বা সব সময় গ্রামেই থাকতেন।

ঃ হয়তো তোমার কথা সত্য, আবার সত্য নাও হতে পারে। ইসা বরকত বললেন। তবে তোমার আব্বার কিছু ব্যাপার হয়তো তোমার জানা নেই। বলতে শুরু করলেন তিনি–

ঃ মুস্তফা এফেন্দী ও তোমার আব্বাকে ছোটবেলায় একজন দক্ষ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ভালো করে লেখাপড়া শেখানো হয়। পরে মুস্তফার আব্বা ফুয়াদ এফেন্দী দুজনকেই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে ইংল্যান্ড পাঠান। তবে এ সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাদের লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মালেক ওহাবকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেয়া হলেও মুস্তফার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। ইতিমধ্যে ফুয়াদ মারা গিয়েছিলেন। মুস্তফা নিজে অক্সফোর্ডে ভর্তি না হতে পারার ব্যর্থতায় এবং মালেক ওহাবের সাফল্যে ক্ষেপে ওঠে। সে তোমার আব্বাকে বিয়ে দিতে এবং তোমার চাচাসহ তাকে ফেলাহীনদের সাথে কাজ করার জন্য ইরাক আল মানশিয়াতে পাঠায়। আমি অবশ্য সব সময় মনে করতাম– তোমার আব্বা বড়জোর ওদের বাড়ির ভৃত্য হবে। কিন্তু সে যে একজন দাস– এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এ ঘটনায় খুবই আঘাত পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমার করার কিছুই ছিলনা। একমাত্র যা করতে পারতাম তা হল তার জায়গায় নিজে গিয়ে তাকে মুক্তি দেয়া।

গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ইসা বরকতের বুক চিরে। স্নেহমাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকান তিনি আহমদ খলিলের দিকে–

ঃ তুমি আর এক কাপ চা কিংবা কফি খাও বাবা। শরীরটা ভাল লাগবে।

ঃ না, না। প্রতিবাদ করে আহমদ খলিল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এবার চলি। উঠে পড়ে সে।

ঃ ঠিক আছে। ঈশ্বর তোমার ভালো করুন। আর হ্যাঁ, তোমার আব্বার সাথে দেখা হলে তাকে আমার কথা বলতে ভুলো না, কেমন?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় আহমদ খলিল।

জিনিসপত্র নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে খুব দ্রুত চলতে থাকে আহমদ খলিল। সে জানে, এত দেরি হওয়ায় মুস্তফা ঠিকই তার ওপর ক্ষেপে গেছে। কপালে মারধরও যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চলার গতি আরো দ্রুত করে সে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে তার শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত আহমদ খলিল রাস্তার ধারের একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়নের এক রমণী আহমদ খলিলের সামনে দিয়ে চলে যায়। তার মাথায় ঝুড়ি ভর্তি শসা। ঝুড়িটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ভারি। কিন্তু সে হেঁটে গেল অনায়াসে, দৃঢ় পায়ে। এ রমণীটির হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি অবিকল খাদিজার মতো। হঠাৎ করেই আহমদ খলিলের মনে হয়– তার আম্মাই যেন ফিরে এসেছে। মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে তার।

নতুন করে কারো পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে আহমদ খলিল। একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পায় এবার। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে পড়েছে। গায়ের কাপড় শরীরটা ঢাকতে পারিনি ভালোমতো। পেঁয়াজ ভরা মোটা একটা কাপড়ের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল– ব্যাগটি বইতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। আহমদ খলিলকে ছাড়িয়ে একটু সামনে গিয়েই পথের ওপর ধপ করে বসে পড়ে বৃদ্ধা। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বোঝা যায়, ব্যাগটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি আর তার শরীরে অবশিষ্ট নেই। পথিকেরা তার দিকে তাকিয়ে দেখে– কিন্তু সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে না কেউই।

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায় আহমদ খলিল। বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সযত্নে দাঁড় করিয়ে বোঝাটি কাঁধে তুলে দেয়। কাছেই একটা মসজিদ। তার মনে হয়, বৃদ্ধাকে ওখানে পৌঁছে দেয়াই ভাল হবে। তাহলে একটু বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে বাজারে যেতে পারবে সে।

বৃদ্ধাকে রেখে ফিরে আসার সময় আহমদ খলিল স্পষ্ট অনুভব করল, তার নিজের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। পকেট হাতড়ে শেষ সম্বল কয়েকটি পয়সা বের করে সে। শরবতের দোকান থেকে এক গ্লাস শরবত খেয়ে অনেকটা ভালো বোধ করে। এবার জিনিসপত্র নিয়ে এফেন্দীর বাড়ির দিকে রওনা হয় সে।

মুস্তফা এফেন্দীর বাড়িতে আসার পর দু'বছর কেটে গেছে। আহমদ খলিল এখন বহাল তবিয়তেই আছে। বেশ কিছু দিন থেকে কেউ তার ওপর আর নজর রাখে না। কোন ভুল ত্রুটি হলেও মুস্তফা এফেন্দী গায়ে হাত তোলে না আর। এর পেছনে অবশ্য কারণ আছে। মাস তিনেক আগে ছোট একটি ত্রুটির জন্যে এফেন্দী তার গায়ে হাত তুলতেই কোমরে কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা বের করে এনেছিল আহমদ খলিল। মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল তার। শেষ পর্যন্ত কি ঘটতো তা বলা যায় না। কিন্তু আহমদ খলিলের হাতে ছুরি দেখেই ঘরের মধ্যে পিছু হটতে শুরু করেছিল এফেন্দী। অবশেষে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকে যায় তার। পালাবার পথ নেই। উদ্যত ছুরি হাতে আহমদ খলিল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। চিৎকার করে কারো সাহায্য চাইবে কিংবা কিশোরটির কাছ থেকে ছুরি কেড়ে নেবে– এ শক্তিও তখন এফেন্দীর নেই। আর মাথায় খুন চড়ে যাওয়া আহমদ খলিল একটু অবাক হয়েই দেখে, নিশ্চিত মৃত্যুর আতঙ্কে এফেন্দী থর থর করে কাঁপছে। হঠাৎ করে কেমন যেন হয়ে যায় সে। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মৃত্যুর ভয়ে কাঁপতে থাকা শত্রুকে আঘাত করতে পারে না সে।

এ ঘটনার পর পুরো পরিবেশটাই একবারে বদলে গেছে। এফেন্দী তাকে আর বেশি কাজের জন্য বলে না। তাছাড়া যেখানে খুশি যে কোন সময় যেতে পারে সে। আর সবার মতো তাকেও ভাল খাবারই দেয়া হয় এখন। সবচেয়ে বড় কথা, এফেন্দী এখন আহমদ খলিলকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে।

বাড়ির ঘর-দোরগুলো নিজের ইচ্ছাতেই পরিষ্কার করে আহমদ খলিল। নানা ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকা এফেন্দীর বাড়িতে আছে। রোজই সেগুলো নাড়া-চাড়া করে সে। তবে খুব একটা সুবিধে হয় না। একেতো বিষয়গুলো তার মনের মত নয়, তারপর আবার তার পড়াও এগোয় খুব ধীর গতিতে। মূলতঃ ঘরের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবার মত কিছু সে পায় না।

ইদানিং বাড়ির কাজকর্ম সেরে প্রত্যেকদিন বিকেলে শহরে যেতে শুরু করেছে আহমদ খলিল। এ দোকান থেকে সে দোকান ঘুরে এবং বিচিত্র রকমের মানুষ দেখে সময় কাটে তার। তারপর রাতের আলো জ্বলারও অনেক পর মসজিদের মিনারগুলো থেকে এশার নামাজের আযান ধ্বনিত হতে শুরু করলে এফেন্দীর বাড়ির দিকে সে পা বাড়ায়।

দিন কয়েক পরে সকাল বেলায় এফেন্দীর সাথে দেখা হতেই এক প্রস্থ গালির ঝড় বয়ে যায় আহমদ খলিলের উপর দিয়ে ঃ এই ফকিরের বাচ্চা, এ দিকে আয়। গোসল করিস না কতদিন? উহ্! গায়ের বিটকেলে গন্ধে কাছে দাঁড়ানো পর্যন্ত যায় না। এভাবে থাকিস কি করে তুই? লজ্জা করে না? কয়েকটা টাকা এগিয়ে দেয় এফেন্দী। যা, গাজায় গিয়ে ভালো করে গোসল করে আয়। তোর এই বিশ্রি চেহারা যেন আমাকে আর দেখতে না হয় বলে দিলাম। এফেন্দী ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় কথা শেষ করে।

মেজাজটা প্রথমে তিরিক্ষি হয়ে উঠলেও পরে লজ্জায় ঘাড় নুয়ে আসে আহমদ খলিলের। সত্যিই তো, কতদিন যে সে গোসল করেনি তারতো কোন হিসেবই নেই। তাছাড়া একটা কথা মনে হতেই মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসার পর শয়তান এফেন্দী আজ পর্যন্ত তাকে একটা কাপড়ও দেয়নি। গোসল করে পরার মতো দ্বিতীয় কোন কাপড় তো তার নেই। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়, দুপুরে গাজায় গিয়ে আজ গোসল করে আসবে সে।

গাজায় রাস্তায় শুধু ট্রাক আর বাস। সৈন্য আর সাধারণ মানুষে ভর্তি। সবার কাছেই ব্যাগ-বোঁচকার ছড়াছড়ি। কোথায় যেন যাচ্ছে এরা। কৌতূহলী হয়ে ওঠে আহমদ খলিল। সরকারী গোসল-খানার কাছে গিয়ে সে আরো অবাক হয়। অন্যান্য দিনে এ সময় গোসলখানা থাকে লোক ভর্তি। আজ তা একেবারে শূন্য। এটেন্ড্যান্ট লোকটি একা বসে গভীর মনোযোগের সাথে রেডিও শুনছে। রোজকার মতো কায়রো রেডিওতে একটা ভারি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে। একটি ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে। আহমদ খলিল অবাক হয়ে শুনতে থাকে ঘোষকের কথা ঃ

কোল ইসরাইয়েল (ভয়েস অব ইসরায়েল)। আমি এইমাত্র একটি দলিল হাতে পেয়েছি যাতে বৃটিশ ম্যান্ডেটরী শাসনের অবসান এবং ইসরাইলিদের জন্যে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাসহ তার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

ইসরাইল ইহুদীদের জন্মভূমি। এ ঐতিহাসিক কারণে ইহুদীরা শত শত বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছে এবং নিজেদের দেশ ফেরত পাবার

দাবি জানিয়ে আসছে। বিগত কয়েকটি দশকে বিপুল সংখ্যক ইহুদী এদেশে ফিরে আসে। তারা বসতি স্থাপন করে, ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করে, গড়ে তোলে খামার ও শিল্প। তারা নিজস্ব অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিসহ একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে। তারা শান্তির প্রত্যাশী, নিজেদেরকে রক্ষায়ও সক্ষম। তাছাড়া সকল সম্প্রদায়ের জন্যেই তারা সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তাবাহক।

১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বেলফুর ঘোষণা দ্বারা আমাদের অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বৃটিশ ম্যান্ডেটে আমাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউরোপে নাজীদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ ইহুদী হত্যার ঘটনার আমাদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রয়োজনীয়তা নতুন করে গুরুত্ব পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফিলিস্তিনের ইহুদীরা মিত্র পক্ষকে সার্বিক সমর্থন দান করে। ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদীদের দাবী অনস্বীকার্য। অন্য আরো দশটি জাতির মত ইহুদীদেরও নিজেদের দেশের নেতৃত্বদানের অধিকার আছে। ইসরাইল রাষ্ট্র পৃথিবীর সকল দেশের ইহুদীদের বসবাসের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। দেশের জনগণের কল্যাণে অর্থনীতি, শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হবে। নবী ও মহৎব্যক্তিদের নির্দেশিত স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তি হবে রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি। এ রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকবে। ধর্ম, চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং এ রাষ্ট্র একনিষ্ঠাবে জাতিসংঘ সনদের মর্যাদা দেবে। আমরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের সকল আরব অধিবাসীকে শান্তি বজায় রাখতে এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হিসেবে সকল উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা পার্শ্ববর্তী সকল রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আমাদের প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছি এবং আমাদের সহযোগিতার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এ প্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলো। এ রাষ্ট্র 'ইসরাইল' নামে অভিহিত হবে, তেলআবিব হবে এর রাজধানী। ৫ই আইয়ার ৫৭০৮, ১৪ই মে ১৯৪৮ তারিখে এ ইসরাইয়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলো ।"

এ সময় এক গভীর নীরবতা রেডিও সেটটিকে গ্রাস করে। আর কিছু শোনার আগেই এটেনড্যান্ট বন্ধ করে দিল রেডিও সেটটা। আহমদ খলিল উপলব্ধি করে– বিরাট কোন ব্যাপার এখন ঘটে গেল। কিন্তু এর সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

গোসল সেরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সুগন্ধি সাবান এবং শীতল পানিতে গোসল করে এক অপূর্ব সুন্দর অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে তার। আয়নায় তাকিয়ে সে দেখে কালো কালো গোঁফের রেখা, শক্ত, সমর্থ হয়ে তৈরি হতে থাকা তার শরীর। এখনই যথেষ্ট লম্বা ও স্বাস্থ্যবান সে। একজন পুরুষ বলেই তাকে মনে হয়। কিন্তু, মালেক

ওহাবের চেহারাটা মনে পড়তেই চুপসে যায় সে। তার আব্বার তুলনায় শরীরের দিক দিয়ে সে এখনো একটি শিশুই রয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে এসে পরনের তোয়ালে খুলে রেখে বহু পুরনো, ময়লা চিটচিটে নিজের কাপড়গুলো পরে নেয়। দ্রুত বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

গাজার রাস্তায় মানুষের ছুটোছুটি। শত শত মানুষ গাড়ি ট্রাকসহ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেই চড়ে বসছে। সবার সাথেই মালপত্রের বোঝা, চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। কোথায়ও যাচ্ছে তারা। কিন্তু কোথায় এবং কেন তা সে ঠিক বুঝতে পারল না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না তার। এফেন্দীর বাড়ি লক্ষ্য করে দৌঁড়তে শুরু করে সে।

এফেন্দীর বাড়িতে একটি প্রাণীও নেই। সমস্ত বাড়ি জুড়ে খা খা করছে শূন্যতা। সব দরজাতেই দু'টি করে তালা ঝুলছে, কিন্তু জানালা খোলা। আহমদ খলিল চিৎকার করে লোকজনকে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া পায় না। বিস্মিত হয় সে। লোকজন গেল কোথায়? সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু কারোরই দেখা মেলে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। গাজায় খবরের কাগজ না পড়ার জন্যে এখন খুব আফসোস হয় তার।

তবে যাই ঘটুক না কেন, আহমদ খলিল স্পষ্ট অনুভব করে, তার আর এখানে করার কিছুই নেই। নিজের গ্রাম, আব্বার কথা মনে হয়। সেদিকেই পা বাড়ায় সে।

১০.

রমজান– বছরের সবচেয়ে পবিত্র মাসটি এসে গেছে। আগেকার বছরগুলোতে ইরাক আল মানশিয়ার শিশু-কিশোরদের জন্যে রমজান মাসটি ছিল বড় আনন্দের। এ সময় রাতের বেলা পুরো গাজা শহরটা হেসে উঠতো অসংখ্য লণ্ঠনের আলোয়। রাস্তায় রাস্তায় দেখা যেত মানুষের মিছিল আর মিছিল। পোষা ময়না তার ভালুক নিয়ে সবাইকে আনন্দ দিতে গ্রাম থেকে গ্রামে খেলা দেখিয়ে বেড়াত তাদের মালিকেরা। শুধু এরাই নয়– এ সময়ে আরো আসতো জাদুকর আর কথক। কথকেরা শোনাতো মহান বীর সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী ও সুলতান বায়বার্সের ফিলিস্তিনের মাটি থেকে খৃষ্টান ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দেয়ার চমকপ্রদ শৌর্য-বীর্যে ভরা কাহিনী-গাথা। আহমদ খলিলের মনে পড়ে সেই শেষ রাতগুলোর কথা। আব্বা, চাচা ও অন্যান্য পড়শীদের সাথে সে এবং আবদুল আজিজও শামিল হতো বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেহরী খাওয়ার জন্যে সকলকে জাগিয়ে তোলার আনন্দময় কাজে।

সেই রমজান মাস আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারের রমজানে আহমদ খলিলের মনে কোন আনন্দ নেই। বড় বেশি একা হয়ে পড়েছে। সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে– এফেন্দীর বাড়ি থেকে ঘরে ফিরে আসার পর তার আব্বা, ছোট ভাইসহ পরিবারের আর সবার সাথে তার এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাদের কাছে সে এক আগন্তুক বই নয়। অথচ কি অদ্ভুত সুন্দর মুক্তির স্বাদ এবং বুক ভরা আনন্দ নিয়েই না সে বাড়ি ফিরেছিল। আব্বার কাছে আবার ফিরতে পারছে– এ খুশিতে আর কিছুই তার নজরে আসেনি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই সব আনন্দ মিলিয়ে যায়। এখন মালেক ওহাবকে সর্বান্তকরণে এড়িয়ে চলে সে।

সত্যি কথা, তার আব্বার কোন প্রত্যাশাই আহমদ খলিল পূর্ণ করতে পারেনি। এফেন্দীর বাড়িতে কয়েক বছর কাটিয়ে সে অনেক কিছুই দেখেছে, শুনেছে ও জেনেছে বলেই মালেক ওহাবের বিশ্বাস। গাজা শহরে সে কি দেখেছে, খবরের কাগজ, বই ইত্যাদি পড়ে সে কতটুকু জানতে পেরেছে, এফেন্দীর বাড়িতে যাতায়াতকারী বৃটিশ অফিসাররা কি আলোচনা করত– এ সবই তিনি আহমদ খলিলের কাছে জানতে চান। কিন্তু আহমদ খলিল কিছুই বলতে পারে না। বেশ কয়েকদিন বহুবার জিজ্ঞেস করার পরও সে কোন কথা বলেনি বা বলতে পারেনি। দুঃখে, ক্ষোভে তাকে তিরস্কার ও গালাগালিও করেছেন মালেক ওহাব। এর ফলে আহমদ খলিলের সাথে তার আরো বেশি ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়।

আহমদ খলিল যে তার আব্বার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সে বলতে পারে না যে খাদিজা ইন্তেকাল করার পর থেকে কি গুরুভার একাকীত্ব তাকে বছরের পর বছর ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এফেন্দীর বাড়িতে যে সময়টা সে কাটিয়েছে তার মধ্যে কোন শান্তি, স্বস্তি বা সান্ত্বনা ছিল না। একটা ক্রীতদাসের মতো সে শুধু মুখ বুঁজে কাজ করে গেছে, হুকুম তামিল করেছে। লেখাপড়া করার কোন রকম আগ্রহই তার মধ্যে ছিল না। তাই, মালেক ওহাবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে এখন সে শুধু ভয়ই পায়, প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না।

আহমদ খলিল আরো দেখে, খলিফার সাথেও তার বিরাট ও অনতিক্রম্য এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। খলিফা তার এক মাত্র ভাই এবং ছোট ভাই। তার বয়স এখন সাত। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক ভাবে সে এখনো একটি ছোট্ট শিশুর মতই রয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের দিকে সে তাকায় এক অপরিচিত দৃষ্টিতে। আহমদ খলিল বহু চেষ্টা করেও রুগ্ন, দুর্বল, ভাইটিকে আপন করে তুলতে পারে না। এক সময় ভাইয়ের প্রতি স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা উবে গিয়ে আহমদ খলিলের মনে জন্ম নিতে থাকে এক ধরনের ক্রোধ ও ঘৃণা। খলিফা ছোট হলেও বড় ভাইয়ের এ বৈরী দৃষ্টি চিনতে ভুল করেনি। ফলে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়।

মালেক ওহাব নিজেও খলিফাকে নিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। খাদিজার মৃত্যুর পর শিশু সন্তানটিকে স্নেহ-মমতা উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। তবে তার চেয়েও খলিফার জন্যে বেশি করেছে খাদিজার ভাই ইউসুফ মালিক ও তার স্ত্রী নাঈমা। আসলে খলিফাকে বড় করে তুলেছে তারাই। বিশেষ করে, নিজেদের প্রথম সন্তান আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর খলিফা হয়ে উঠেছে ইউসুফ ও নাঈমার নয়নের মণি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সাত বছরে পড়ার পরও খলিফা এখনো স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। মালেক ওহাবের একান্ত আশা ছিল খলিফাকে ডাক্তারী পড়াবেন, সে গ্রামে ফিরে এসে অশিক্ষিত ফেলাহীনদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে, সবার রোগ সারিয়ে তুলবে, খাদিজার মতো আর কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। কিন্তু সব আশা নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে মালেক ওহাব এখন শুধু নিজের ভাগ্যকেই অভিশাপ দেন। খলিফাকে দেখলেই এখন তার মেজাজ বিগড়ে যায়, স্নেহ-মমতার টান তিনি অনুভব করেন না।

সেদিন মালেক ওহাব ঘরে ঢুকেই দেখলেন, ইউসুফ মালিক মেঝেতে বসে আছেন। তার কোলে বসে আছে খলিফা। ইউসুফ পরম যত্নে ভালো ভালো কিছু খাবার বালকটির মুখে তুলে দিচ্ছেন। আর সেও একান্ত অভিনিবেশ সহকারে খেয়ে চলেছে। হঠাৎ করেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মালেক ওহাবের। কণ্ঠে একরাশ ঘৃণা নিয়ে ইউসুফের উদ্দেশ্যে তিনি বলে উঠেন ঃ ওকে যে কি করে তোমরা এত ভালবাস তা আমি বুঝতে পারি না। ওতো একটা অবোধ জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা জানো না, খলিফা আর কোনদিনই স্বাভাবিক হবে না। তাছাড়া ......।

মালেক ওহাবকে কথা শেষ করতে দিলেন না ইউসুফ মালিক। বেদনাহত স্বরে তিনি বললেন ঃ এসব কি বলছেন আপনি? আপনিই যদি এরকম অবহেলা করেন তাহলে ওকে আর দেখবে কে?

আহমদ খলিল পাশেই বসেছিল। ইউসুফের কথায় চমকে ওঠে সে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, তাইতো! এ কথাটা তো সে কোনদিন ভাবেনি। খলিফার প্রতি এতদিন

সে শুধু বিরক্তি, ঘৃণা আর বিতৃষ্ণাই পোষণ করে এসেছে। কিন্তু সে তো তারই ভাই, একই মায়ের সন্তান। এখন পর্যন্ত খলিফা ভালো করে হাঁটতে পারে না। এক গভীর বিষণ্নতা ছড়িয়ে থাকে তার সারাটা চেহারায়, সব সময়। সে কোনদিন তার মত সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারবে কি না, কে জানে! মনটা অনুশোচনায় ভরে ওঠে আহমদ খলিলের। খলিফার প্রতি এক গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধে তার হৃদয় উদ্বেলিত হতে থাকে।

সারাদিন নগ্ন, তীক্ষ্ণ উত্তাপ ঢেলে সূর্যটা সবে মাত্র মুখ লুকিয়েছে মরুভূমির দূর দিগন্তের অন্তরালে। আহমদ খলিল একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সেদিকে। আজ ক'দিন ধরে তার মনের মধ্যে গভীর বিষাদ বাসা বেঁধে আছে। চারপাশের নিস্তব্ধ পরিবেশটা ভালো লাগতে থাকে তার। কখন যে নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল তা সে জানে না। গ্রামের নারী ও শিশুদের আতঙ্কিত চিৎকার কানে আসতেই চমকে সে ওঠে। সামনে তাকিয়েই বরফের মতো জমে যায় সে। সৈন্যবাহী ট্রাকটাকে তাদের ঘরের সামনে এসে থেমে যেতে দেখে আহমদ খলিল। ট্রাকটা থামার সাথে সাথে দশ বারো জন ইহুদী সৈন্য লাফ দিয়ে নেমে আসে। হাল্কা মেশিনগান তাদের হাতে। পর মুহূর্তেই বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। সৈন্যদের অধিকাংশই সুন্দরী তরুণী। সে অবাক হয়ে দেখে শর্টস ও খাকি হাফ প্যান্ট পরা মেয়ে সৈনিকগুলোকে পুরুষের চেয়েও নির্মম, নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। বিস্ময় বিমূঢ় আহমদ খলিল সংবিত ফিরে পায়। সৈন্যরা ইতিমধ্যে বাড়ির সবাইকে আটক করে ফেলেছে। মালেক ওহাব, ইউসুফ মালিক কিংবা খলিফা কেউই বাদ যায়নি। সবাইকে তুলে নিয়ে ট্রাকটি ছুটে চলে।

কিছুক্ষণ চলার পর সৈন্যরা চিৎকার করে সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে আসার হুকুম দেয়। জায়গাটা নেগবা। ট্রাকে করে এর আগে গ্রামের আরো প্রায় ত্রিশ জনকে ধরে আনা হয়েছিল। ইহুদী সৈন্যরা ভেড়ার পালের মতো সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে একটি লম্বা, দরজা জানালাহীন ঘরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। এটি ছিল নেগবার জেলখানা। ফিলিস্তিনী বন্দীদের নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবেও ইহুদীরা এটাকে ব্যবহার করত।

কিছুক্ষণ পরই বাইরে থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে– গ্রাম প্রধানকে এখানে নিয়ে এসো। সৈন্যরা ইউসুফ মালিককে বন্দীদের মাঝ থেকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বারান্দায় একটা খোলা ডেস্কের ওপাশে লোকটি বসে। ইউসুফ মালিক দেখেই বুঝলেন– লোকটা ইহুদী স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল হোগানার একজন বড় পদের অফিসার। তার অভিব্যক্তিতে প্রচণ্ড কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। ডেস্কের কাছে পৌঁছতেই সে হিব্রু ভাষায় ছাপা একটি কাগজ তার দিকে এগিয়ে দেয়। কাগজটা যে কোন দলিল, তাতে ইউসুফ মালিকের সন্দেহ নেই। বুড়ো আঙ্গুলে কালি লাগিয়ে কাগজে একটা টিপসই দেয়ার আদেশ দেয় লোকটি। কিন্তু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন ইউসুফ।

ইউসুফের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করে ক্ষেপে ওঠে হোগানা অফিসার ঃ গাধা নাকি হে তুমি! শোন, যদি বাঁচতে চাও– কাগজে একটা টিপসই দাও। এতে প্রমাণ হবে যে তোমাদের জমির উপর আমাদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছ। তাছাড়া তোমরা তো

জানোই যে, এফেন্দী বহু বছর আগেই এ জমি আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। একটু থামে অফিসারটি। শোন, এ জমির জন্য প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই আমাদের বুঝলে? অনেকটা রক্ত আমরা এর মধ্যেই এখানে ঢেলেছি। দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তাছাড়া আমাদের সাথে যুদ্ধে জেতার কোন সম্ভাবনাই তোমাদের নেই। সুতরাং ইরাক আল মানশিয়ার উপর আমাদের অধিকার স্বীকার কর। ইখওয়ানদের অস্ত্র বা কোন রকম সাহায্য দেয়াও তোমাদের বন্ধ করতে হবে। আমাদের কথা মানলে তোমাদের এমন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে যা হাজার বছরেও তোমাদের জাত ভাইদের কাছ থেকে পাওনি ।

ছাপানো দলিলটা থাবা দিয়ে টেবিল থেকে তুলে নেন ইউসুফ। মুহূর্তের মধ্যেই তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেন তিনি। চিৎকার করে বলেন–

ঃ তোমরা কখনোই আমাদের শাসন করতে পারবে না। এখানে তোমাদের কিছুই নেই। এ জমি আমাদের। তোমরাই তা কেড়ে নিয়েছ এবং আরো নিতে চাইছ। আমাদের ঘোড়া চুরি করেছ, পানির ঝর্ণাগুলো কেড়ে নিয়েছ। আর কি চাও তোমরা? প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মাদের মতো বলতে থাকেন ইউসুফ ঃ আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দাও। যদি বাঁচতে চাও সমুদ্র পারের যে দেশ থেকে এসেছ সেখানেই চলে যাও। এদেশের সবকিছু গ্রাস করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। কথা শেষ করে উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন ইউসুফ।

হোগানা কমাণ্ডারের গলা শোনা গেল ঃ আমরা জানি, আমাদের উপর হামলার জন্য ইখওয়ানদের তুমি নিজের গ্রামে ঘাঁটি তৈরি করতে দিয়েছ। তোমরা তাদের খাবার দাও, লুকিয়ে রাখ, তাদের আশ্রয় এবং উৎসাহ দাও বলেও আমরা জানতে পেরেছি। এসব তুমি বন্ধ করবে কিনা বল? নইলে তোমাকে গুলী করে মারব আমি।

ঝট করে কোমর থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে ইউসুফ মালিকের বুকের দিকে তাক করে অফিসার। মনে হলো এখনই গুলী করবে। সে ইউসুফ মালিকের চোখের দিকে তাকায়। দেখতে পায় দু'টি উজ্জ্বল কালো চোখ, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক, ঘন দাড়ি ও কাফিয়াহ্‌তে ঢাকা দীপ্ত একটি মুখ। দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত। হাত নামিয়ে নেয় অফিসার।

ঃ নিয়ে যাও একে - সৈন্যদের প্রতি বাজঁখাই গলায় হুকুম দেয় সে। মরুভূমির এই ইঁদুরগুলো কিছুতেই নিজেদের ভালোটুকু বুঝবে না। ঠিক আছে, সবক'টাকে ইরগুনের হাতে তুলে দাও। এমন শিক্ষা পাবে যা সহজে ভুলতে পারবে না।

ইরগুন হলো ইহুদীদের গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সাধারণ মানুষ এর নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে। বুশেন ওয়ার্ল্ড, ডসাউ, বার্জেন বেলসন ও অসউইজ নাৎসী নির্যাতন শিবির থেকে বেঁচে যাওয়া যুবক যুবতীদের নিয়ে এ সংস্থা গঠিত। আত্মপরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ইরগুন সদস্যদের মুখ ঢাকা থাকে কালো মুখোশে। এর ফলে ওদের আরো বেশি ভয়ংকর দেখায়।

ইরগুনের দু'জন সদস্য বন্দীদের দিকে এগিয়ে আসে। শুরু হয় নির্মম প্রহার ও নির্যাতন। ভাগ্যক্রমে খুব ছোট বলেই হয়ত, আহমদ খলিল, আবদুর রশিদ ও খলিফার

দিকে ওরা নজর দিল না। ছোট বালক দু'টিকে যাতে ভয়ংকর কিছু স্বচক্ষে দেখতে না হয় সে জন্য কাফিয়াহ্ দিয়ে ওদের চোখ বেঁধে দিল আহমদ খলিল। কিন্তু নির্যাতনের চিৎকার আর্তনাদ ওদের কানে ঠিকই প্রবেশ করে।

সকাল বেলায় ছাড়া পায় সবাই। ঠিক সবাই নয়। নির্মম নির্যাতনে নিহত সাতজন সাথীর লাশ নিয়ে বাকি লোকেরা ইরাক আল মানশিয়ার দিকে এগিয়ে চলে। যারা আহত এবং হাঁটতে অসমর্থ, অপেক্ষাকৃত শক্তিমানেরা তাদের কাঁধে তুলে নেয়।

গ্রামে ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সবাই এসে পৌঁছতেই আহতদের চিকিৎসার কাজ শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের দু'জন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত। গুরুতর আহত ইউসুফ মালিকের জন্যে একটি ষ্ট্রেচার নিয়ে আসা হয়। ইরগুনের ঘাতক সদস্যরা তার পেটে গুলী করেই থামেনি, সিগারেটের আগুন দিয়ে শরীরের গোপন অঙ্গ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে পশুরা। ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবীরা ইউসুফের তীব্র ব্যথা কমানোর জন্য আগেই মরফিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে দেয়। এরপর ক্ষতস্থানে গজ ভরে বেঁধে দেওয়ার পর গাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই বাধা দেন তিনি। ইউসুফ মালিক তাদের বোঝান যে হাসপাতালে নিলেও তার বাঁচার কোন আশা নেই। তার চেয়ে এখানে চিকিৎসা হওয়ার দিকেই বেশী জোর দেন তিনি। ইখওয়ান সদস্যরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

সেদিনের আতংক ভরা রাতের পর আরো পাঁচ দিন কেটে গেছে। গোত্রের আহত আট জনের অবস্থা এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু আগের চেয়ে ইউসুফ মালিকের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। প্রচুর রক্তপাতের ফলে তার শরীর হয়ে উঠেছে রক্তশূন্য। তাছাড়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ভিতরের ক্ষতগুলোতে পচন ধরেছে। অত্যধিক পরিমাণ সালফাড্রাগস এবং পেনিসিলিন আসন্ন মৃত্যুর সামনে শুধু প্রতিরোধের সাময়িক একটি দেয়াল তৈরি করে রাখে।

ইহুদীদের নির্মম হামলার মুখে টিকতে না পেরে ফিলিস্তিনীরা প্রাণের ভয়ে দলে দলে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। তাদের যাবার পথটা এগিয়ে গেছে ইরাক আল মানশিয়ার সামনে দিয়েই। আহমদ খলিল সারাদিন ধরে প্রাণের মায়ায় ছুটতে থাকা অসহায় বাস্তুহারা মানুষগুলোর চলে যাওয়া দেখে। তার মনে হয়, ফিলিস্তিনে হয়ত শেষ পর্যন্ত কোন আরবকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকা কাফেলার কোন দল রাত্রি নেমে এলে ইরাক আলমানশিয়ায় আসে। ছোট গ্রামটির ঘরবাড়ি ভরে ওঠে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে। পরিশ্রান্ত শরীরে তারা ঘুমিয়ে পড়ে যেখানে সেখানে। আর আহমদ খলিল দেখে, রাত একটু গভীর হতেই তার আব্বা গিয়ে বসেন অত্যাচারিত মানুষগুলোর পাশে। তার বড় বড় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের সড়কের দিকে। এ পথ ধরে আবারো যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ইহুদী হায়েনারা। কোলের উপর রাখা তার প্রিয় রাইফেল। পলায়মান মানুষগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে স্বেচ্ছায় রাত জেগে পাহারার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি।

১১.

রমজান শেষ হয়ে আসে। তারাবীর শেষ দিনে ইউসুফ মালিক এসে হাজির হন মসজিদে। অর্ধেক তারাবী হওয়ার পর যার দু'জন ইখওয়ান কর্মীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যন্ত্রণাকাতর শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে মিম্বরে ওঠেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন। সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে নীরবে নিজের সাথে যুদ্ধ করে যেন কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে নিলেন তিনি। উপস্থিত গোত্রবাসীরা দেখছিল তার দুর্বল শরীর, পাণ্ডুর হয়ে আসা মুখ। মনে হচ্ছিল, তার শুকনো শরীরে চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। অবশেষে কথা শুরু করেন ইউসুফ গম্ভীর ও বলিষ্ঠ গলায়–

'আমরা অন্য ফিলিস্তিনীদের মত নই। আমরা তাদের মত নই যারা আমাদের শক্রদের ন্যায় আল্লাহকে অবিশ্বাস করে এবং বিবেকহীন, যারা শুধুমাত্র এক টুকরো জমির জন্য হয়ে উঠতে পারে নির্মম ও বেপরোয়া। আমরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি তা জেহাদ ....।

ইউসুফের কথায় বাধা পড়ে। আহমদ খলিলের সামনে বসে থাকা একটি কিশোর ভয়ানক ভাবে কাশতে শুরু করেছিল। কাশির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার শরীর। কাশি থামতেই নোংরা কম্বলের একটা অংশ দিয়ে সে তার মুখ মোছে। দেখা গেল, কাশির সাথে উঠে আসা রক্তে তা ভরে গেছে।

সে দিকে একনজর তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করেন ইউসুফ মালিক–

'আমরা শুধু ইহুদীদের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করছি না। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে অশুভ চক্রান্ত শুরু হয়েছে তার মোকাবেলার জন্য এবং চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা যুদ্ধ করছি। অন্যান্য গ্রাম, শহর, নগরের অধিবাসীরা দুশমনদের মোকাবেলা না করে পালিয়েছে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন বা দুশমনরা যাই করুক না কেন আমরা পালিয়ে যাব না। এমনকি ইরগুন যদি দাইর ইয়াসিনের মতে এখানেও গণহত্যা চালায় তবুও আমরা ভেড়া বা দুম্বার মত প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাব না। এটা আমাদেরই জন্মভূমি এবং আমরা শক্রর মোকাবেলা করে যাব।

ইউসুফের বক্তৃতা শেষ হতে খলিফা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। ইউসুফের দুর্বল শরীরে দাঁড়ানোর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় মিম্বরের উপরের ধাপটিতে বসে পড়েন। ছোট্ট বালকটিকে দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে নেন তিনি। এসময় খলিফাকে দেখে মনে হচ্ছিল, কি এক গভীর চিন্তায় যেন সে নিমগ্ন। আরো মনে হচ্ছিল, ইউসুফ মালিকের সব কথাই সে বুঝতে পেরেছে।

রমজান মাস শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ হয় নি প্রচণ্ড খরার নির্মম দহন। মাঠগুলোকে এখন মরুভূমি থেকে আলাদা করে চেনাই শক্ত। এবারও শীতকালে বৃষ্টি হয় নি। সারা প্রান্তরে কোথাও সবুজের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এমন কি গিরগিটিগুলোও আর এখন মাটির উপর বেরিয়ে আসে না। শুকনো মাটির তীব্র উত্তাপ থেকে রেহাই পেতে একটু আর্দ্রতার সন্ধানে তারা ঢুকে গেছে মাটির আরো গভীরে।

আকাশের নীচে পাখিদের ওড়াউড়িও বন্ধ। আছে একমাত্র শকুনগুলো। সারাদিন তারা কুৎসিত দেহছায়া নিয়ে উড়ে বেড়ায় বাধাহীন উন্মুক্ত আকাশের বুকে। বিরল শিংওয়ালা হরিণের পাল অধিকতর উর্বর ভূমির সন্ধানে চলে গেছে উত্তর দিকে।

খলিফা এবং রশিদের পাশে নীরবে বসেছিল আহমদ খলিল। তীব্র আগুনে ঝাঁজ এবং উড়ন্ত বালি থেকে রেহাই পাবার জন্য ওদের সারা মুখ কাফিয়াতে ঢাকা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। তিনজোড়া চোখ আকুল তৃষ্ণায় চেয়ে থাকে দূর দিগন্তে। তাদের ব্যাকুল দৃষ্টি আকাশের কোণে এক টুকরো মেঘ খুঁজে ফেরে। কিন্তু হতাশায় ভরে ওঠে তাদের মন। মেঘের কোন চিহ্নই আকাশে খুঁজে পায় না তারা।

প্রচণ্ড খরার এই দিনগুলোতেও মালেক ওহাব এবং তার ভাই মনসুর ইহুদী হামলার হাত থেকে গ্রামকে রক্ষার কাজে অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যস্ত। ইহুদীরা যে কোন সময় ইরাক-আল-মানশিয়াতে হামলা চালাতে পারে। গ্রামের চারপাশে পরিখা খুঁড়ে ইহুদীদের হামলা ঠেকানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মালেক ওহাব। বেঁচে থাকা গ্রামবাসী এবং ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবীরা তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল আহমদ খলিল দাঁড়িয়ে বিষন্ন চোখে তাকিয়ে দেখছিল গ্রামবাসীদের এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। দুর্ধর্ষ বেদুইন যোদ্ধারা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাওয়া আসা করছে গ্রামের সংকীর্ণ পথে। মাঝে মাঝেই শূন্যে রাইফেল ঘুরিয়ে রণহুংকার দিয়ে উঠছে তারা। সিরীয় সৈন্যেরা নেগবা অবরোধ করে রেখেছে। ইহুদীদের পতনের আর বেশী দেরি নেই। এই আসন্ন বিজয় সম্ভাবনায় বেদুইনরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। তবে নেগবার ইহুদীদের অবস্থা ইরাক আল মানশিয়ার মত নয়। বরোধ শুরু হতেই ধূর্ত ইহুদীগুলো ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়ে ঢুকে পড়েছে। খাদ্য বা অস্ত্রের তেমন অভাব এখনও তাদের ঘটেনি। তাই, বেশ জোরালোভাবেই প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

এর মধ্যেই নেগবার ইহুদীদের জন্যে সাহায্য এসে যায়। খুব তাড়াতাড়িই অবরোধ ভেঙ্গে পড়ে এবং যুদ্ধের গতি যায় আমূল পাল্টে। ইরাক-আল মানশিয়ার অধিবাসীরা যারা এখনো বেঁচে আছে - বুঝতে পারে, এবার চূড়ান্ত হামলা আসছে। তারই প্রতীক্ষায় আছে তারা। কে জানে, কত মানুষের রক্ত এবার মরুভূমির রুক্ষ বুকে ঝরবে!

আহমদ খলিলের চোখে তন্দ্রা নেমে এসেছিল। হঠাৎ যেন তার কানে আসে পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

" আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের তোমরা মৃত বল না। তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। "

তার মনে হল, রাস্তার হৈ-হট্টগোল এখন অনেক দূরে সরে গেছে। কানে এখনো বেজে চলেছে সেই অপার্থিব ধ্বনি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে তার। পায়ের নীচে মাটি দুলতে থাকে। বসে থাকার মত শক্তি সে শরীরে পায় না। প্রাণপণ চেষ্টায় সে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। অবশেষে ঘরে পৌছে সে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যায় তার চোখ থেকে।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর চোখ খুলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না আহমদ খলিল। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে। দৃষ্টি স্পষ্ট হতে থাকে। অবশেষে ঘরের মধ্যে

জ্বলতে থাকা আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে থাকা মালেক ওহাব, মনসুর, খলিফা এবং রশিদকে দেখতে পায়। আগুনের শিখায় ঘরের দেয়ালে বড় বড় কলস, তার মায়ের তাঁত, আব্বার বিশাল ট্রাংকের ততোধিক বিশাল ছায়ার সমাবেশ চোখে পড়ে তার। রান্নার হাঁড়ি, বসার চেয়ার এবং অস্ত্র-শস্ত্রগুলো কাছেই রয়েছে। এই অতি পরিচিত এবং প্রিয় দৃশ্যগুলো তার মনকে আশ্বস্ত করে তোলে। সে ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে যেতে থাকে– তার মনে হয়, এটিই পৃথিবীতে তার সবচাইতে আপন স্থান। কারণ– এখানেই তার জন্ম, এখানেই সে বেড়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে।

স্তিমিতপ্রায় আগুনের পাশে সবাই বসে। মালেক ওহাব এবং মনসুর রাইফেল সাফ করার কাজে ব্যস্ত। পাশে বসে একদৃষ্টে তা দেখছে রশিদ। ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হঠাৎ খলিফার প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করে আহমদ খলিল। ছোট ভাইটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার আন্তরিক ইচ্ছায় নিজের হাত দু'টি বাড়িয়ে দেয়। ঠিক সে মুহূর্তেই, আহমদ খলিলের হাত প্রসারিত হতে দেখে এক লাফে কিছুটা সরে যায় খলিফা। মনে হল, আহমদ খলিলের প্রচণ্ড এক ঘুঁষির হাত থেকে যেন সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ব্যথায় ভরে ওঠে আহমদ খলিলের অন্তর। সে বলে–

ঃ খলিফা ভয় নেই। আমার কাছে আয়। আমি তোকে মারব না রে ... ।

ঃ না, খলিফা চিৎকার করে ওঠে– আমি তোমার কাছে যাব না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি শত্রুর গুপ্তচর।

ছোট ভাইয়ের কথা শুনে যেন আর্তনাদ করে ওঠে আহমদ খলিল।

ঃ না, খলিফা ! আমি তোরই ভাই। আমি নামাযের সময় আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি– তোর সাথে আর খারাপ ব্যবহার করব না। আমি তোর সাথে ঝগড়াও করবনা। যখন যা পাই দু'জনেই তা ভাগ করে খাব। আমি তোকে আর মারবনা– কখনোই না।

আহমদ খলিল আবেগে ভাইয়ের দিকে আবার তারা বাহু দু'টি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু খলিফা তার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ধরা দেয় না। বরং ভয়চকিত দৃষ্টিতে সে ক্রমশঃই দেয়ালের দিকে পিছিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে পিছানোর পথ বন্ধ হয়ে যেতেই চিৎকার করে ওঠে সে– সরে যাও, আমার কাছ থেকে সরে যাও। তুমি আমার কাছে এসোনা।

আহমদ খলিল থেমে যায়। এত চেষ্টা করেও ছোট ভাইটিকে আপন করতে না পারার ব্যর্থতায় চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে তার।

বহু রাত পযন্ত তার ঘুম আসে না। অন্ধকারে চোখ মেলে সে চেয়ে থাকে। একাকী শুয়ে থাকায় ঠাণ্ডার নির্মম আক্রোশ যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তাকে। আধো জাগরণ, আধো তন্দ্রার মধ্যে এক সময় সে শরীরের পাশে একটু উষ্ণতার স্পর্শ অনুভব করে। সে আর কেউ নয়। খলিফা এক সময় সরতে সরতে এসে কখন তার পাশ ঘেঁষে শুয়েছে। আহমদ খলিল হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের ক্ষুদ্র দেহটাকে নিজের কাছে টেনে নেয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে। খলিফার হৃৎস্পন্দনের শব্দ ঘরের গভীর নির্জনতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে কানে বাজে তার। নিজের শরীরের সাথে ভাইয়ের শরীরের স্পর্শে মনে এক প্রশান্তির পরশ অনুভব করে সে। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে যায়।

১২.

দিনগুলো বড় একঘেয়ে মনে হয় আহমদ খলিলের। কয়েক মাস হল তারা এখানে এসেছে। তার নিজের দেহের ক্ষতগুলো এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। তাঁবুর দরজার কাছে বসে সময় কাটায় সে। কিন্তু, এভাবে আর কতদিন কাটানো যায় ! বিরক্তিতে তার মন ভরে ওঠে। তাঁবুর ভিতরে ফিরে আসে সে। এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে খলিফা। দেখলেই বোঝা যায় যে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি তার নেই। তার রুগ্ন দেহ আরো রুগ্ন হয়ে গেছে। মনে হয়, শুধু হাড়গুলো ছাড়া তার শরীরে আর কিছুই নেই। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চোখের দিকে চাইলে শিহরিত হতে হয়। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দু'টি চোখ খলিফার। সে চোখে কিসের ভাষা– আহমদ খলিল বুঝে উঠতে পারে না।

পোশাকের ভিতর থেকে আবদুল আজিজের দেয়া ছুরিখানা বের করে আহমদ খলিল। কতদিন আগে যে আবদুল আজিজ তাকে এটা দিয়েছিল! ছুরিটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে সে। এ ছুরিই পাঁচ জন ইহুদীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল। কয়েক মাস আগে ইরাক-আল মানশিয়া ছেড়ে আসার কথা মনে হয় তার। ইহুদী সৈন্যরা গ্রামটিকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। প্রাণপণে লড়েও পেরে ওঠেনি গ্রামের মানুষগুলো। অসংখ্য ইহুদী সৈন্যের মোকাবেলায় ক'জন মাত্র মানুষ! তবু পিছু হটেনি কেউ। অবশেষে হাতাহাতি যুদ্ধ। আহমদ খলিল নিজেও তার জীবনের প্রথম সত্যিকার লড়াইয়ে নেমে পড়েছিল। বয়সে ছোট এবং শারীরিক দিক দিয়ে ইহুদীদের তুলনায় দুর্বল হয়েও মালেক ওহাবের পাশাপাশি পাঁচজন ইহুদী সৈন্যের সাথে জীবনবাজি রেখে লড়েছিল সে। সবাইকে হত্যা করার পর জীবিত কয়েকজন মাত্র গ্রামবাসীর সাথে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে পালিয়ে এসেছিল সেও। ইহুদীদের মেশিনগানের গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে দাফন করার কোন উপায় ছিল না। পরে আরো বহু ফিলিস্তিনির সাথে তারা চলে আসে গাজার কাছে এই উদ্বাস্তু শিবিরে। পুরো শিবিরের দৃশ্যটা এ সময় চোখে ভেসে ওঠে তার। একটা জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফ করে এর পত্তন করা হয়েছে। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে করা হয়েছে সুরক্ষিত। এরই ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য ছিন্নমূল ক্ষুধার্ত মানুষ।

গাজার নিকটবর্তী এ শিবিরে আসার কিছুদিন পর প্রত্যেককে একটা করে রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে। এখানকার যে কোন লোকের কাছেই এ কার্ডটি একটি মহামূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আহমদ খলিলের কাছে এটিকে একটি যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী জিনিস ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। তার মনে হয়, রেশন কার্ডের অর্থই হলো মাসিক রেশনের জন্যে ভিখারীর মতো ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাক। শিবিরের কর্তারা প্রত্যেকের জন্যে

কিছু পরিমাণ ময়দা, চাল, চিনি ইত্যাদিসহ কোন কোন উপলক্ষে এক টুকরো সাবানও দিয়ে থাকে। কখনো কখনো ছেঁড়া কম্বল এবং পুরনো কাপড়ও দেয়া হয়। তীব্র ক্রোধ এবং ঘৃণার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আহমদ খলিল এ করুণার দানগুলো শিবিরে বয়ে আনে। তার মনে হয়, তাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং এ বেঁচে থাকার জন্যেই এগুলো না নিয়ে তার উপায় নেই।

এখানে আসার পর আহমদ খলিল সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছে মালেক ওহাবের আচরণে। মালেক ওহাব তার দাড়ি কেটে ফেলেছেন। তিনি এখন শার্ট ও জুতা পরেন। এ ব্যাপারে শিবিরের বহু তরুণ ও বয়স্ক লোকের সাথে তার মিল দেখা যায়। আহমদ খলিলের মনে হয়, তার আব্বা এখন নিজেকে একজন বিদেশী করে তোলার কাজে ব্যস্ত। ইদানিং নামাজ আদায়েও তার খুবই অনীহা দেখা যাচ্ছে। এমন কি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে রোজাও রাখেন নি তিনি। ধর্মের প্রতি আব্বার এই অবহেলা দেখে আহমদ খলিল অত্যন্ত দুঃখ পায়। তার মনে হয়, মালেক ওহাবের আসলেই ধর্মের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবোধ ছিলনা। গ্রামে থাকতে অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে তিনি যেন বাধ্য হয়েই এতদিন নামায রোজা করে এসেছেন। এখন, এই শিবিরে এ ব্যাপারে কারো মাথা ব্যথা নেই দেখে মালেক ওহাবও সুযোগ পেয়েছেন। তাই, নামাজ রোযা ছেড়ে প্রগতিশীল হয়ে ওঠার ব্যাপারেই তিনি এখন বেশি ব্যস্ত। আহমদ খলিল নীরবে তার পিতার এই অধঃপতন লক্ষ্য করে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা তার হয়ে ওঠেনা। তার মনে হয়– আপন জন্মদাতার সমালোচনা করবে সে কি করে?

ব্যাপারটি অবশেষে উল্টো হয়ে দাঁড়ালো। আহমদ খলিল নয়, মালেক ওহাবই ছেলের সমালোচনা শুরু করেন। গ্রামের পরিবেশে তিনি আহমদ খলিলকে তেমন কিছু না বললেও এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্ম-কর্মের দিকে আহমদ খলিলের নিষ্ঠা মালেক ওহাবকে বিরক্ত করে তোলে। কারণ, এ শিবিরে এখন যারা আশ্রয় পেয়েছে, ভিটেমাটি ছাড়ার আগে এদের অনেকেই ছিল শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, প্রকৌশলী ইত্যাদি। যুদ্ধের কারণে সর্বস্ব হারিয়ে এখানে আসতে বাধ্য হলেও এরা কেউই নিজেদের অতীত জীবন, পদমর্যাদা, সম্পদ, সুযোগ সুবিধা সর্বোপরি সমাজের উচ্চমহলের লোক হিসেবে আধুনিক চাল চলনের অভ্যাস ভুলতে পারে নি। ফলে পুরো শিবির জুড়েই এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির উদ্দাম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ফেলাহীন সন্তান আহমদ খলিল যেন সত্যিই একবারে বেমানান হয়ে পড়ে।

আহমদ খলিলের ইদানিং মনে হয়, মালেক ওহাব তাকে নিজের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতেও সংকোচ বোধ করছেন। উভয়ের জন্যেই ব্যাপারটি জটিল হয়ে ওঠে। আহমদ খলিল কখনো তার আব্বার সাথে তাঁবুর বাইরে এলে তার পাশে হাঁটতে খুবই অস্বস্তি বোধ করে। মালেক ওহাবও তার বন্ধুমহলে পারতপক্ষে তাকে সন্তান হিসেবে

পরিচয় দেন না যতক্ষণ না তারা ব্যাপারটি কোন ভাবে জেনে ফেলে। তাঁবুতে ফিরে আসার পরই তাকে গোঁড়া, ধর্মান্ধ, আদিম যুগের মানুষ বলে আব্বার কাছে কথা শুনতে হয়।

খলিফা অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে যেতে শুরু করেছে সে। লেখাপড়ার দিকে প্রচণ্ড আগ্রহ তার। একটা দিনও স্কুলে যাওয়া বাদ দেয় না। পক্ষান্তরে চাচাতো ভাই রশিদের এদিকে কোন আগ্রহই নেই। একদিন খলিফা রশিদকে জিজ্ঞেস করে–

ঃ তুমি আমার সাথে স্কুলে যাও না কেন? তুমি কি লেখাপড়া শিখবে না?

ঃ স্কুল ! চেঁচিয়ে ওঠে রশিদ– শুধু ছোটরাই তো ওখানে যায়। আমি যাবো কেন? তুমি দ্যাখোনা, সে বলতে থাকে– ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়িই আমি বড় হয়ে যাব। তখন আমি ফেদাইনদের (ফিলিস্তিনি গেরিলা) সাথে যোগ দেব। শত্রুকে ধ্বংস করতে না পারলে লেখাপড়া শিখে কি হবে?

এদিকে মালেক ওহাব আহমদ খলিলকে তার স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় ঃ না, ওইসব কচি বাচ্চাদের সাথে আমি লেখাপড়া করতে পারবনা।

তবে মালেক ওহাব হাল ছাড়লেন না। আহমদ খলিলের জন্যে অংক, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শেখার কিছু বই নিয়ে এলেন তিনি। বললেন -

ঃ শোন, লেখাপড়া করাটা মোটেই কঠিন কোন ব্যাপার নয়। চেষ্টা করলেই তুমি পারবে। তুমি শুরু কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কিন্তু আহমদ খলিলের এদিকে কোন আগ্রহই ছিল না। তার আব্বার অনুরোধ, আদেশ বা ভীতি প্রদর্শনেও তার এ মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। তবে মালেক ওহাবের ইচ্ছে পূরণ না করলেও অন্যভাবে পড়াশোনা শুরু করে সে। খলিফার শিক্ষকদের কাছে ইংরেজী পড়া শিখতে থাকে আহমদ খলিল। অবাক ব্যাপার যে, খুব জলদিই ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে শিখে যায় সে। এখন যত পড়ে তত আকর্ষণ অনুভব করে সে পড়ার প্রতি। তার মনে হয়, এতে দিন ধরে এ জিনিসগুলোই তো সে জানতে চেয়েছিল। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী ছাপার অক্ষরে প্রথম পাঠ করে সে। পাঠ তো নয়, সে যেন গোগ্রাসে গিলে খাওয়া ! যত পড়ে ততই অভিভূত হয় আহমদ খলিল। চার খলিফা এবং অন্যান্য সাহাবার জীবনী পাঠ করে ভিন্নতর এক অনুভূতিতে তার হৃদয় ভরে ওঠে।

মহানবী (সঃ) এর সাহাবীদের জীবনের এবং অন্য আরো দু'টি ঘটনা আহমদ খলিলের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে। যেমন মুসাব বিন ওমরের ব্যাপার। অত্যন্ত ধনী ঘরের সন্তান হিসেবেই বেড়ে উঠে ছিলেন মুসাব। মক্কায় সবচেয়ে ভলো পোশাক পরার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। তার স্নেহান্ধ পিতা-মাতা সন্তানের জন্যে প্রয়োজনবোধে একশ' দিরহাম দিয়ে পোশাক কিনতেও কার্পণ্য করতেন না। তাই ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছিল মুসাবের জীবন। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম

গ্রহণকারী তরুণদের মধ্যে মুসাবও ছিলেন একজন। কিন্তু, এ ব্যাপারে তার পিতা-মাতা কিছুই জানতেন না। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর মুসাবকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখলেন তারা। বাইরে বেরনো বন্ধ হয়ে যায় তার। একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন তিনি। হিজরতকারী মুসলিমদের দলে যোগ দিয়ে প্রথমে যান আবিসিনিয়া। সেখান থেকে ফিরে আসেন মদীনায়। একদিন নবী করিম (সঃ) দরবারে বসেছিলেন। মুসাব কোন কাজে তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার পরনে ছিল অজস্র তালি মারা একখণ্ড কাপড় এবং তাই দিয়ে সারা শরীর ঢেকে রেখেছিলেন তিনি। এর কিছু দিন পর ওহুদের যুদ্ধে মুসাব শহীদ হলেন। দেখা গেল, তার পরণের কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকা পড়ে না। যখন মাথা ঢাকা হয় তখন পায়ের দিক নিরাবরণ হয়ে যায়। আবার পা ঢাকলে মাথা খোলা থেকে যায়। ব্যাপারটি মহানবী (সঃ) এর গোচরে আনা হলে তিনি নির্দেশ দিলেন— তার মাথা ঢাকো কাপড় দিয়ে এবং পায়ের দিক পাতা দিয়ে ঢেকে দাও।

একবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্বে তাবুকের যুদ্ধ চলছিল। এ যুদ্ধে জুলবিজাদাইন জ্বরে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পূর্ণ মর্যাদার সাথে তাকে দাফন করলেন। নিজে তার কবরে মাটি বিছিয়ে দিয়ে মোনাজাত করলেন । এই তরুণ যুবক খুব অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার চাচার নিষ্ঠুরতার ভয়ে দীর্ঘদিন তা গোপন রাখেন। পরে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে তাঁর কাছে ছুটে যান। মুসলিমদের সাথেই থাকার জন্যে আবেদন জানান তিনি। তার চাচা একথা জানতে পেরে আবদুল্লাহকে চিরকালের জন্যে ধর্মচ্যুত হওয়ার ভয়, এমন কি সম্পত্তিসহ তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে ইসলাম গ্রহণের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু তাতেও ফল না হওয়ায় পরণের কাপড়টুকুও খুলে নিলেন তিনি। নিরুপায়, ব্যথিতা জননী পুত্রের নগ্নদেহ ঢাকার জন্যে গোপনে একটি কম্বল দিয়ে গেলেন। সেটা গায়ে জড়িয়ে তাবুক অভিযানে যাত্রাকারী মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিলেন তিনি। তাবুক যুদ্ধের মধ্যে আবদুল্লাহ হঠাৎ করেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলেন। দাফনের কাজে রাত হয়ে গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) আলো হাতে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং মহানবী (সঃ) নিজ হাতে তার লাশ কবরে নামিয়ে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে ইবনে মাসউদ চিৎকার করে উঠলেনঃ আহা ! আজ যদি আমি ইন্তেকাল করতাম এবং আমাকে যদি দাফন করা হত এ কবরে, তা হলে কি সৌভাগ্যই না আমার হত!

উম্মে আমারা বর্ণনা করেছেনঃ

ওহুদের যুদ্ধে আমাদের সাজ সারঞ্জাম ছিল খুবই দুর্বল। আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলাম। পক্ষান্তরে কাফেরদের একটা শক্তিশালী অশ্বারোহী দল ছিল। যুদ্ধের সময় একজন অশ্বারোহী কুরাইশ আমাকে আক্রমণ করল। আমি আমার ঢাল দ্বারা তার তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করলাম এবং প্রতিঘাতে তার ঘোড়ার পিছনের পা কেটে

ফেললাম। ঘোড়া এবং তার আরোহী ভুতলশায়ী হলো। সাথে সাথে আমি চিৎকার করে আমার ছেলেকে ডাকলাম সাহায্যের জন্যে। তারপর লোকটিকে হত্যা করলাম আমরা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেনঃ হে উম্মে আমারা! তোমাদের মত এমন হৃদয় আর কার আছে! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল! বেহেশতে আমি যেন আপনার সাথী হতে পারি এ দোয়া করবেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তারপর থেকে আমি আর জীবনের প্রতি কোনদিন ভ্রূক্ষেপ করি নি।

আহমদ খলিল এ সব কাহিনী পড়ে ক্রমশঃই অভিভূত হতে থাকে। সে বেশ উচ্চস্বরে পড়ে যাতে তাঁবুর অন্যান্যরাও শুনতে পায়। কিন্ত সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, কেউই এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করতে চায়না। সবাই বলে, আজকের দিনে এসব গালগল্প ছাড়া আর কিছুই না। এমনকি তার আব্বাও অতীতের ব্যাপার-ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য তাকে তিরস্কার করতে থাকেন। তবে মালেক ওহাবের ব্যবহারে সে তেমন কিছু মনে করেনা। কিন্ত তার সমবয়সী ছেলেরা যখন এগুলোকে অবাস্তব বলে তাকে উপহাস করতে থাকে তখন ক্ষোভে - দুঃখে বাকহারা হয়ে পড়ে আহমদ খলিল। তবে এর মধ্যে তার একটিই মাত্র সান্ত্বনা যে, আর যে যাই করুক বা বলুক- খলিফা কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে কাহিনীগুলো শোনে। তাছাড়া আরো কাহিনী পড়ে শোনানোর জন্যেও সে তাকে অনুরোধ জানায়।

১৩.

পড়াশোনার মধ্যে আহমদ খলিলের দিন কাটতে থাকে। ইতিমধ্যে অভিধানের সহায়তা ছাড়াই ইংরেজী বইগুলো পড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে সে। ফলে আগের চেয়ে দ্রুত এবং বেশি বই পড়ার সুযোগ এসে যায় তার। আর পড়তে গিয়েই তার কাছে উন্মোচিত হয় অতীতের গৌরব-মাখা দিনগুলোর ইতিহাস। সে দেখে, মাত্র কিছুদিন আগেও মুসলমানরা ছিল তার পরিচিত পৃথিবীর এক বিরাট অংশ শাসনকারী, শক্তিতে তারা ছিল সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে গৌরবময় যুগের শিক্ষা-সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মুসলমানদের বিপুল অবদানের কথাও জানতে পারে সে। তার বড় আফসোস হয়–আহা! যদি এক হাজার বছর আগে সে জন্ম গ্রহণ করতো! হায়! কোথায় গেল সেই শৌর্য-বীর্যে পরিপূর্ণ মুসলিম জাহানের আলোকোজ্বল দিন? যে-মুসলমানের দৃপ্ত পদভারে কেঁপে উঠত একদিন দেশ-মহাদেশের মাটি ও পর্বত, যাদের বিজয়াভিযানের সামনে একের এক অবনত হতো দুর্ভেদ্য দুর্গ, আত্মসমর্পণ করত শক্তিশালী নরপতিবর্গ, আজ তারা ক্রমাগত নিজেদের ললাটে এঁকে চলেছে পরাজয় এবং অসম্মানের কলঙ্করেখা। অপমান এবং অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হওয়াই যেন আজকের মুসলমানদের একমাত্র প্রাপ্য।

খলিফার শিক্ষকদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়ে আহমদ খলিল। দূর অতীত এবং সাম্প্রতিক অতীতের বিখ্যাত কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্বের জীবনী গ্রন্থ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে সে। এমনি করে একে একে সে ইমাম হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া, শেখ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব এবং সনৌসী আন্দোলনের নেতাদের জীবনী পড়ে শেষ করে। অতি সাম্প্রতিক আল ইখওয়ান আল মুসলেমুন সম্পর্কেও সে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে জানতে পারে, কি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইখওয়ানের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যপ্রাচ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। অদম্য আগ্রহে শেখ হাসান আল বান্নার জীবনী, বক্তৃতা এবং রচনাগুলো সে বারংবার পড়তে থাকে।

খলিফা তার সহপাঠীদের তুলনায় অনেক বেশী মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। মাত্র দু'বছরেই সে চতুর্থ শ্রেণীতে প্রোমোশন পেয়েছে। তবে সকল বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েও একটা বিষয়ে তার শিক্ষকদের এবং মালেক ওহাবকেও সে হতা'শ করেছে। পাঠ্যক্রমের ইংরেজী বিষয়টি ভুলেও স্পর্শ করে না সে। অন্যান্য ছেলেরা কিন্তু অন্য সব বিষয়ের চেয়ে ইংরেজীতেই বেশি আগ্রহী। এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা অপরিসীম। কারণ, তারা ইতিমধ্যেই বুঝেছে যে ভালোভাবে ইংরেজী শিখলেই শুধু এই শিবির জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, ভালোভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে

জীবনকে। পক্ষান্তরে খলিফা কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষা বিষয়েই তার সকল মনোযোগ ও উদ্যম নিয়োজিত করেছে। এই সাথে স্পেনীয় মুসলিম ইতিহাসের প্রতিও রয়েছে তার অদম্য আগ্রহ। তার হাতের লেখা এবং ড্রয়িং খুবই সুন্দর। সেগুলো তার সহপাঠীদের সবার চাইতে ভালো তো বটেই, এমনকি অনেক শিক্ষকের চেয়েও সুন্দর। শিক্ষকদের কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের ব্যপার হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য কেউ স্কুল পরিদর্শনে এলে তারা খলিফার লেখা ও ড্রয়িং দেখিয়ে গর্ববোধ করেন।

খলিফা এর কিছুই জানেনা। এ ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ আছ বলেও মনে হয় না। সে সবসময় একা থাকে। অন্য কারো কাছেই যায় না। তার জীবনের কোন লক্ষ্য আছে বলেও মনে হয় না। ভবিষ্যত নিয়েও সে কোন চিন্তা করে না। আর দশটি ছেলের মতো বড় হয়ে সে কি হবে তা নিয়ে কারো সাথে আলাপও করে না। উদ্বাস্তু শিবিরের অন্য ছেলেদের জন্যে লেখাপড়া করাটা এক কঠিন ব্যাপার। অল্প কিছুটা পড়াশোনার পরই পেটের তাগিদে কাজে নেমে পড়া যেন তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। খলিফার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা কম। তার শিক্ষকরা কিন্তু এ কথা ভাবতেই পারেন না। এই অত্যন্ত প্রতিভাবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন বালকটির প্রতি তাদের সবার হৃদয়েই এক গভীর মমত্ববোধে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তারা যখন দেখেন যে এ বালকটি জ্ঞানার্জন করতে চায় শুধু জ্ঞান লাভের জন্যেই, কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে নয়, তখন অভিভূত না হয়ে পারেন না।

মালেক ওহাবের দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটে এখন শিবিরের স্কুলে। এই কাজের মধ্যে তিনি যে এভাবে ডুবে যাবেন--তা নিজেও কখনো ভাবেননি। মনের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করেন তিনি। স্কুলের কোন ঘর নেই। অপেক্ষাকৃত বড় একটা তাঁবুর মধ্যেই যাবতীয় কাজ চলে। ছেলেরা বসে মাটিতে। এই কাজের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ তিনি পান তা কার্যত না পাবারই শামিল। তবে মালেক ওহাবের এ ব্যাপারে কোন আফশোস নেই। পঞ্চাশ বছরের জীবনে কোন কাজে প্রথমবারের মতো তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন তিনি--এই তার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

শিবিরের এই স্কুলটি পরিচালনা করে ইউনেস্কো। তবে, অধিকাংশ শিক্ষকই ইখওয়ানের সদস্য। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা চায়না যে ইখওয়ানের কোন সদস্য এ স্কুলে থাকুক। এমন কি স্কুলের অধ্যক্ষও তাদের বিরোধী! তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের সরিয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এই শিক্ষকদের মতো সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভালো শিক্ষক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া এরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত। মালেক ওহাব অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চেয়ে এ স্কুলেই থেকে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। তার প্রধান কারণ হলো, স্কুলের পাঠ্যক্রম। তার মনে হয়, খলিফাকে এ স্কুলে রাখাই সবচেয়ে উত্তম হবে। কেননা, একই সাথে ইসলামী এবং আধুনিক উভয় শিক্ষাই সে এখানে অর্জন করতে পারবে।

খুব ভোর বেলাতেই উঠলেন মালেক ওহাব। টুকিটাকি কাজ সেরে স্কুলের দিকে এগিয়ে যান তিনি। স্কুলের সময় হয়নি। তাই ছেলেমেয়েরা কেউ আসেনি। স্কুলে পৌঁছে খলিফার শিক্ষকদের খবরের কাগজ পড়তে দেখে সেদিকে পা বাড়ান তিনি। তাকে দেখেই কয়েকজন একযোগে কালো মোটা টাইপে বর্ডার দেয়া প্রধান সংবাদটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর–

'হাসান আল-বান্না' আর নেই। অজ্ঞাত পরিচয়
এক ঘাতকের গুলীতে তিনি শহীদ হয়েছেন।

পরমুহূর্তেই কার যেন আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে ঃ হায়! আমাদের নেতা আর নেই। কেউ কি তার শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে।

স্কুল কক্ষটির ভিতরে এক গভীর নীরবতা নেমে আসে।

রাতে আহমদ খলিল তার আব্বার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সে জানে, মালেক ওহাব ইখওয়ানকে মোটেই পছন্দ করেন না। তাই সরাসরিই প্রশ্নটা করে সে।

ঃ আব্বা ! ইখওয়ানদের আপনি দেখতে পারেন না কেন?

মালেক ওহাব এর কোন উত্তর জবাব দেন না। সে আবার বলে ঃ আমার মনে হয় খুব ভালো লোক ওরা। তাই আমি ভেবেছি, আপনার মতো লেখাপড়া শিখে এবং জ্ঞানার্জনের পর সারাজীবন ওদের সাথে কাজ করে যাব ।

ঃ প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া ছাড়া ওরা আর কিছুই না––অনেকটা যেন চিৎকার করেই বলে ওঠেন মালেক ওহাব। আমি জানি ওদের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বহু লোক রয়েছে। কিন্তু নিজেদের মতাদর্শ এবং সংকীর্ণতার বাইরে আর কিছু ওরা ভাবতে পারে না। তারা পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চায়, চায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে। অথচ মানুষের প্রগতিশীলতায় ওদের কোন বিশ্বাস নেই। ওরা চায় একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র গড়তে, এজন্যে সংগ্রামও করছে। ইখওয়ানরা কঠোরভাবে শরিয়াহ্‌র আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতি। তারা চায়, এটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন। কিন্তু তারা বুঝতে চায় না যে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কত ব্যবধান– ঐসব আইন প্রবর্তনের কোন সুযোগ এখন নেই। তাছাড়া, তারা প্রগতিশীল চিন্তাধারার ঘোরবিরোধী। তবে তাদের মতাদর্শের সাথে যদিও আমার কোন মিল নেই, তবু আমি তাদের ভালবাসি, সম্মান করি। ওরা উদ্যমী এবং সাহসী– যেখানে সারা আরব জাহানই আজ ভরে উঠেছে অসংখ্য গাদ্দার আর কাপুরুষে, আরব সেনাবাহিনীর অধিনায়করা একেকজন একেকটা অপদার্থ, তাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই, সৎলোক তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং লোভী। তাই যদি না হত তবে আমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে হেরে যেতাম না। একমাত্র ইখওয়ানের সেচ্ছাসেবী-যোদ্ধা এবং জর্দানের সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করেছে অসীম সাহস এবং বীরত্ব নিয়ে। এখন হাসান আল-বান্নাও শহীদ হলেন। আমি ভেবে পাচ্ছিনা––ফিলিস্তিনকে রক্ষা করবে কে?

একটানে এতগুলো কথা বলে থেমে যান মালেক ওহাব। তাঁবুর লোকেরা একের পর এক ঘুমিয়ে যেতে থাকে। সারা শিবির জুড়ে নেমে আসে গভীর নীরবতা। মাঝে মাঝে নিদ্রাহীন মালেক ওহাবের বুক থেকে উঠে আসা সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে সে নীরবতা ক্ষণিকের জন্যে টুটে যায়। এক সময় তিনিও ঘুমের কোলে ঢলে পড়েন।

মাস খানেক কেটে গেছে। রাত অনেক গভীর হয়ে এসেছে। তাঁবুতে মালেক ওহাব ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুধু জেগে আছে আহমদ খলিল। তার পাশে ইখওয়ানের একগাদা পত্রিকা ও প্রচারপত্র। খলিফার শিক্ষকরা এগুলো তাকে পড়ার জন্যে দিয়েছেন। সে নিবিষ্টমনে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুবের বর্ণনা পড়ছিল। গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পড়ায় খুব একটা এগোতে পারছিল না সে। কারণ, ভালোভাবে বোঝার জন্যে বার বার তাকে ডিকশনারি খুলে বহু অজানা শব্দের অর্থ খুঁজে নিতে হচ্ছিল।

হঠাৎ এক আর্ত চিৎকারে শিবিরের অখণ্ড নীরবতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। দীর্ঘ দেহ এক কিশোর দ্রুত পায়ে মালেক ওহাবকে ডাকতে ডাকতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। মালেক ওহাব জেগে ওঠেন। কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করতে সে জানায় তার আব্বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ছেলেকে পাঠিয়েছে সে মালেক ওহাবকে ডেকে নিয়ে যেতে।

মালেক ওহাব ছেলেটিকে না চিনলেও অসুস্থ মানুষের আহ্বানে সাড়া দিতে আহমদ খলিলকে সাথে নিয়ে ছেলেটির সাথে বেরিয়ে আসেন। ছেলেটির তাঁবু তাদের তাঁবু থেকে বেশি দূরে নয়। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে তিনি চমকে ওঠেন। একটি মাত্র কেরোসিনের বাতি জ্বলছে সেখানে। তারই ম্লান আলোয় একগাদা কম্বল দিয়ে তাকিয়া বানিয়ে যে লোকটি আধাশোয়া হয়ে আছে––সে মুস্তফা এফেন্দী। সারা মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার ছাপ তার চেহারাকেই বিকৃত করে তুলেছে।

মুস্তফা এফেন্দী মুখ তুলে তাকায়। তার কাছে যেতে ইশারা করে সে। কিন্তু মালেক ওহাব আর একপা'ও সামনের দিকে এগোলেন না। তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মুস্তফা এফেন্দী ব্যাপারটি লক্ষ্য করে। হঠাৎ করে একটানে গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ফেলে সে। জামার ভিতর থেকে বের করে আনে একগোছা চাবি। তারপর সেটা ছুঁড়ে দেয় মালেক ওহাবের দিকে–

ঃ শোন– মালেক ওহাবকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় বলতে শুরু করে এফেন্দী– এখান থেকে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে তুমি এবং তোমার ছেলে আমার বাড়ির দায়িত্ব বুঝে নেবে। আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের যেখানেই হোক চলে যেতে হবে। আমার ফেলে আসা সমস্ত জমি এবং সম্পত্তির দায়িত্ব তোমার। যদি সম্ভব হয়–এফেন্দী বলে চলে, যুদ্ধে যদি সব কিছু ধ্বংস না হয়ে যায় তবে আমার যা আছে সব তুমি এবং আহমদ খলিল পাবে। আমি তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে দিন-রাত অনুশোচনা করেছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

মালেক ওহাব কোন উত্তর দিলেন না। বরফ শীতল দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ্য করছিলেন এফেন্দীকে। পৃথিবীতে এ লোকটির মত আর কাউকে এত বেশি ঘৃণা করেন না তিনি। এ সেই লোক যে তাকে দাস বানিয়েছিল। মালেক ওহাবের যত ক্ষতি করা সম্ভব সবই করেছে সে। সেই তাকে বাধ্য করেছে অজ্ঞ-মূর্খ মানুষ অধ্যুষিত একটি গ্রামে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু কাটাতে। সে তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে ক্ষমতা ও শক্তির সাহায্যে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই লোকটিই তার সন্তানকেও দাস বানিয়েছিল। তার টাকার লোভই আজ ইরাক আল-মানশিয়াকে ধ্বংস করেছে। গ্রামবাসীদের গণহত্যার শিকার করেছে সে। আজ নিয়তির নির্মম পরিহাসে সেই মুস্তফা এফেন্দীর একি দশা! নিজের মনে সূক্ষ্ম একটা খুশির স্বাদ অনুভব করেন মালেক ওহাব।

সারাটা রাত আহমদ খলিল এফেন্দীর হাত ধরে বসে রইল তার শয্যার পাশে। একটি কথাও বলল না সে। তারই হাতে হাত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো মুস্তফা এফেন্দী। পরদিন তার দাফন সম্পন্ন করে বিষন্ন মনে তাঁবুতে ফেরে আহমদ খলিল।

১৪.

রশিদের বয়স এখন চৌদ্দ। ইতিমধ্যেই তার উচ্চতা ছয় ফুটে দাঁড়িয়েছে। ভয় বলে কোন জিনিস তার মধ্যে নেই। শিবিরের তরুণ ছেলেদের সাথে সেও ফেদাইনদের সাথে যোগ দিয়েছে। তার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ শরীর দেখে বয়স আঠারোর কম নয় বলেই মনে হয়। এর তুলনায় আহমদ খলিল ও খলিফা দু'জনেই ভীষণ রোগা। খাবার কষ্ট, জীবন ধারণের প্রতিকূলতা রশিদের দেহের তারুণ্যের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের সামনে টিকতে পারেনি। এ বয়সেই অপরিসীম দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে সে। ফলে সীমান্তের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাদের কেউই রশিদকে আসল নামে চিনত না। রশিদের গায়ের রং ছিল কালো। তাই ইহুদীরা রশিদের নাম দিয়েছে কালো জানোয়ার।

দুঃসাহসিক কাজে জড়িয়ে পড়ে রশিদ। এর সাথে আহমদ খলিলকেও জড়িয়ে নেয় সে। রাত নামলেই নাহল মিদবার-এর ইহুদী বসতি ঘিরে রাখা কাঁটাতারের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে তারা। খাবার চুরি, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং ইহুদী বসতির পানি সরবরাহের পাইপ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই তাদের অভিযানের লক্ষ্য। রাতের অন্ধকারে পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে তারা কারখানাগুলোতে ঢুকে পড়ে। দ্রুত হাতে এটা ওটা খুলে, ছড়িয়ে ফেলে সরে আসে। এভাবে ইহুদীদের ব্যবহৃত ট্রাক্টরগুলোকে অকেজো করে দেয়ার কাজে রশিদ একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে।

নাহল মিদবারের কাছে এক গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল আহমদ খলিল। রাত নেমে এসেছিল আগেই। অন্ধকার আরো কিছুটা গাঢ় হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিল সে। অন্যান্য দিনের মতো আজো সে কাঁটাতারের বেড়া গলে ভিতরে ঢুকতে চাইছিল। হঠাৎ করেই কচিকণ্ঠের একটা কান্নার শব্দ কানে আসে তার। বিস্মিত হয়ে গর্ত ছেড়ে উঠে আসে সে। একটু এগিয়ে যায় কান্নার উৎস লক্ষ্য করে। তারপরই শিশুটি নজরে আসে তার। একেবারেই মাসুম বাচ্চা। এই দূর প্রান্তরে সে এল কি করে তা ভেবে পায় না আহমদ খলিল। হয়ত হারিয়ে গেছে। সে জানে– এধরনের শিশুদের রাখার জন্যে নাহল মিদবারে একটা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র আছে। হয়তো সেখান থেকেই সে কোনভাবে এতদূরে চলে এসেছে।

ইহুদী শিশুটি আহমদ খলিলকে দেখে আতংকে চিৎকার শুরু করে। হয়তো আহমদ খলিল আরব বলেই তার চিৎকারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। আহমদ খলিল কোলে তুলে নেয় তাকে। কান্না থামানোর জন্যে পকেট থেকে কয়েকটা খেজুর বের করে হাতে দেয়। এতে শিশুটি একটু শান্ত হয়ে আসতেই শিবিরের দিকে পা বাড়ায় তাকে নিয়ে। চাচী হালিমা কিংবা মামাতো বোন আসমা শিশুটির দেখাশোনা করবে নিশ্চয়ই– ভাবে সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মত পরিবর্তন করে আহমদ খলিল। না, শিশুটিকে তার নিজের জায়গাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবে সে।

রাত আরো গভীর হলে শিশুটিকে নিয়ে হাঁটতে থাকে আহমদ খলিল। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে সবাই তখন ঘুমে নিমগ্ন। বিশাল ঘরের দু'পাশে সারবাঁধা শয্যাগুলোর প্রত্যেকটাতেই একটি করে শিশু ঘুমিয়ে আছে। এগিয়ে যেতে যেতে একটি খালি শয্যা চোখে পড়ে তার। শিশুটিকে সেখানে শুইয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। পাশেই একটা টেবিলে রাখা দুধের বোতলের দিকে চোখ পড়ে তার। হাত দিয়ে দেখে, বোতলটা বেশ গরম। নিপলটা শিশুটির মুখে তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে দুধ খাওয়ানো শেষ করে আহমদ খলিল। বোতলটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর কম্বল দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে দেয়। তার কাজ শেষ। খালি পায়ে কোন শব্দ না তুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সে পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে।

ভাগ্য খারাপ আহমদ খলিলের। রাস্তায় কিছু দূর আসার পরই টহলরত একদল সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে যায় সে। সৈন্যরা তাকে একটি ঘরে আটকে রেখে চলে যেতেই নতুন আরেকদল সৈন্য এসে ঢোকে ঘরে। একটি ইহুদী মেয়েকে ধর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর শুরু হয় নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলো তার। প্রথম প্রথম সে যতই তার নির্দোষিতার কথা বলতে থাকল ততই বেশি অত্যাচার করতে থাকল তারা। পরে আর মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দেয়ারই প্রয়োজন বোধ করল না সে। সৈন্যরা নির্যাতনের শেষ পর্যায়ে আহমদ খলিলের পরনের সব কাপড় খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে ফেলে তাকে। আবার নতুন করে নির্যাতন শুরু হয়। অবশেষে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে সে।

বহুক্ষণ পর আহমদ খলিলের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখে পড়ে– চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ইহুদী হায়েনাগুলোর মুখ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে। প্রাণপণ শক্তিতে মুখে কয়েকটা শব্দ টেনে আনে ঃ পানি, একটু পানি দাও আমাকে।

হো হো করে হেসে ওঠে সৈন্যরা। একজন একটা মগে করে একটু পানি এনে দিতেই ক্ষুধার্তের মতো মগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আহমদ খলিল। কিন্তু জিভে সেই তরল পদার্থের একটু স্পর্শ লাগতেই মগটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শয়তানগুলো পানি দেয়নি, প্রস্রাব দিয়েছে। এরপর সৈন্যরা তাকে টেনে জিপে তুলে নাহল মিদবারের শেষ প্রান্তে নিয়ে আসে। লাথি মেরে বালির মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে চলে যায় তারা।

শরীরের আঘাতের জন্যে কোন ব্যথা অনুভব করে না আহমদ খলিল। সূর্যের গনগনে তাপে বালি তেতে উঠেছে। পিপাসায় বুক ফেটে যাবার মতো অবস্থা তার। মুখের মধ্যে লালার কোন অস্তিত্ব টের পায় না সে। জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে উঠে বসতে পারে না। গভীর হতাশায় মন ভরে ওঠে তার। সেই রাতের বেলা ইহুদী সৈন্যরা তাকে ফেলে দিয়ে গেছে এখানে। এত বেলা পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় কেটেছে। সে জানে, আর কিছু সময় এভাবে পড়ে থাকলে মৃত্যু অবধারিত। এভাবে মৃত্যুর কথা সে কোনদিনই ভাবেনি। অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। বহুদূরে অস্পষ্ট মানুষের ছায়ার মতো কি যেন চোখে পড়ে তার। চিৎকার করে তাকে ডাকতে চায়, পারে না। কণ্ঠ থেকে কোন শব্দই বের হয় না তার। সে মুহূর্তে

তার দৃষ্টি যায় আকাশের দিকে। নির্মেঘ, নীল আকাশ। অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে এক বিরাটকায় শকুন। ধীরে ধরে নিচে নামতে থাকে শকুনটা। নামতে নামতে বেশ কাছে চলে আসে তার। ডানা মেলে ঘুরতে থাকে তার চার পাশে। আহমদ খলিল বুঝতে পারে– শকুনটি শিকার পেয়ে গেছে।

আহমদ খলিলকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল রশিদ। প্রথমে তার মনে হয়েছিল– আহমদ খলিল মারা গেছে। তাড়াতাড়ি বুকের সাথে কান পেতে হৃদ-স্পন্দন শুনতে পায় সে। পানিতে এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে তার মুখটা ভিজিয়ে দিতে থাকে। একটু পরে আর এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে নেয় সে। তারপর দু'সারি দাঁত একটু ফাঁক করে ধরে ফোঁটা ফোঁটা পানি মুখের মধ্যে দিতে শুরু করে।

আহমদ খলিলের জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে তাকিয়েই সে দেখে, রশিদের কালো মুখটি তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। পানিতে ভেজানো কাপড়টুকু নিয়ে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় সে চুষতে থাকে। তার মনে হয়, এত সুস্বাদু পানি জীবনে আর কখনো সে পান করেনি। এ সময় রশিদ তার ছাগলের চামড়ার মশকটি আহমদ খলিলের মুখের সামনে তুলে ধরে। বাম হাত তার ঘাড়ের নিচে রেখে উঁচু করে ধরে মাথা। প্রাণভরে পানি খেতে থাকে আহমদ খলিল। পরমুহূর্তেই চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসে তার।

জ্ঞান ফিরে আসতে হাসপাতালের শয্যায় নিজেকে আবিষ্কার করে আহমদ খলিল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে সার বাঁধা শয্যাগুলো। পাশের টেবিলের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার। রশিদ শুয়ে আছে তার উপর। তার দেহের আকারের তুলনায় টেবিলটি একেবারেই ছোট। পরক্ষণেই আহমদ খলিল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, রশিদের হাতে একটি রাবারের টিউব জড়ানো রয়েছে। টিউবের এক মাথায় একটি সূচ এবং তা রশিদের হাতে ঢোকানো। সে দেখে, অন্য প্রান্তে একটি বোতল লাগানো এবং তার মধ্যে ফোঁটায় ফোঁটায় সঞ্চিত হচ্ছে রশিদের দেহের রক্ত।

আসলে আহমদ খলিলকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ডাক্তাররা জানায়ে আহমদ খলিলকে এখুনি রক্ত দিতে হবে। না হলে তাকে বাঁচানো যাবে না। ভাগ্যক্রমে রশিদ এবং তার রক্তের গ্রুপ মিলে গিয়েছিল। রশিদ স্বেচ্ছায় তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় রক্ত নেয়ার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ করে। এসবের কিছুই জানা নেই আহমদ খলিলের। তবে কিছু বুঝে ওঠার আগে আবার জ্ঞান হারায় সে।

এবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে খলিফাকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে আহমদ খলিল। চোখে তার রাজ্যের উদ্বেগ। আহমদ খলিলের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে। ভাইয়ের জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হাসপাতালে শুয়ে অসুস্থতার দিনগুলো কাটিয়ে দিতে থাকে আহমদ খলিল। কিছুই করার নেই তার। হঠাৎ করে ইরাক আল মানশিয়ার কথা মনে পড়ে তার। জন্মভূমিকে দেখার জন্যে মনের মধ্যে গভীর এক আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে সে। গ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত আর একবারও সেখানে যাবার সুযোগ হয়নি। হাসপাতালে কেউ কেউ

তাকে বলেছে যে ইরাক আল মানশিয়ায় গিয়ে কোন লাভ নেই। লড়াইয়ের সময় গ্রামটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আহমদ খলিলের মন তাদের কথায় সায় দেয় না। তার মনে হয়, কিছু বাড়িঘর এবং মসজিদটি এখনো নিশ্চয়ই আছে। সেগুলো হয়ত নির্জনতা ও শূন্যতার মধ্যে প্রতীক্ষা করছে তাদের ফিরে যাওয়ার জন্যে। আহমদ খলিল ভাবে, সে ফিরে যাবে। যদি তাদের বাড়িটা এখনো থেকে থাকে তবে সে নতুন করে চাষাবাদ শুরুর মধ্য দিয়ে নবজীবনের সূচনা করবে। সে অবশ্য ইহুদীদের শাসনাধীনে বাস করতে চায় না– কিন্তু বৃটিশদের অধীনে বাস করার চেয়ে এটাকে তুলনামূলকভাবে ভালো মনে হয় তার। রশিদের সাথে গ্রামের মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্যে তার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়– তার মনে পড়ে গ্রামের গোরস্থানটির কথা, যেখানে তার পূর্ব পুরুষেরা শায়িত রয়েছেন, আর আছে তার মামা ইউসুফ মালিক এবং আবদুল আজিজ– আহমদ খলিলের প্রিয় সঙ্গী। তাদের কবরগুলো জিয়ারত করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে আহমদ খলিল। রশিদের সাথে পরামর্শ করে ইরাক আল মানশিয়ায় যাবার জন্যে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে সে ইতিমধ্যেই। দু'প্রস্থ ইহুদী পোষাক যোগাড় করেছে তারা। কারণ, তাদের গন্তব্য এলাকা এখন ইহুদীদের বসতিতে ভরে উঠেছে। সেখানে আরব পোষাকে যাওয়ার অর্থ যেচে নিজের বিপদকে ডেকে আনা। অবশেষে যাত্রা শুরু করে তারা।

উত্তরের দিকে তিনদিন একটানা হেঁটে চলে আহমদ খলিল এবং রশিদ। তবে তারা পথ চলে শুধু রাতের বেলায়। ইহুদীদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকে। রাত নেমে এলেই আবার তাদের পথ চলা শুরু হয়। চলার পথে খাবার মত যেখানে যা কিছু পায় তাই চুরি করে খেয়ে দু'জনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

অবশেষে নেগবায় পৌঁছে যায় দু'জন। পরিচিত কাউকে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া পরিস্থিতি পরিবেশ সবকিছুই একেবারে অপরিচিত মনে হয় তাদের। শেষ পর্যন্ত ইয়েমেনী এক শ্রমিককে ইরাক আল মানশিয়ার কথা জিজ্ঞেস করে তারা।

ঃ ইরাক আল-মানশিয়া বলে এখন কিছুই নেই– আরবীতে নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দেয় লোকটি। যুদ্ধের পরপরই ডিনামাইট দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বহুদূরে অস্পষ্ট আকৃতির কিছু বাড়ি-ঘরের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায় সে। ওটা এখন নির্মীয়মান ইয়াদ মোরদেশাই শহর। দেখো, খুঁজে পেতে যদি কিছু পাও ।

ব্যর্থতা ও হতাশায় মুষড়ে পড়ে দু'জন। ইরাক আল মানশিয়ার দিকে হেঁটে যেতে যেতে পুরনো পরিচিত কিছুই চোখে পড়ে না তাদের। বৈদ্যুতিক খুঁটি, কেবল লাইন, টেলিফোন পোস্ট এবং আড়াআড়ি চলে যাওয়া তারগুলো গ্রামের চেহারা বদলে দিয়েছে। একদিন যে পথ দিয়ে তার মা পানি আনতে যেতেন গ্রামের কূয়ায়– আজ তা পরিণত হয়েছে মসৃণ কংক্রিট সড়কে, তার উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে কার, বাস জীপ ও ট্রাকগুলো। এখানে দঙ্গলের পর দঙ্গল ইহুদী, খাকি পোষাক পরা সৈন্যদল, হাঁটু পর্যন্ত

স্কার্ট পরা মহিলা, উজ্জ্বল চোখের স্বাস্থ্যবান শিশু, মরক্কো, ইরাক ও ইয়েমেনী শ্রমিকের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু দু'জোড়া চোখ গভীর আগ্রহে অনুসন্ধান করেও কোন ফিলিস্তিনির দেখা পেল না।

তাদের বাড়িটি কোথায় ছিল? মসজিদটিই বা ছিল কোথায়? যদি কোনক্রমে এখনো সেগুলো থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই তা ইহুদীদের দ্বারা ভরে উঠেছে। আহমদ খলিল ভাবে– সে পৃথিবীবাসীকে কি করে বিশ্বাস করাবে যে ইহুদীরা চুরি করা সম্পত্তির উপর বসবাস করছে? সে কিভাবে তাদের বিশ্বাস করাবে যে এখানকার বাড়ি এবং জমি ছিল তাদেরই? তাছাড়া সে কাকে একথা জিজ্ঞেস করবে যে এখানে তার কোন অধিকার নেই কেন?

পুনরায় হাঁটতে শুরু করে তারা। সূর্যতাপ এবং তীব্র চাপা উত্তেজনা মিলে শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে তাদের। এ সাথে একটা আতঙ্কও তাদের গ্রাস করে। ইহুদীদের এ ঘাঁটিতে কোনভাবে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। তাই একটা নির্জন এবং নিরাপদ স্থানের সন্ধানে পা চালায় তারা। যেতে যেতেই চোখে পড়ে বিশাল বুলডোজার চালিয়ে পুরনো বাড়িঘরগুলোর অবশিষ্ট দু'একটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তারই পাশাপাশি গড়ে উঠছে আধুনিক পদ্ধতির চমৎকার ফ্ল্যাটবাড়ী। সেগুলো ইহুদী নারী-পুরুষের কল-গুঞ্জনে মুখরিত। আহমদ খলিলের মনে হয়, বুলডোজার চালিয়ে ইহুদীরা শুধু বাড়িঘরগুলোই ধ্বংস করছে না– বরং তারা এককালে এখানে আরবদের বসবাসের সমস্ত প্রমাণ এবং স্মৃতিকেই চিরতরে মুছে ফেলছে।

এখন কি করা যায়! ভাবতে থাকে আহমদ খলিল। তার মন হতাশায় ছেয়ে গেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তাদের কোনকিছুই আর ফিরে পাওয়ার আশা নেই। দখলদাররা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন কিছুতেই তাদের ফিরে আসতে দেবে না। এ ধরনের কোন চেষ্টাকে তারা যে ভাবেই হোক প্রতিহত করবে। তবে কি ঐ শিবিরেই তাকে সারাটি জীবন কাটাতে হবে? কিন্তু সে তো জানে, জেলখানার চাইতে শিবির জীবন কিছুটা উন্নত মাত্র। সেখানে স্বাধীনভাবে কেউ কিছু করতে পারে না। নেহাত ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ বাইরে যাবার অনুমতি পায় না। সেখানে ন্যায় বলে কিছু নেই। শিবির পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের কানগুলো সীসা দিয়ে বন্ধ করা। সেখানে কোন অভাব অভিযোগ জানানো অরণ্যে রোদন মাত্র।

শিবিরে ফিরে না গিয়ে গাজার পথে পথে কাজের সন্ধানে ঘুরতে থাকে আহমদ খলিল ও রশিদ। কিন্তু কোন কাজ পায় না তারা। অনাহারে এবং হতাশায় দেহের সাথে সাথে মনটাও ভেঙ্গে পড়ে আহমদ খলিলের। গাজা এখন মানুষের ভিড়ে উপচে পড়ছে। সকলেই কাজ খুঁজে ফিরছে– কিন্তু আদতে কাজের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর। তবু লোক আসছে। আসছে আর আসছে। আহমদ খলিল জানে, রশিদও কোন কাজ পায়নি। কিন্তু রশিদ অন্য ধাতুতে গড়া। অনাহারে অবসন্ন আহমদ খলিল শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে

কাজের সন্ধানে পথে পথে ঘোরে, আর রশিদ ইতিমধ্যেই রাস্তার লোকের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে শুরু করেছে।

গাজার জনাকীর্ণ রাস্তায় একদিন কাজের সন্ধানে ঘুরছিল আহমদ খলিল ও রশিদ। একটি সিনেমা হলের সামনে ঝোলানো বিশাল পোস্টার দেখে এগিয়ে যায় তারা। মার্কিনী সিনেমার পোস্টার দেখার জন্যে দু'জনেই সমান আগ্রহী হয়ে ওঠে। সিনেমা হলের বাইরে বহু তরুণ যুবকের ভিড়। লাইন ধরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে টিকেটের জন্যে। তাদের কারো কাছেই টিকেটের পয়সা নেই। শেষ পর্যন্ত ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এক ফাঁকে হলের ভিতর ঢুকে পড়তে পেরে খুশিতে ফেটে পড়ে তারা।

ছবি শুরু হয়ে যায়। আগে কখনো বিদেশী ছবি দেখেনি কেউ। নায়ক-নায়িকার প্রেম, বারংবার পরস্পরের দেহস্পর্শ, অর্ধনগ্ন নারীদেহ দেখে আধো আলো অন্ধকারেও লজ্জায় ঘেমে নেয়ে ওঠে রশিদ। ছবির ইন্টারভ্যালের আগেই হল ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আহমদ খলিল সম্মোহিতের মতো ছবিটি দেখে চলে। আধুনিক কোন শহরের দৃশ্য এবং জীবন যাত্রার পরিচয় লাভ এই তার প্রথম। তবে ছবির শেষে এসে সেও বিরক্ত হয়ে ওঠে। ক্যাবারে নাচ এবং প্রেম-রোমান্টিকতা সর্বস্ব ছবিটিকে নিতান্তই অন্তসার শূন্য মনে হয় তার। তরুণদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়া এবং চিন্তা চৈতন্যকে অন্যখাতে প্রবাহিত করতে যে ছবি কত কার্যকর, সে কথা ভেবে শংকিত হয়ে ওঠে সে। ভাবে, আর কোনদিন ছবি দেখবে না। এ সময় তার কানে ভেসে আসে মাগরিবের আযান। চমকে ওঠে আহমদ খলিল। নিজেকে ধিক্কার দেয় প্রবৃত্তির প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে। এই সিনেমা দেখতে গিয়ে জোহর এবং আসরের নামাজ কাজা করেছে সে জীবনে প্রথমবারের মত।

১৫.

এক শুক্রবার পথে পথে ঘুরছিল আহমদ খলিল। শহরের নতুন থেকে পুরনো অংশে গিয়ে হাজির হয় সে। এক সময় একটি মসজিদের সামনে থেমে পড়ে। মসজিদটি ছোট, সাদা রং করা, তার চারদিক ঘেরা পাথরের দেয়াল দিয়ে। খোলা দরজা দিয়ে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে পড়তেই একটি শীতল পরশ অনুভব করে সে। সামনেই পামট্রি এবং নানা ধরনের ফুলে ভরা একটি বাগান। মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর অজু করে নেয়। জুমার সময় হয়ে গেছে। অজু সেরে মুসল্লীদের সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় সে। ইমাম সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে পড়ে চলেন ঃ

"হে মানব সকল। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ এবং নারীরূপে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি গোত্র ও জাতিতে যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার এবং পরস্পরের যত্ন নিতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর চোখে উত্তম যার আচরণ উত্তম। জেনে রেখ, আল্লাহ্ সবকিছু জ্ঞাত, তিনি সবকিছুই অবহিত ।"

নামাজ শেষে আহমদ খলিল যখন উঠে দাড়াল তখন তার মনে আর কোন দুঃখবোধ নেই। তার মনে হল, সে তার বন্ধুদের মাঝেই রয়েছে। সে ইমামের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সাথে আলাপ শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সে ইমামের মন জয় করে নেয়। ইমাম সাহেব তরুণ যুবকটির জ্ঞান এবং আগ্রহের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। ধীরে ধীরে আহমদ খলিলের দুরবস্থার কাহিনীও তাঁর জানা হয়ে যায়।

ইমাম সাহেবের সহৃদয়তায় মসজিদে খাদেমের কাজ পেয়েছে আহমদ খলিল। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে মসজিদটি ধোয়া মোছা করে। ইমাম সাহেব তার জন্যে কিছু অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া আদায় করে আহমদ খলিল। উদ্বাস্তু শিবিরে পাওয়া রেশন কার্ডটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে সে। তার মনে হয়, আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় তবে সে না খেয়ে মারা যাবে, তবু বিদেশী ভিক্ষার দান আর গ্রহণ করবে না। আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয় সে। কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের জীবিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা তার মধ্যে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও আস্থার ভাব জাগিয়ে তোলে।

মসজিদের কাজের মধ্যে অবসর মুহূর্তে একটি নতুন চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে আহমদ খলিলের মাথায়। মামাতো বোন আসমার সাথে বহুদিন দেখা হয় না তার। উদ্বাস্তু শিবিরের ওই জঘন্য পরিবেশে সে কেমন আছে তাও জানে না সে। আর এভাবে তাকে রাখা যায় না– ভাবে আহমদ খলিল। অবশেষে ইমাম সাহেবের কাছে আসমাকে এখানে নিয়ে এসে বিয়ে করার ইচ্ছা জানাতেই সানন্দে সম্মতি দেন তিনি। জানান, নতুন কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মসজিদের পাশে ছোট ঘরটায় থাকতে পারবে তারা।

আনন্দে আত্মহারা আহমদ খলিল প্রায় সাথে সাথেই ঘরটি পরিষ্কার করতে শুরু করে দেয়। ইমাম সাহেব তাকে কয়েকটি মাদুর এবং কম্বল দেন। ঘরটি অত্যন্ত যত্নে সাজিয়ে ফেলে সে। আসলে একজন সাধারণ মানুষের মত একটু ভালোভাবে থাকার উপযোগী কোন উপকরণও আহমদ খলিলের নেই। তাই এইটুকু পেয়েই অনেক বড় কিছু পাওয়ার স্বাদ অনুভব করে সে।

বিয়েটা হয় খুব সাদামাটাভাবে। আসমা এবং আহমদ খলিলের কোন সম্পদ ছিল না। তাই কোন পক্ষে কোন দাবি-দাওয়াও ছিল না। ইমাম সাহেব নিজের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন করেন। নব-দম্পতির সংসার জীবন শুরু হয়।

বিয়ের পর আসমার সারাটা দিন কাটে ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যে। সংসারে তেমন কোন কাজ নেই। তাই হাতে তার অফুরন্ত সময়। আহমদ খলিলের জন্যে তার হৃদয়ে এখন এক শরম রাঙা অথচ অদম্য আকর্ষণ জেগে উঠেছে। অধীর আগ্রহে সে তার প্রতীক্ষায় থাকে। সন্ধ্যায় আহমদ খলিল ফিরে এলেই আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় তার মনে। নিভৃত নির্জনে শুধু তারাই দু'জন। গভীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে সময় কখন যে ফুরিয়ে যায় তা কেউই টের পায় না। আহমদ খলিলকে নিজের কাছে পেয়ে আসমা ভুলে যেতে চায় আব্বা-আম্মাকে হারানোর মর্মান্তিক বেদনা। কিন্তু আহমদ খলিল যখন কাজে চলে যায়, তখন দীর্ঘ একাকিত্ব আবার তাকে বেষ্টন করে চারদিক থেকে, তখনই তার মন জুড়ে চেপে বসে সেই স্মৃতি। কখনো কখনো সে তার ভাইয়ের ছুরিটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। বিয়ের পরপরই আহমদ খলিল আবদুল আজিজের ছুরিটি দিয়ে দিয়েছে তাকে। তার মনে হয়, এ ছুরিটি যার হাতে থাকবে তার কোন বিপদ হবে না, বরং এটি যেন তার মালিকের জন্যে সৌভাগ্যেই বয়ে আনবে। তার এ ধারণার কথা আহমদ খলিলকে জানিয়েও দেয় আসমা।

বেশ কয়েকদিন থেকেই আহমদ খলিলের মনে হয় রাস্তায় বের হলে কে বা কারা যেন তার উপর নজর রাখছে। একটা অস্বস্তিতে তার মনটা ছেয়ে যায়। আসমাকে সে জানায়নি। আসলে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা। কারণ, এমন কিছু সে করেনি যে জন্যে কেউ তাকে অনুসরণ করবে বা তার উপর নজর রাখবে। মনে এই অস্বস্তি নিয়েই রোজকার মতো আজও কাজের শেষে পথে বেরিয়ে আসে সে। আসমার জন্যে খাবার কেনার উদ্দেশ্যে বাজারের দিকে এগিয়ে যায়। একটা দোকান থেকে দুটি রুটি কিনে ঘুরতেই অস্ত্রধারী পুলিশ দু'জনের মুখোমুখি হয়ে যায় সে।

ঃ চল, থানায় যেতে হবে। একজন পুলিশ বলে ওঠে। প্রতিবাদ করতে যায় আহমদ খলিল। কিন্তু ততক্ষণে অন্যজন তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাদের সাথে চলতে শুরু করে সে। অল্প দূরেই থানা। পুলিশ দু'জন সোজা তাকে নিয়ে একজন অফিসারের সামনে হাজির করে।

ঃ আমরা নিশ্চিত যে তুমি উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে এসেছ। পুলিশ অফিসারটি বলতে শুরু করে– তাছাড়া কোন রকম অনুমতিপত্র ছাড়াই তুমি গাজায় কাজ করছ। কিন্তু তুমি ভাল করেই জান যে উদ্বাস্তুদের জন্যে তাদের শিবিরের বাইরে আসা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ অপরাধের জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

ঃ না! চিৎকার করে ওঠে আহমদ খলিল। আমি জেলখানার কয়েদী নই যে আমার ইচ্ছে মত আমি চলতে পারব না।

পুলিশ অফিসারের মুখটি ক্রূর হাসিতে ভরে ওঠে। সে বলে ঃ শোন, আমি শুধু এটাই দেখতে চাই যে আমার আদেশ প্রতিপালন করা হয়েছে। গাজার গভর্নর তোমাকে গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছেন। তুমি যতদিন নির্দিষ্ট জরিমানা দিতে না পারবে ততদিন তোমাকে হাজতে থাকতে হবে।

ঃ এটা অন্যায় আর তা করার কোন অধিকার আপনার নেই। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি। আহমদ খলিল বলে।

অফিসারটি তার কথায় কান না দিয়ে তাকে হাজতে ভরে রাখার নির্দেশ দেয় পুলিশদের। তারা তাকে টানতে টানতে একটি সেলের মধ্যে নিয়ে যায়। সেলের ছাদে অত্যন্ত কড়া পাওয়ারের একটি বাল্ব লাগানো। একবার তাকালেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পুলিশগুলো জোর করে তাকে আলোর দিকে তাকাতে বাধ্য করে।

ঃ উদ্বাস্তু শিবিরে ইখওয়ানদের তৎপরতা সম্পর্কে যা জান বল আমাদের– একজন গার্ড বলতে থাকে। তাদের নাম–ঠিকানা বল।

ঃ না আমি বলব না। ওরা আমার বন্ধু। আমি তাদের সাথে বেঈমানী করতে পারি না। আহমদ খলিল জবাব দেয়।

একজন পুলিশ তাকে টর্চার চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়। বলে ঃ ওখানে গেলেই পেট থেকে কথা বের হয়ে আসবে।

কয়েকজন মিলে টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে চলে।

আহমদ খলিল টর্চার চেম্বারটি তাকিয়ে দেখে। জানালাহীন ঘর। ঘরের মাঝ বরাবর সিলিং থেকে ঝুলছে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো। টুলের কাছে একজন দাঁড়িয়ে। কোমর পর্যন্ত তার দেহের উর্ধ্বাংশ নগ্ন। চোখে-মুখে পৈশাচিক হিংস্রতা। আহমদ খলিলের বুঝতে কষ্ট হলনা - এই লোকটাই সকলের উপর নির্যাতন চালিয়ে থাকে।

ঃ প্রথমে লোকটিকে নগ্ন করে নেই। তারপর এই টেবিলের শুইয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলি। এরপর এই যন্ত্র দিয়ে তার পুরুষাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেই। এ ছোট্ট যন্ত্রটি খুবই কার্যকর এবং আজ পর্যন্ত এটা প্রয়োগ করে আমরা ব্যর্থ হইনি। তুমি যদি আমাদের কোন তথ্য দিতে না চাও, তবে তা পাওয়ার বহু রকম পথ আমাদের জানা আছে।

একটানা কথাগুলো বলে আহমদ খলিলের দিকে আঙ্গুল তোলে গার্ড -

ঃ আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

জীবনে বহুবার অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে আহমদ খলিল। কিন্তু তার মনে হয়– এবারের মত ভয় সে কখনো পায় নি। কিন্তু অবাক কান্ড, গার্ডরা বহুবার তাকে নির্যাতনের ভয় দেখাল, তবে বাস্তবে সে রকম কিছু করল না। এক সময় গার্ডরা তাকে টর্চার চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে আসে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের নীচে আরেকটি সেলে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে চলে যায় তারা। নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকার। কতদিন এখানে থাকতে হবে কে জানে– ভাবতে থাকে আহমদ খলিল। রাতের বেলা বন্দীদের প্রাণ ফাটানো আর্ত চিৎকার বহুক্ষণ ধরে শুনতে পায় সে। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে এই বুঝি তার ডাক এলো। কিন্তু না, কেউ তাকে নিতে আসে না। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

আযানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আহমদ খলিলের। মসজিদটি বোধ হয় কাছেই। অন্য আর একটি মসজিদের আযানের ধ্বনিও কানে আসে তার। বেশ সুরেলা। তারপর আরেকটা। এটা খুবই মিষ্টি। তবে একটু দূর থেকে। আযানের পর আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে চারদিক। আহমদ খলিলের মন থেকে সকল ভয় দূর হয়ে যায়, এক অদ্ভুত শান্তি তার মন জুড়ে বসে।

হঠাৎ কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ পেতেই চমকে ওঠে আহমদ খলিল। অন্তর কেঁপে ওঠে তার। শেষ পর্যন্ত ওরা তাকে নিতে এসেছে।

ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সে।

না, প্রহরী নয়। মাথায় পাগড়ি বাঁধা দু'জন লোক। মুখে এক অপার্থিব জ্যোতি। ঘন, দীর্ঘ, শুভ্র দাড়ি।

ঃ তুমি আমাদের চিনতে পেরেছ? অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি নরম গলায় প্রশ্ন করেন।

ঃ বহুকাল আগে আপনারা ছিলেন - আহমদ খলিল উত্তর দেয়। এখন আপনাদের মতো কাউকে আর দেখা যায়না। খলিফার বইতে এ দু'জনের কথা পড়েছিল।

ঃ আমরা- আমি আহমদ ইবনে হাম্বল এবং উনি ইমাম ইবনে তাইমিয়া। সঙ্গীর দিকে আংগুল তুলে দেখান তিনি।

ঃ আপনারা দু'জনেই কারাগারে ছিলেন। একজনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আপনারা আল্লাহর পথে জুলুম সহ্য করেছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বয়স্কজন আহমদ খলিলের চোখে চোখ রাখলেন। গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন ঃ তুমি আমাদের পথ অনুসরণ করতে ভয় পাচ্ছ কেন?

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। জেগে ওঠে আহমদ খলিল। কারো পায়ের শব্দে চোখ মেলে সে। গার্ডটিকে ভিতরে দেখতে পায়। পায়খানার গামলা নিয়ে যেতে আর তার সকালের খাবার দিতে এসেছে সে।

রাত না দিন আহমদ খলিল বুঝে উঠতে পারেনা। এ সময় হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। ভিতরে প্রবেশ করে শহরের পুলিশ প্রধান। বলে -

ঃ তোমার জরিমানা পরিশোধ করা হয়েছে। এখন তুমি মুক্ত। এখান থেকে এবার যেতে পার।

গার্ডরা সেলের দরজা খুলে থানার অফিস ঘরে নিয়ে আসে তাকে। মালেক ওহাব বসেছিলেন একদিকে। আহমদ খলিলের দিকে ফেরে পুলিশ প্রধানঃ তোমাকে ছেড়ে দেয়া হল - কারণ এটা তোমার প্রথম অপরাধ। কিন্তু এরপর তুমি সাবধানে চলাফেরা কর। পুলিশ তোমার দিকে লক্ষ্য রাখবে। আবার কখনো যদি তোমাকে এখানে আসতে হয় তবে কপালে দুঃখের সীমা থাকবেনা।

মালেক ওহাবের সাথে আবার উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে আসে আহমদ খলিল। কোন কাজ-কর্ম নেই। রেশন কার্ডও নেই। আরেকটা যে পাবে তারও উপায় নেই। চারদিকে শুধু নেই নেই এর কোরাস শুনতে পায় সে।

১৬.

ইদানীং খলিফার অসুস্থতা বেশ বেড়েছে। পঞ্চম গ্রেডের ছাত্র এখন সে। স্কুল চলাকালে ক্লাসের মধ্যে প্রায়ই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে করতে শরীর থেকে সব পোশাক খুলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যায়। তখন অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তার। ফলে ক্লাস রুমে হৈ হট্টগোলের সৃষ্টি হয় প্রায়ই।

এর মধ্যে স্কুলের প্রিন্সিপাল একদিন আহমদ খলিলকে তলব করেন। তার সামনে হাজির হয় সে। প্রিন্সিপালের কঠিন দৃষ্টি দেখে মনে হয় ঃ আহমদ খলিলকে একেবারে ভস্ম করে দিতে পারলেই তিনি যেন সন্তুষ্ট হন। তিনি খুব কঠোর কণ্ঠে বলেন ঃ তোমার ঝঞ্ঝাট পাকানো ভাইটিকে এ স্কুলে আর রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। মাথার মধ্যে একেবারেই কিছু নেই তার। নিজেরতো বটেই, ক্লাসের সমস্ত ছেলের ভবিষ্যতই সে নষ্ট করতে বসেছে। ছাত্রদের বসার বেঞ্চে না বসে মেঝেতে বসে থাকবে সে। এটা কি করে হয়? তোমার আব্বার কথাও সে শোনে না। তার শিক্ষক আমাকে বলে যে সে অসুস্থ, তবে ছাত্র হিসাবে খারাপ নয়। কিন্তু, আমিতো এখানে ডাক্তার হয়ে বসিনি। স্কুলের নিয়ম শৃংখলা আমাকেই দেখতে হবে। অসুখ যদি হয়ে থাকেই তাহলে তার চিকিৎসা কর। আমি এ স্কুলে থাকা অবস্থায় তাকে এখানে আর ঢুকতে দিচ্ছিনা।

নতমুখে বসে থাকে আহমদ খলিল। আসলেই তার বলার কিছু ছিলনা। আব্বার কাছে এ ব্যাপারটি যতদিন সম্ভব লুকিয়ে রাখতে হবে, সে ভাবে। তার ভয়, মালেক ওহাব ব্যাপারটি জানা মাত্রই খলিফার স্কুলে আসা বন্ধ করে দেবেন।

প্রিন্সিপালের দিকে তাকিয়ে বলে আহমদ খলিল ঃ আমার ভাইটি কোথায়? আমি তাকে নিতে এসেছি।

প্রিন্সিপাল তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের নীচে আঙ্গুল দিয়ে দেখান ঃ এই যে, ক্ষুদে শয়তানটা এখানেই। এই, বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি। তোকে আর কোন দিন এখানে দেখতে চাই না। চিৎকার করতে থাকেন তিনি।

কিন্তু খলিফার সাড়া পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি? আহমদ খলিল তাকিয়ে দেখে, টেবিলের নীচে নগ্ন শরীরে ধুলোর মধ্যে শুয়ে আছে খলিফা। অচেতন। সারা শরীরে প্রহারের দাগ স্পষ্ট। কয়েকজায়গায় চামড়া কেটে রক্তও বেরিয়ে এসেছে। ধুলো-বালি মাখা মুখে চোখ থেকে গড়িয়ে নামা অশ্রুর দাগ। পরম মমতায় ছোট ভাইটিকে কোলে তুলে নেয় সে, পা বাড়ায় তাঁবুর দিকে।

তাঁবুর অন্ধকার কোণে শুয়ে থাকে খলিফা। শরীর শুকিয়ে বিশ্রীভাবে ফুটে উঠেছে তার গালের হাড়। দু'টি নির্জীব হাত পড়ে থাকে উরুর দু'পাশে। তার নিষ্পলক দৃষ্টিতে অপার্থিব শূন্যতা। আর এভাবেই জীবনের দশটি বছর পার করে এগারোতম বছরে প্রবেশ করে সে।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আহমদ খলিল। চেষ্টা করেও বিছানা থেকে উঠতে পারছেনা খলিফা। অত্যন্ত দুর্বল মনে হয় তাকে। কাছে এগিয়ে যায় আহমদ খলিল। সর্বশেষ কখন খেয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফিসফিস করে খলিফা জানায় - তার ঠিক মনে নেই। তবে তিন কিংবা চারদিন আগে হতে পারে। চমকে ওঠে আহমদ খলিল। এই অসুস্থ বালকটি কারো কাছে কখনোই কিছু চায়না এবং সে জন্যেই তার দিকে কারো নজরও পড়েনা। আর শুধু একারণেই অনাহারের শিকার হয়ে মরতে বসেছে সে।

আহমদ খলিল অনেকখানি স্যুপ নিয়ে দুপুরে খলিফার কাছে আসে। হালিমা রেঁধেছেন। ভাইয়ের হাতে হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে স্যুপের বাটিতে চুমুক দেয় সে। এক, দুই, তিন। শেষ পর্যন্ত চার বাটি স্যুপ খেয়ে ফেলে খলিফা। চোখে মুখে পরম তৃপ্তির ছাপ নিয়ে শুয়ে পড়ে ভাইয়ের কোলে।

খলিফার অসুস্থ অবস্থায় তার শিক্ষক এবং ইখওয়ান সদস্যরা সাধ্যমতো সব কিছুই করার চেষ্টা করেন। আহমদ খলিল নিজে সব সময় তার কাছে কাছে থাকে। কিন্তু তার অবস্থার কোন উন্নতিই হয় না।

সব কিছুর মধ্যে মালেক ওহাবের ভয় আহমদ খলিলের মধ্যে বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। সে জানে, তার আব্বা এই ঝামেলা মোটেই সহ্য করতে চাইছেন না। যে কোন মুহূর্তেই খলিফাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে জেদ ধরে বসতে পারেন তিনি। তাই হল শেষ পর্যন্ত। সকালে উঠেই তাকে ডেকে পাঠান মালেক ওহাব। খলিফাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন তিনি।

খলিফাকে শিবিরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে পা উঠছিল না আহমদ খলিলের। মালেক ওহাব আগেই সবার সাথে কথা বলে রেখেছেন। ডাক্তাররা ভালো ভাবেই চিকিৎসা করবে। তাই এখন থেকে খলিফাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু মালেক ওহাবের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে প্রতিবাদের সাহস সে পায়নি। হাসপাতালে চিকিৎসার দুরবস্থা নিয়ে যা শোনা যায় আসলে তা নাও হতে পারে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো।

হাসপাতালে পা দিয়েই শংকিত হয়ে ওঠে আহমদ খলিল। ওয়ার্ডের অনেক উঁচুতে জানালা। আর প্রতিটি ওয়ার্ডেই তালা লাগানো। রোগীদের চিৎকার আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে জায়গাটা। তাকে ভিতরে ঢুকতে দেখে একজন এটেন্ড্যান্ট এগিয়ে আসে। একগোছা চাবি ঝুলছে কোমরে। ডাক্তারের সাথে দেখা করতে এসেছে কিনা জানতে চাইল সে। আহমদ খলিল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে লোকটি তাকে ডাক্তারের ঘরে পৌঁছে দেয়।

ঃ আরে তুমি! এসো - ডাক্তার তাকে দেখে বলে ওঠেন। তোমার আব্বা গতকাল এসে তোমার ভাই সম্পর্কে সব বলেছেন আমাকে। অবশ্য তারও আগে থেকেই আমি ব্যাপারটা জানি। সাধারণতঃ ১৬ বছরের নীচে কোন ছেলে বা মেয়েকে এখানে ভর্তি করা হয় না। তবে সত্যিকার অর্থে কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে বয়সের ব্যাপারটা বিবেচনা করা হয়। যাক, ওকে এদিকে নিয়ে এস, পরীক্ষা করে দেখি ।

আহমদ খলিল পিছাতে শুরু করে। খলিফাকে কোলে করে নিয়ে এসেছে সে। অবস্থা দেখে তার গলার আরো গভীরে মুখ লুকাতে চেষ্টা করে খলিফা।

ঃ দেখুন, আমি ঠিক ওকে ভর্তি করানোর জন্য আনিনি। আহমদ খলিল বলে - আমি হাসপাতালের অবস্থাটা দেখতে এসেছিলাম মাত্র ...

ঃ দুঃখিত। রোগী ছাড়া কাউকে এখানে প্রবেশ করতে দেয়া হয়না। তুমি যেতে পার। ডাক্তার বলেন।

ঃ ভর্তি করার আগে একটু দেখতে চাই ...।

ডাক্তারের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে আহমদ খলিল। দ্রুত ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকতে যেতেই এটেন্ড্যান্ট তাকে বাধা দেয়। চট্ করে তার কবজিটা মুচড়ে ধরে সে। এটেন্ড্যান্টের হাত থেকে চাবি পড়ে যায়। তাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে আহমদ খলিল। সাথে সাথে মল-মূত্রের অসহ্য দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয় তার। চোখে পড়ে, সেলের মধ্যে বন্দী উলঙ্গ উন্মাদ লোকগুলোকে। কারো আর্তচিৎকার, কারো অট্টহাসি। সে এক জঘন্য অবস্থা।

তাঁবুতে ফিরে এসে শরীরে আর কোন শক্তি খুঁজে পায়না আহমদ খলিল। খলিফাকে বুকের সাথ আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকে সে। খলিফা তাকায় ভাইয়ের দিকে। এক জোড়া সরল নিষ্পাপ চোখ– কিন্তু তাতে কোন অভিব্যক্তি নেই।

ঃ আচ্ছা, আমার মতো ছেলেদের জন্যেও ওখানে জায়গা আছে তাই না? খলিফা সরল গলায় জানতে চায়। আব্বা যদি বলে তাহলে আমি ওখানেই চলে যাব।

ঃ না। চিৎকার করে ওঠে আহমদ খলিল - কখনোই না। ওখানে তোমাকে যেতে হবে না। আমি আছি, তোমার দেখাশোনা আমিই করব।

গাজার উপর বিতৃষ্ণায় মন ছেয়ে যায় আহমদ খলিলের। প্রেসিডেন্ট নাসের মিসরের ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বৈরাচার বেড়ে চলছে। এমনকি ফারুকের সময়ের চেয়েও পরিস্থিতি এখন খারাপ। এদিকে খলিফার বিরুদ্ধেও আজকাল সবাই অভিযোগ করতে শুরু করেছে। আশপাশের তাঁবুগুলোর কেউই নাকি তার চিৎকারে রাতের বেলায় ঘুমোতে পারে না।

মালেক ওহাব ইতিমধ্যে খলিফাকে বেঁধে রাখার হুকুম দিলেও আহমদ খলিল শোনে নি। সে জানে, খলিফার মধ্যে পাগলামি ভাব দেখা গেলেও এ পর্যন্ত কারো ক্ষতি করে নি সে। তবে আহমদ খলিল এটা স্পষ্ট বুঝেছে যে খলিফাকে নিয়ে এখানে আর কোনক্রমেই থাকা যাবেনা। আসলে তাকে থাকতে দেয়া হবেনা। চলে যাওয়ার কথা ভাবে সে। কিন্তু কোথায়? চিন্তাভাবনায় দিশা হারানোর উপক্রম হয় তার।

সমস্যাটা নিয়ে গাজায় গিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে আলোচনা করেছিল আহমদ খলিল। একটা দরখাস্তের ফরম এনে দিয়ে দেশ তাগের জন্যে মিসরীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে বলেছিলেন তিনি। তাই করেছিল সে। তাও কয়েক মাস হয়ে গেছে এবং শুধু একবার নয়, পর পর তিনবার আবেদন করেছে সে। কিন্তু কোন জবাব আসেনি।

ঃ এক কাজ কর - হতাশ আহমদ খলিলকে বলেন ইমাম সাহেব। হজ্বে যাওয়ার জন্যে তৈরি হও। কারণ, এভাবে দেশত্যাগের অনুমতি ওরা দেবেনা। তবে হজ্বে যেতে কোন অনুমতি লাগেনা। তুমি যেতে চাইলে আমি সউদী সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে একটা দরখাস্ত করব - যাতে তারা তোমাকে সেখানে থাকতে দেয়।

ঃ তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আহমদ খলিল বলে - আমি সেখানেই থাকতে চাই। এখানে ফিরতে চাইনা। সবচেয়ে বড় কথা, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্যে আমি যদি যুদ্ধই করতে না পারি তবে মক্কা বা মদীনাতেই মৃত্যু বরণ করতে চাই।

ঃ থাকার জন্যে মদীনাই ভালো জায়গা - ইমাম সাহেব বলেন। তোমার সাথে দেখা হওয়ার কিছুদিন আগেই আমি সেখান থেকে এসেছি। মক্কার আবহাওয়া ভয়ংকর রকম গরম, চারপাশে শুধু মরুভূমি। মদিনার আবহাওয়া অনেক বেশী শীতল। তাছাড়া জমিও উর্বর। সেখানে আঙ্গুর ও খেজুরের বহু বাগান দেখতে পাবে। বেঁচে থাকার জন্যে একটা কাজও সেখানে পেয়ে যেতে পার। বহুদেশ থেকে আসা বহু লোকেরও দেখা পাবে। সেখানে রয়েছে মহান নবীর (স) মসজিদে নববী। তাঁর সাহাবাদের রওজাগুলো রয়েছে জান্নাতুল বাকীতে ।

ঃ আচ্ছা, ওখানেও কি বিদেশী শয়তানগুলো আস্তানা গেড়েছে? আহমদ খলিল জিজ্ঞেস করে।

একটু হাসলেন বৃদ্ধ। যেন তরুণের ছেলেমানুষী ক্ষোভটা উপভোগ করছেন।

ঃ বাবা, মিশকাতউল মাসাবিহ পড়নি? বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ এটা। তাতে লেখা আছে মহানবী (স) বলেছেন, কিয়ামতের আগে মুসলমানরা যখন ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী-খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকবে, যখন পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামের আলো নিভু নিভু হয়ে আসবে, তখনো মদীনাতে ইসলাম আগের মতই উজ্জ্বল থাকবে।

ঃ তার মানে মদীনায় এখানো বিদেশীরা জেঁকে বসেনি, তাই তো!

ঃ ঠিক তা নয় - ইমাম সাহেব জবাব দেন। পৃথিবীতে সব কিছু ঠিক মত চলে এটা বলা সম্ভব নয়। শুধু বেহেশতেই এটা হওয়া সম্ভব। তবে অন্যান্য জায়গা যেখানে বন্যাস্রোতের মতো বিদেশী প্রভাবে ভেসে গেছে সেখানে মদীনায় তার প্রভাব খুবই সামান্য। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের চেয়ে মদীনায় তুমি ইসলামকে বেশি করে পাবে। তাই মদীনার সর্বত্রই এটা দেখতে পাবে, এমন কি প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথেই তা অনুভব করবে।

ঃ যতদিন পর্যন্ত না ফিলিস্তিন স্বাধীন হয় ততদিন আমি মদীনাতেই থাকতে চাই। সপরিবারেই যেতে চাই আমি। কিন্তু অনুমতি ছাড়া সীমান্ত পেরোব কি করে? পুলিশ ধরে ফেললে তখন কি উপায় হবে? আবার যদি ট্রেনে করে সীমান্ত পেরোতে চাই, গাজার রেলস্টেশনে পুলিশদের ফাঁকি দেব কি করে?

ঃ ওদের চারজন আমার সমিতির সদস্য। ওরা তোমার ব্যাপারটা জানে এবং তোমার প্রতি তাদের সহানুভূতিও আছে। আমি ওদের সবই বলেছি। নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে, ওরা তোমার কোন ক্ষতি হতে দেবেনা ।

ইমাম যাবার আগে আহমদ খলিলের হাতে অল্প কিছু টাকা গুঁজে দিলেন।

ঃ এটা কি? বিস্মিত হয় আহমদ খলিল।

ঃ পথে টাকার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া জুমার নামাজের সময় তোমার জন্যে আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করব। সবাই সাধ্যমত কিছু না কিছু দেবে। এ টাকা নিতে লজ্জা করনা। কারণ বিপদের সময় তোমার বন্ধুরা তোমাকে দিচ্ছে। আমরা চাই, তুমি একজন মুক্ত মানুষের মত জীবন যাপন কর।

রাতে শোয়ার পর আসমাকে সব কথা খুলে বলে সে। তারপর জিজ্ঞেস করে -

ঃ তোমার ভয় করছেনা?

ঃ তুমি সাথে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। আসমা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়।

ঃ আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। জেলখানার চেয়ে এ জীবন কোন অংশেই ভাল নয়। অনিশ্চয়তার কথা মনে হলে ভয় করে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সম্ভাবনা আছে। যত দেরি হবে ততোই এখান থেকে যাবার পথ বন্ধ হয়ে আসবে।

ঃ কিন্তু, তোমার আব্বাকে নিয়ে কি করবে? তিনি কি সাথে যাবেন।

ঃ যৌবনে হজ্ব পালন করেছেন আব্বা। এখন স্কুল নিয়েই তৃপ্ত। আমাদের যাবার অনুমতি দিয়েছেন। তবে এক শর্তে। তাহল খলিফাকে আমাদের সাথে নিতে হবে। আমি তাকে কথা দিয়েছি। রশিদও আমাদের সাথে যাবে। আমরা তিনজনে মিলে তার দেখাশোনা করবো।

ঃ আমি ভাবছি যুদ্ধের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। বিষাদ ভরা গলায় আসমা বলে চলে - আমরা আর কখনো ফিলিস্তিনে ফিরতে কিংবা আমাদের ঘর-বাড়ি ফিরে পাব কি? মনে হয় না। শক্ররা অত্যন্ত শক্তিশালী, আর আমরা একেবারেই দুর্বল এবং অসহায়। তুমি সাহসী। আমি জানি, ফেদাইনদের সাথে নাহল মিদবারে বহু অভিযানে গিয়েছ, তোমার ছুরি দিয়ে বহু ইসরাইলী সৈন্যকেও হত্যা করেছ। কিন্তু তাতে ফিলিস্তিনে ফিরে আসা যাবে না। আর সাহস দিয়ে ফিরে পাবেনা তোমার গ্রাম, জমি, ভেড়ার পাল এবং সেই আগেকার শান্তি। এমনকি সমস্ত ফেদাইনরা মিলেও তা পারবেনা, তারা পারবেনা ফিরিয়ে দিতে আমার আব্বা, মা এবং ভাইকে ।

আহমদ খলিল অন্ধকারের মধ্যেই আসমার চোখের দিকে তাকায়। তার কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠা বিষাদের সুর তার মনকেও বিষন্ন করে তোলে।

ঃ আমি জানিনা, কবে আমরা মাতৃভূমিতে ফিরতে পারব। আমি এও জানিনা, স্বাধীন ফিলিস্তিন আমরা দেখে যেতে পারব কিনা।

আহমদ খলিল বাস্তব সত্যটি স্বীকার করে ঃ এখন আল্লাহ্‌র কাছে এজন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। তার নিজের কণ্ঠেও গভীর বিষাদের সুর বেজে ওঠে।

১৭.

জনাকীর্ণ গাজা রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে আহমদ খলিল। অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার ভয়, যে কোন মুহূর্তে সবকিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে। এটাই তার জীবনের প্রথম দীর্ঘ সফর এবং বড় কথা হল, সাধারণ সফর নয় এটা। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে যাচ্ছে ঃ হজ্জ পালন করবে এবং মদীনাতেই থেকে যাবে। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা তার জানা নেই।

এ সবের মধ্যে মুগ্ধ চোখে বার বার আসমার দিকে তাকাতে থাকে সে। কালো বোরখায় ঢাকা তারা শরীর। মুখটা শুধু খোলা। তাতে ফুটে আছে নিষ্পাপ শিশুর সারল্য। তার পাশে জমা করে রাখা সংসারের যাবতীয় সামগ্রীঃ পানি ভর্তি তিনটি ছাগলের চামড়ার মশক, দুটি নতুন এলুমিনিয়ামের পাত্র, একটি কেরোসিন ষ্টোভ এবং একটি বস্তায় খেজুর, আটা ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী। আবার সে তাকায় আসমার দিকে। তার মনে হয়, আসমা যে এত সুন্দরী, তা আগে কখনো বুঝতে পারেনি সে। আসমা স্বামীর দিকে একবার এক পলকের জন্যে তাকায়, তারপরই চোখ নামিয়ে নেয় নীচের দিকে।

গাজা রেল স্টেশনে একমাত্র তারাই হজ্বযাত্রী। অন্য হজ্বযাত্রীদের কাছ থেকে তাদের আলাদা করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। হজ্ব কর্তৃপক্ষ এবং মিসর সরকার তাদের চারজনকে হজ্বে যাওয়ার অনুপযোগী ঘোষণা করে মিসর ত্যাগের অনুমতি দেয়নি। মিসরের আইন অনুযায়ী তারা হজ্বের জন্যে উপযুক্ত নয়। কারণ একে তারা উদ্বাস্তু, তদুপরি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হজ্বে যাবার অনুমতি দেয়া হয় না। এর মধ্যেও যে কিছুলোক হজ্বে যায় না তা নয়, তবে তারা বিত্তবান বলেই বিশেষ অনুমতি পায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহমদ খলিলদের কোন ক্রমেই হজ্বে যেতে দেয়া হবে না। তারা কপর্দকহীন, সফরের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতাও তাদের নেই। তাছাড়া আসমা গর্ভবতী। গর্ভবতী মহিলাদের হজ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ। আরো আছে কিশোর খলিফা। কিশোরদের হজ্বে যেতে দেয়া হয় না। একজন সহানুভূতিশীল অফিসার খুব ভদ্রভাবে আহমদ খলিলকে জানিয়েছেন - এসব কারণেই তাদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। আহমদ খলিল অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন অনুরোধেই অফিসারটির মন গলেনি।

আহমদ খলিল প্রতিজ্ঞা করে - হজ্বে সে যাবেই। যে করেই হোক। সে জানে ১৮ বছর বয়স হলেই এবং সামর্থ থাকলে হজ্বে যাওয়া যায়। এটুকু তার আছে। তাছাড়া এটা শুধু হজ্বই নয়, তার এবং তার পরিবারের জীবন-মরণের প্রশ্নও বটে। তার কোন ঘর নেই, কোন দেশ নেই। এখান থেকে ফিরে গেলে তাকে আবার ঢুকতে হবে উদ্বাস্তু শিবিরের সেই বন্দীশালায় যার চাইতে মৃত্যুই এখন অধিকতর কাম্য। তার মনে হয়, যেহেতু তার ঘর এবং দেশ নেই– অতএব এই হজ্ব তার জন্যে হিজরতও বটে।

অফিসারটি তাকে পরের বছর যেতে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু আহমদ খলিল জানে, মিসরে নাসেরের শাসনের কব্জি আরো শক্ত হচ্ছে এবং পরের বছর আদতেই আর পালানো হয়ে উঠবেনা। সুতরাং, বাধা যাই আসুক, ফিরে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয় সে।

রেল ইঞ্জিনের হিস্-হিস্ শব্দে ঘোর কাটে তার। টিকেটগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। মানুষের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির মধ্যে কোনক্রমে তৃতীয় শ্রেণীর একটা বগিতে উঠে পড়ে তারা। সিট পেয়ে যায়। কাঠের আসনে পাশাপাশি বসে পড়ে সবাই। ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন ছাড়তেই সবাই ভয়ে আঁতকে ওঠে। জীবনে এই প্রথম ট্রেনে চড়েছে তারা।

কানতারা পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়। এটা হল লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত মিসরীয় বন্দর। স্টেশন ত্যাগ করার আগেই এক পুলিশ এসে পথ আটকায় তাদের।

ঃ তোমাদের কাগজপত্র দেখাও। কর্কশ গলায় হুকুম করে সে। কাগজপত্র বের করে দেয় আহমদ খলিল। সে গুলোর উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়েই দলা পাকিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারে পুলিশটি।

ঃ এগুলো কি? চিৎকার করে ওঠে সে। তোমাদের পাসপোর্ট, ভিসা, স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট এগুলো কোথায়? তোমরা নিশ্চয়ই মিসরীয় নাগরিক নও! ঠিক আছে! চলো, বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টার অভিযোগে সবাইকে গ্রেফতার করা হল।

চোখের পলকে পুলিশের হাতের লাঠিটি ছিনিয়ে নেয় রশিদ। একটি মাত্র ঘুষি। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় পুলিশটি। আর কোন পুলিশ এসে পড়ার আগেই জায়গাটি ছেড়ে অসংখ্য লোকের ভিড়ে মিশে যায় তারা।

বন্দরে বহু হজযাত্রী বহনকারী জাহাজের ভিড়। এর মধ্যে বেশ কিছু আধুনিক জাহাজও রয়েছে। কিন্তু এগুলোর ভাড়া তাদের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া হজযাত্রীরা আগে থেকেই এসব জাহাজের আসন সংরক্ষণ করে রেখেছে। সস্তা ভাড়ার খোঁজে তারা জাহাজ থেকে জাহাজে ঘুরে ঘুরে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখনই খোঁজ মিলল একটি পাল তোলা জাহাজের।

এ জাহাজটি বড় আকারের, কিন্তু খুবই পুরনো। কুয়েত থেকে এসেছে। হাজী নিয়ে যাবে জেদ্দায়। বেদুইন, মিসরীয় ফেলাহীন এবং আফ্রিকার গভীরতম অংশ থেকে আগত বিশালদেহী কালো মানুষের ভিড়ে জাহাজটি ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে উঠেছে।

আহমদ খলিলদের ছোট দলটাকে দেখামাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেন চেঁচামেটি শুরু করে দেয়। জায়গা নেই, জায়গা নেই বলে চিৎকার করতে থাকে। আর লোক উঠলেই জাহাজটি ডুবে যেতে পারে বলেও সে হুঁশিয়ার করে দেয়।

কোন বাধা মানে না তারা। জাহাজের লোকজনের সাথে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় সিঁড়িতে। অবশেষে পুরো ভাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে জাহাজের ডেকে জায়গা হয় তাদের। জিনিসপত্র গুছিয়ে আহমদ খলিল যখন মুখ তুলে তাকাল জাহাজটি তখন বন্দর ছেড়ে সাগরের অনেক গভীরে চলে এসেছে।

খুব কষ্টের মধ্যে কাটতে থাকে জাহাজের দিনগুলো। খোলা ডেকে সূর্যের বাধাহীন তীব্র উত্তাপ এসে আছড়ে পড়ে বিত্তহীন মানুষগুলোর গায়ে। কোন আড়াল নেই, আড়াল সৃষ্টির কোন পথও নেই। এর মধ্যেও দু'একজন ভাগ্যবান মানুষের দেখা পাওয়া যায়। তারা পালের ছায়ার নীচে নিজের জন্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। সূর্যের তাপে ভাজা হতে থাকা মানুষগুলোর ঈর্ষা জমে উঠতে থাকে তা দেখে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন আসমাকে ডেকের নীচে মেয়েদের কেবিনে রেখে আসার জন্য বলে। আসমা তাতে রাজি হয় না। ক্যাপ্টেন কোন মহিলাকে ডেকে পুরুষদের মধ্যে থাকতে দিতে রাজি নয়। ঝামেলা এড়াতে আসমাকে সাথে নিয়ে নীচে নেমে যায় আহমদ খলিল। কিন্তু কেবিনের অবস্থা দেখে প্রায় আঁতকে ওঠার অবস্থা হয় তার। আলো-বাতাসহীন কেবিনটি। তার মধ্যে গাদাগাদি করে জায়গা করে নিয়েছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো বোরখায় ঢাকা জনা বিশেক মহিলা। তার মনে হয়, এ কেবিনে রাখা আর আসমাকে নির্যাতন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসমা নিজেও বেঁকে বসে। আহমদ খলিল সমস্যায় পড়ে যায়। কারণ, উপরে শ'য়েক পুরুষের মধ্যে একজন মহিলাকে রাখা অসমীচীন, আবার এই বদ্ধ কুঠুরিতে রাখলে সে যে শিগগিরই অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অবশেষে অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে বিষয়টির রফা হয়। ঠিক হয়, পর্দা ঠিক রেখে আসমা উপরেই থাকবে।

জাহাজের নতুন জীবনের দিনগুলো বৈচিত্র্যের মধ্যে কাটতে থাকে আহমদ খলিলের। নাবিকদের দিকে কখনো কখনো চেয়ে দেখে সে। এদের মধ্যে অধিকাংশই দাস অথবা দাসের সন্তান। প্রত্যেকের গায়ে সাদা-কালো ঢোলা জামা, কোমরের কাছে তা বেল্ট দিয়ে কষে বাঁধা। নগ্ন পাথরের মত খোদাই করা মুখগুলো অভিব্যক্তিহীন। আহমদ খলিল জানে, এরা প্রত্যেকেই এক একজন অভিজ্ঞ নাবিক। এদের সবারই কৈশোর শুরু হয়েছে সাগরে, এমন কি জীনের শেষদিনেও এই সাগরই তাদের সঙ্গী। এদের খাবার বলতে ভাত, খেজুর এবং কখনো কখনো সামুদ্রিক মাছ। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজের দিক ঠিক করা, খালিপায়ে মই বেয়ে উঠে যাওয়া, পাল নামানো ইত্যাদি সব কাজই তারা এত অনায়াসে এবং নিপুণ দক্ষতায় সম্পন্ন করে যে, আহমদ খলিল অবাক না হয়ে পারেনা। সবচেয়ে ঝুঁকিময় কাজেও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতির চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পায়না সে। তাদের জাহাজের আশেপাশে আরো বহু জাহাজ পাল তুলে এগিয়ে চলেছে। যতদূর চোখ যায়, সাগরের নীল পানিতে শ্বেত শুভ্র পালের অপূর্ব সমারোহ। সে দৃশ্য মুগ্ধ দৃষ্টিকে টেনে রাখে। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আহমদ খলিলের মনে হয়, ক বছরই বা হবে? একদিন প্রাচ্যের সমুদ্রগুলোতে মুসলমানদের ছিল একচ্ছত্র প্রতাপ। অসংখ্য জাহাজ সেদিন এমনি সমুদ্রের খোলা বাতাসে পাল উড়িয়ে যাত্রা করত ভারত, চীন, মালয়, জাভার বন্দর থেকে বন্দরে। সেই অসীম সাহসী জাতির বর্তমান অবস্থার কথা মনে হতে বুক চিরে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার।

জাহাজে ওঠার পরও খলিফার অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনা। দিন দিন আরো শুকিয়ে যেতে থাকে সে। সারাদিন নির্বাক, নিস্পন্দভাবে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোন আগ্রহই তার নেই। কিছু খাওয়াতে গেলে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করে। বাধ্য হয়ে আহমদ খলিল ও রশিদ জোর করে শুইয়ে দেয় তাকে। তারপর দাঁতের পাটি ফাঁক করে তরল খাবার ঢেলে দেয় গলায়।

কোন কোন সময় আহমদ খলিল খাওয়ার জন্যে খলিফাকে কাকুতি মিনতি করে। তখন খলিফা বলে, সব শত্রু মিলে তাকে বিষ খাওয়াতে চাইছে - সব খাবারেই, এমনকি পানিতেও শত্রুরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। অতএব কোন কিছুই সে খাবেনা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। আহমদ খলিল এবং রশিদ দু'জনেই খলিফার এ অবস্থায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। একটি কিশোর না খেয়ে বা না ঘুমিয়ে কয়দিন বেঁচে থাকতে পারে ! এর উপর সারাদিনই ভীষণভাবে খলিফার মাথা ধরে থাকে। প্রচণ্ড সূর্যতাপের কারণে এটা হচ্ছে ভেবে দু'জনে তাকে জোর করে গোসল করিয়ে দেয়। ভাবে, পানির স্পর্শে নিশ্চয়ই শরীর শীতল হয়ে ঘুমিয়ে যাবে সে।

কিন্তু, তা হয় না। খলিফার চিৎকার, গালাগালি আরো বেড়ে যায়। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে। সন্ধ্যা পেরিয়ে আসে রাত। কিন্তু খলিফা ঘুমায় না। তার অসহ্য যন্ত্রণা, কাতরোক্তি এবং মাঝে মধ্যে চিৎকার অসহ্য হয়ে ওঠে। দিন কোনভাবে কাটলেও প্রতিটি রাত তাদের জন্যে একটি দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়।

হঠাৎ করে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। মাঝ বয়সী এক মিসরীয় হাজী পবিত্র কুরআন সাথে এনেছিলেন। প্রতিদিন ডেকের মাঝামাঝি জায়গায় বসে চমৎকার সুরেলা গলায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করে চলেন। সেই সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্যে তার চারপাশে প্রতিদিনই বেশ বড় রকমের একটা ভিড় জমে ওঠে। হাজী সাহেব উপস্থিত তরুণ-বৃদ্ধ সবাইকেই এক এক করে কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কোন সূরা কিংবা তার অংশ-বিশেষ পড়তে বলেন। এক জনের পড়া শেষ হলে তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা চলতে থাকে এবং এভাবেই কখন যে প্রখর সূর্যতাপে ভরা একটি দিন কেটে যায় তা কেউ টেরই পায় না।

জাহাজে ওঠার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। কিন্তু খলিফা এর মধ্যে একদিনও স্বেচ্ছায় তার জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়েনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে তার মনোযোগ পড়ে ডেকের জমায়েত মানুষগুলোর দিকে। কি মনে হতে উঠে দাঁড়ায় সে। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে লোকের ভিড়ের মাঝে বসে পড়ে। রোজকার নিয়মানুযায়ী এক সময় খলিফার পালা এসে যায়। কিন্তু কুরআন শরীফ হাতে নেয়ার আগেই এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ তাকে বাধা দেন। পাশে রাখা একপাত্র পানি খলিফার হাতে তুলে দিয়ে তোকে অজু করে আসতে বলেন তিনি।

আদেশ পালন করে খলিফা। অজু সেরে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে স্বচ্ছন্দে তিলওয়াত করতে থাকে সে। উপস্থিত লোকজন আশ্চর্য হয়ে যায়। এমন মধুর গলায় কুরআন তিলওয়াত আগে তারা কেউই শোনেনি। একজন বলে ওঠে ঃ কি চমৎকার তিলাওয়াত ছেলেটির ! নিশ্চয়ই সে এক জন শিক্ষিত ক্বারী। অন্য একজন প্রশ্ন করে খলিফাকে -

ঃ এরকম কুরআন পাঠ তোমাকে কে শিখিয়েছে?

ঃ ইখওয়ানুল মুসলেমিন। খলিফা উত্তর দেয়। আমি অর্ধেক কুরআন শরীফ মুখস্ত বলতে পারি। স্কুলে থাকতে শিখেছি।

একজন অনুরোধ করে -

ঃ তাহলে আমাদের আরো কিছু শোনাও। যেখান থেকে তোমার খুশি।

সূরা হাদীদ থেকে তিলাওয়াত শুরু করে খলিফা ঃ

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি যা হতে উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ দান করেন, আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল।

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র পক্ষে তা খুবই সহজ, তা এই জন্যে যে তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্যে হঠাৎ উৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীকে।"

লোকগুলো অবাক বিস্ময়ে সেই সুরেলা, মাধুর্য মণ্ডিত কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে। অবশেষে সূরা শেষ হয়। থেমে যায় খলিফার কণ্ঠ। দীর্ঘ সূরার কোথাও এতটুকু ভুল খুঁজে পায় কেউ।

ঃ আমি এর অর্থও জানি– খলিফা বলে।

ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বলে ওঠেন -

ঃ যদি তাই হয়, তবে বয়সের তুলনায় বহুদূর এগিয়ে গেছ তুমি । আমার মনে হয়, তুমি নিঃসন্দেহে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পাবে।

এ ঘটনার পর যাত্রীরা খলিফাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমীহের চোখে দেখতে থাকে। মিসরের সেই ফেলাহীন হাজী পবিত্র কুরআন পাঠের আসরে অত্যন্ত তাজীমের সাথে খলিফাকে ডেকে কাছে বসান। জীবনের অভিজ্ঞতায় মেশানো বহু ঘটনা শোনান তিনি। আজ থেকে বিশ বছর আগে প্রথম হজ করেন তিনি। এবার তার দ্বিতীয় এবং হয়তো বা শেষ হজ। তার একটি ছেলে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ছে। তার কথাও শোনান তিনি খলিফাকে।

এখন রাতে শান্তভাবে ঘুমায় খলিফা। আহমদ খলিল অনেক রাত অবধি মমতাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার অসুস্থ, শীর্ণদেহী ভাইটির দিকে। বহুদিন ধরে বহু সাধ্য সাধনায়ও যা হয়নি আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম মুবারক পাঠে তা সম্ভব হয়েছে। খলিফার তেলহীন রুক্ষ চুল ভরা মাথায় সে সযত্নে আঙ্গুল বুলিয়ে চলে। আল্লাহ্‌র কাছে তার পূর্ণ রোগমুক্তির জন্যে আকুতি জানাতে থাকে।

জাহাজ ক্রমে জেদ্দার নিকটবর্তী হতে থাকে। ইদানিং আহমদ খলিলের সময়ের বড় অংশ কাটছে হজ নির্দেশিকা নামক একটি পুস্তিকা নিয়ে। পড়তে সক্ষম সকল যাত্রীকেই জাহাজের ক্যাপ্টেন এক কপি করে এই গাইডবই উপহার দিয়েছেন। হজের বিভিন্ন পালনীয় বিষয়, নিয়ম-কানুন, দোয়া, মোনাজাত সবাই একসাথে বসে আলোচনা করে ঠিক-ঠাক করে নিচ্ছে।

সন্ধ্যা নেমে আসতেই জাহাজে হাজীদের কলগুঞ্জন থেমে যায়। অপরূপ প্রশান্তির ভাব নেমে আসে চারপাশে। আকাশে চাঁদের দিকে চোখ যায় আহমদ খলিলের। নির্মেঘ নীল আকাশে লক্ষ তারার মাঝে অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত জ্বিলহজ্বের চাঁদ। তার মনে পড়ে, এই চাঁদ পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে বয়ে এনেছে পবিত্র হজের আগমন বার্তা।

হঠাৎ করে পাশে কারো উপস্থিতি অনুভব করে মুখ ফেরায় আহমদ খলিল। আবছা আলো-আঁধারে বিশালদেহী এক কালো মানুষকে দেখতে পায় সে। অচেনা। আহমদ খলিলকে তার দিকে তাকাতে দেখে সে হাসে। তার সুন্দর সাদা দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে।

ঃ মেহেরবাণী করে চলুন, আমরা কোথাও একটু বসি। কালো মানুষটি বলে ওঠে - আমি খুবই নিঃসঙ্গ। আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।

আহমদ খলিল তাকে অনুসরণ করে। এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে জাহাজের নির্জন একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে বসে পড়ে তারা।

নিজে থেকেই কথা বলে চলে লোকটি। নাইজেরিয়ার একটি গ্রামে তার জন্ম। বড় হবার পর থেকেই তার উপজাতীয় গোত্রের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আস্থা হারায় সে। এ সময় এক মুসলমান ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় হবার পর তার কাছেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর পর পবিত্র হজব্রত পালনের জন্যে তার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দু'বছর আগে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, কখনো কাজ করে পয়সা জমিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অবশেষে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আহমদ খলিল লক্ষ্য করে, বিশালদেহী মানুষটির চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানি। গভীর সহানুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে। তার ডান হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয় সে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলে -

ঃ ভাই, আপনার স্থান আমাদের চেয়ে উঁচুতে। কারণ জন্মগতভাবে একজন মুসলিমের চেয়ে একজন নও মুসলিমের মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশি।

দু'জনের মনই এখন ভিন্ন ধরনের এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। দু'জনই নীরব। সাগরের ঢেউ ভেঙ্গে পড়তে থাকে জাহাজের গায়ে। রাতের শীতল বাতাস স্বস্তির পরশ বুলিয়ে যেতে থাকে তাদের শরীরে। আকাশে চাঁদ ডুবে যায়। গাদাগাদি করে রাখা মালপত্রের বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে তারা। এক সময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে পাশাপাশি।

অনুকূল বাতাস না থাকায় জেদ্দা পৌছতে আরো দু'দিন লেগে যায়। অবশেষে বন্দরে নোঙ্গর ফেলে জাহাজটি। কিন্তু যাত্রীরা তীরে নামার আগেই বাধা আসে। বন্দরের এক কর্মকর্তা জানিয়ে দেন - কাউকেই তীরে নামতে দেয়া হবে না।

ব্যাপারটি কেউ বুঝে উঠতে পারে না। অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসে তীরে নামতে না পেরে সবার মধ্যে হতাশা দেখা দেয়।

অবশেষে একজন উর্ধতন কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে তীরে নামার অনুমতি মেলে। সবার সাথে আহমদ খলিলদের ছোট্ট দলটিও নেমে আসে।

বন্দরের একদিকে লাল রঙের কয়েক ডজন বাস দাঁড়িয়ে। আহমদ খলিল এবং রশিদ বাসের ভাড়া শুনে দমে যায়। এত বেশি ভাড়া দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হেঁটে যাবে বলেই মনস্থির করে তারা। কিন্তু আসমার দিকে তাকিয়ে সে চিন্তা বাদ দিতে হয়। গর্ভবতী আসমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত একটা পথ পেয়ে যায় তারা। বাসের ছাদে চড়ে গেলে ভাড়া অর্ধেক। কিন্তু সেখানেও জায়গা পাওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। স্বল্প খরচের যাত্রীদের ভিড়ে সবগুলো বাসের ছাদই ইতিমধ্যে ভরে উঠেছে। মালপত্র নিয়ে একটি বাসের ছাদে কোনমতে বসার জায়গা করে নেয় তারা।

যাত্রী ভরে যাবার পরও বাস ছাড়তে এক ঘন্টা দেরি হয়ে যায়। আগুন ঝরানো মরু সূর্য ছাদের উপরের যাত্রীদের উপর অবাধে উত্তাপ ছড়াতে থাকে।

এক সময় বাসটি চলতে শুরু করে। একটি নয়, দু'টি নয়, অসংখ্য বাসের কাফেলা। হাজার হাজার মানুষ। এক সময়ে তারা সবাই এসে পৌছে মক্কা মোয়াজ্জমায়।

বাস থেকে নেমে আসমার হাত শক্ত করে ধরে আহমদ খলিল। অপ্রশস্ত পথে হাজারো মানুষের ভিড়। মানুষের ধাক্কায় যে কোন মুহূর্তে দলছুট হয়ে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসমার হাত ধরে খলিফা ও রশিদকে পাশে নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে সে। হঠাৎ করে তার সব কিছুই স্বপ্ন বলে মনে হয়। মক্কার পথ ধরে মানুষের ভিড়ে সে হেঁটে চলেছে– ব্যাপারটি কিছুতেই তার বিশ্বাস হতে চায়না।

হারাম শরীফ কোন দিকে তা কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার পড়েনি। জনতার ভিড়ে মিশে এক সময় ঠিক মতই পৌছে যায় তারা। হারাম শরীফের ভিতরে পা রাখতেই আহমদ খলিলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে এসেছ। সুউচ্চ মিনার থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। এত সুন্দর, মিষ্টি, মর্মস্পর্শী আজানের সুর আগে কখনো শোনেনি সে। হাজারো কণ্ঠে আল্লাহ্‌র রহমত ভিক্ষা এবং ক্ষমা প্রার্থনার আকুল আর্তিতে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে।

আহমদ খলিল নিজেও আর স্থির থাকতে পারে না, কেঁদে ফেলে আবেগে তারা পিছনে পড়ে গিয়েছিল। তাই মানুষের ভিড় ঠেলে পবিত্র কাবা ঘর দর্শন করতে ব্যর্থ হয় তারা। কিন্তু আহমদ খলিল এজন্যে কোন আফশোস বোধ করে না। কারণ এই বিশাল জনারণ্যের বাধা অতিক্রম করে তার মানসচক্ষে আল্লাহ্‌র ঘরের সম্পূর্ণ আদলটাই যে ভেসে উঠেছে!

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হতেই বিজলী বাতির বন্যায় চারদিক ভেসে যায়। হাজার হাজার মানুষের কাতারবন্দী হয়ে নামাজ আদায়ের এক অপূর্ব দৃশ্য তার চোখে পড়ে। শৈশব থেকেই নামাজ আদায় করে আসছে আহমদ খলিল। কিন্তু এ রকমটি আর কখনো দেখেনি। সে চিরদিনই কেবলা মুখী হয়েই নামাজ আদায় করেছে। এখানে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ফিলিপাইন এবং পশ্চিমে মরক্কো, ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড এমনকি আমেরিকা থেকেও হাজার হাজার নারী ও পুরুষ ছুটে এসেছে হজ্ব সমাপনের আকুল আকাঙ্ক্ষায়। চারদিক থেকে কাবা ঘরকে ঘিরে নামাজ আদায়ে রত সবাই। এখানে কোন দিক নেই, মানুষের কোন ভেদাভেদ নেই। মহামিলনের এই মহান দৃশ্য তাকে অভিভূত করে তোলে।

এশার নামাজ শেষ হওয়ার পর ভিড় কমতে শুরু করে। পবিত্র কা'বা ঘর এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টির আড়াল অপসৃত হয়। আহমদ খলিল, রশিদ, খলিফা এবং আসমা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চারকোণাকৃতি, সোনালী কারুকাজ মন্ডিত কালো গিলাফে ঢাকা পবিত্র কাবাঘরের দিকে! নিশ্বাস নিতেও ভুলে যায় যেন তারা। আল্লাহ্‌র আদেশে পৃথিবীতে আল্লাহ্ ঘরের এই প্রতিকৃতি তৈরী করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তখন থেকেই এই ঘরটি সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থানের মর্যাদা লাভ করেছে। যুগে যুগে, কালে কালে কত লক্ষ-কোটি মানুষ বছরে একবার এখানে ছুটে এসেছে, আল্লাহ্‌র রহমত লাভের জন্যে প্রার্থনা করেছে, কৃত পাপের জন্যে মার্জনা চেয়েছে। পৃথিবীতে এটিই একমাত্র প্রার্থনার স্থান যেখানে আল্লাহ্‌র এবাদত ছাড়া একটি ঘন্টাও অতিবাহিত হয় না।

ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যায় কাবা ঘরের দিকে। যতই কাছাকাছি হতে থাকে ততই নিজেকে অপরিষ্কার এবং ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে আহমদ খলিলের। আরো নিকটতর হয় তারা। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই পবিত্র গৃহের দিকে। আহমদ খলিলের নিজেকে খুব দুর্বল মনে হতে থাকে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে বলে তার ভয় হয়। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রশিদ তাকে ধরে ফেলে। তার গায়ে হেলান দিয়ে কা'বা ঘরের দিকে অপলক চেয়ে থাকে আহমদ খলিল।

খলিফা ইতিমধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে কালো গিলাফের প্রান্তদেশ চুম্বন করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ায়। শরীর টান টান হয়ে ওঠে তার। আহমদ খলিলের মনে হয়, দীর্ঘ শক্ত গড়নের রশিদের মাথা ছাড়িয়ে খলিফার মাথা যেন আরো উঁচুতে উঠে গেছে। অদ্ভুত এক অপার্থিব আলোর দ্যুতি তার চোখে মুখে খেলা করতে থাকে।

১৮.

মদীনা মনোয়ারার অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল আহমদ খলিল। মক্কা থেকে বন্যার স্রোতের মতো ধেয়ে আসা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তারা এক সময় এসে পৌছে মদীনায়। তার সাথে রশিদ, খলিফা এবং আসমা একে অপরের হাত ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে হয়, পৃথিবীতে এটিই সেই স্থান যেখানে সে নতুন করে তার জীবন শুরু করতে পারে। তার অন্তরও যেন এ চিন্তার প্রতিধ্বনি তোলে - হ্যাঁ এটাই তোমার দ্বিতীয় আবাসভূমি। এখানেই তুমি খুঁজে পেতে পার তোমার সুখ এবং আনন্দ। আশ্চর্য যে এতো মানুষের ভিড়ের মধ্যেও কোথাও কোন ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি বা বিশৃঙ্খল আচরণ চোখে পড়লনা তার।

এক সময়ে তারা শহরের ভিতর দেয়ালের গা ঘেঁষা প্রধান বাজারে পৌছে যায়। দোকানীরা হরেক রকমের পশরা সাজিয়ে বসেছে। পূর্ব এবং পশ্চিমের খুব কম জিনিসই আছে যা এই দোকানীদের কাছে নেই। উটের জিন, কাশ্মীরে অপূর্ব কারুকাজ করা শাল, ইরানী কার্পেট থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, জাপানি টেপ রেকর্ডার প্রভৃতি সবই পাওয়া যায় এখানে। বহু লোক চলার পথে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জিনিস দেখে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আহমদ খলিলের এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। ডানে বামে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে সে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ কিছু দূরে মসজিদে নববীর পাঁচটি সুউচ্চ মিনারের দিকে। আরো কিছুটা পথ পেরিয়ে অবশেষে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে তারা।

মার্বেল পাথরের মোটা স্তম্ভের দীর্ঘ সারি মসজিদের ছাদকে ধরে রেখেছে। মেঝেতে অনেকটা বৃত্তাকারে নীল ও সাদা রঙের টালি বিছানো। এর অগ্রভাগ মক্কার দিক নির্দেশ করছে। মসজিদের মেঝেও মার্বেল পাথরের। তা ঢেকে রেখেছে বহুমূল্য ইরানী গালিচা। এত চমৎকার, সুন্দর এবং মহিমামন্ডিত মসজিদ আর কোনদিন দেখেনি আহমদ খলিল।

মহানবী (স) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের জন্যে উঠে যায় আহমদ খলিল। রওজাটি সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে। ব্রোঞ্জ এর গ্রিল দিয়ে উপরিভাগ ঘেরা। আহমদ খলিলের হঠাৎ মনে হয়, মহানবী (স) যেন তার আশে পাশেই আছেন। স্পষ্টতইঃ সে যেন তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে। এ সময় মানসপটে ভেসে ওঠে বিদায় হজের দৃশ্য। সে স্মরণ করে হযরতের (স) সেই উদাত্ত কণ্ঠের বিদায় ভাষণঃ

"হে লোক সকল! একদিন খোদার সম্মুখে তোমাদের হাজির হতে হবে। হুঁশিয়ার! আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়না

হে আমার উম্মতগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাক তবে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবেনা।

এক পর্যায়ে মহানবী (স) সমবেত জনমন্ডলীকে জিজ্ঞেস করলেন-

"একদিন আল্লাহ্‌তা'লা আমার কার্যাবলী সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষ্য তলব করবেন। তোমরা সেদিন কি বলবে?"

উপস্থিত জনমন্ডলী সমস্বরে উত্তর দেয় -

"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর রাসূল! আপনি ভালো ও মন্দের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন।"

তখন মহানবী (স) আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন,

"হে আল্লাহ! তুমি এদের সাক্ষ্য শোন। তুমি এই জনমন্ডলীর স্বীকারোক্তি শোন। তুমি আমার সাক্ষী থাক।

এ সময় আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম। তোমাদের সাথে আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দ্বীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করা হল।' "

আহমদ খলিল হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর রওযা জিয়ারত করে। একই স্থানে তাঁরা পাশাপাশি শায়িত। নিঃসীম নীরবতার মধ্যে সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যায় আহমদ খলিল। সে শুনতে পায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কণ্ঠের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঃ

"ভাইসব"! আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও আমি আপনাদের শাসনকর্তা। যদি আমি ঠিক পথে থাকি তবে আমাকে আপনারা সমর্থন দেবেন। আর যদি আমি ভুল করি তবে আপনারা আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। আমি যতদিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবো ততদিন আপনারাও আমাকে মান্য করবেন। যদি আমি তাদেরকে না মানি তবে আপনারাও আমাকে মানবেন না। জেনে রাখবেন--আমিও আপনাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ মাত্র ।"

হযরত উমরের (রাঃ) রওজার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আহমদ খলিল। এই সেই খলিফা যিনি নবীন ইসলামী রাষ্ট্রকে গৌরবের শীর্ষস্থান পৌছে দিয়েছিলেন। ইনিই সেই শাসক যিনি একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও খেজুর পাতার বিছানায় নিদ্রা যেতেন।

আহমদ খলিল শুনতে পায়, মসজিদে যোহরের আযান দেয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। একটু পরই আযান শোনা যায়। মসজিদ এলাকায় এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আযান শোনা গেলেও কোন প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। দীর্ঘ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরম তৃপ্তির সাথে নামায আদায় করে সে। শেষ মোনাজাতের পর মসজিদের শীতল মেঝেতে কপাল রেখে সিজদায় পড়ে থাকে। আধঘণ্টা! একঘণ্টা! সে জানেনা কতটা সময় পার করে দিয়েছে। একসময় বাহুতে বারংবার স্পর্শে সে মাথা তোলে। খলিফা তাকে ডাকছে। সে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে। কিছু খেতে চায়।

আহমদ খলিল উঠে গিয়ে মালপত্রের ভিতর থেকে বিরাট এক প্লাস্টিকের বোতল বের করে আনে। পবিত্র জমজম কুপের পানিতে বোতলটি পরিপূর্ণ। মক্কায় থাকতে পানিটুকু সংগ্রহ করেছিল সে। এই পানি বিস্ময়কর গুণের জন্যে বিখ্যাত। আল্লাহর ইচ্ছায় এ পানি খেলে যে কোন রোগ নিরাময় হয়। সে নিজের হাতে সযত্নে বোতলটি খুলে দেয়। খলিফা প্রায় অর্ধেক বোতল পানি খেয়ে ফেলে।

মসজিদে নামাজ আদায়-পিয়াসী হাজীদের ভিড় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সে দিকে আহমদ খলিলের কোন খেয়াল থাকে না। সে হাতে বোনা চমৎকার ইরানী গালিচার উপর বসে একটানা নামাজ পড়ে চলে। একসময় মসজিদের দেয়ালে উৎকীর্ণ স্বর্ণখচিত আল্লাহর শত নাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নামের উপর চোখ পড়ে তার। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে সেদিকে।

মসজিদুন নববীতে সারাটা দিন কেটে যায়। গভীর আগ্রহের সাথে প্রতিটি ওয়াক্তের জামাতে ভক্তিপ্লুত চিত্তে নামাজ আদায় করে সবাই। এ সময়ের মধ্যে কোন ক্ষুধা বা পিপাসা অনুভব করেনি আহমদ খলিল। এশার নামাজের পর মসজিদ ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে আসে। তখন তার সারাদিনের বিশ্রামহীন দেহে ক্লান্তি এসে ভর করে। মসজিদুন নববীর বিশাল আঙ্গিনার এককোণে এসে স্থান নেয় তারা। পোঁটলা-পুটলি খুলে একমুঠো করে খেজুর বের করে খেয়ে নেয়। তারপর খড়ের মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। অবিলম্বে সবার চোখ জুড়ে নেমে আসে নিবিড় প্রশান্তিময় ঘুম।

পরদিন ভোরবেলা শ্বেত শুভ্র পোষাক পরা ঘন কালো রং এর কয়েকজন লোককে দেখতে পায় আহমদ খলিল। পবিত্র মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে নিয়োজিত খাদেম তারা। তার মনে হয়, এই মসজিদের সেবায় সবটুকু সময় কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না। একবুক আশা নিয়ে খাদেমদের সাথে আলাপের জন্যে চেষ্টা করে সে। কিন্তু হতাশ হয়। বহিরাগত লোকের সাথে কথাবার্তা বলায় খাদেমদের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু আহমদ খলিল নাছোড়বান্দা। অবশেষে বিরক্ত খাদেমরা জানায়, মসজিদের ধোয়া-মোছার কাজের জন্যে যথেষ্ট লোক রয়ে গেছে, সুতরাং নতুন কোন লোক নেয়ার প্রয়োজন নেই।

হতাশ আহমদ খলিল সবাইকে নিয়ে মসজিদুন নববী থেকে বেরিয়ে আসে। শহরের মধ্যে মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে সে। শেষ পর্যন্ত পুরনো একটি তিনতলা বাড়ির নীচতলায় একটি ঘর মেলে।

ঘরটি বেশ বড়সড়। তাদের সবার জায়গা হয়েও বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা থেকে যায়। উঁচু ছাদের কিছুটা নীচে আলো-বাতাস চলাচলের জন্যে দু'টো জানালা। খারাপ আবহাওয়ার সময় তা বন্ধের ব্যবস্থা নেই। পানি আনতে হলে কিছুটা দূরে রাস্তায় গিয়ে সরকারী কল থেকে জগ বা কলসী ভরে আনতে হবে। তবে, একটা ব্যাপারে নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে করতে থাকে তারা। উদ্বাস্তু শিবিরে থাকা বহু লোকের সাথে একত্রে

পায়খানা ব্যবহার করতে হয়েছে তাদের। বিশেষতঃ মেয়েদের আব্রু ইজ্জতের সুষ্ঠু ইন্তেজাম সেখানে ছিল না। কিন্তু এ বাসায় নিজেদের জন্যে আলাদা একটি পায়খানা এবং একটি আলাদা রান্নাঘরও পেয়ে যায় তারা।

কাজ খুঁজে পেতে বেশ কিছু দিন দেরী হয়। আহমদ খলিলের সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষপ্রায়। এ সময়ই সে এবং রশিদ দু'জনেই কাজ পেয়ে যায় শহরের উপকণ্ঠে একটি মরুদ্যানে। খেজুর চারার তত্ত্বাবধান এবং তরিতরকারী চাষের কাজ। বেতনের পরিমাণ তাদের জন্যে যথেষ্ট ভালো। ঘর ভাড়া পরিশোধ, শোয়ার জন্যে মাদুর কেনা সহ সংসারের জন্যে প্রয়োজনীয় ময়দা, তরিতরকারী ও অন্যান্য জিনিসপত্র এ টাকায় মোটামুটি ভালোভাবেই হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া আদায় করে আহমদ খলিল।

নতুন বাড়িতে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই আহমদ খলিলের সংসারে নতুন মেহমানের আগমন ঘটে। ছেলে হয়েছে আসমার। শিশুটি ছোট্ট, হালকা-পাতলা, কিন্তু সুগঠিত ও স্বাস্থ্যবান। হযরত ইব্রাহীম. (আঃ) এর প্রিয় পুত্রের অনুসরণে সে নিজ সন্তানের নাম রাখে ইসমাইল।

মদীনায় যে অংশে আহমদ খলিলের বাস সেটি শহরের সবচেয়ে দরিদ্র এবং অনুন্নত অংশ। মূলত এখানে মুহাজিরদের আবাস। এখানকার লোকেরা ইতিমধ্যেই সমগ্র আরবের সবচেয়ে দুঃস্থ মানুষ বলে আখ্যা পেয়েছে। কিন্তু এজন্যে আহমদ খলিলের মনে কোন আফশোস নেই। প্রতিবেশীদের সবাইকে ভালো লাগে তার। দরদী, বন্ধুভাবাপন্ন এবং উপকারী। তার অবসর সময়ের একটি বিরাট অংশ তাদের সাহচর্যে কাটে। কয়েকজন মানুষ একসাথে বসলেই নানা কথা ওঠে। সংসার, পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে সবার মনেই ছায়া ফেলে মাতৃভূমির স্মৃতি। চির পরিচিত আকাশ-বাতাস-মাটি ছেড়ে আজ তারা অবশেষে ঠাঁই পেয়েছে পুণ্যভূমি মদীনা মনোয়ারায়। এটুকুই তাদের সান্ত্বনা।

অন্যান্য দেশের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনা তুর্কিস্তানের লোকদের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে আহমদ খলিল। তার কারণও আছে। এফেন্দীর বাড়িতে থাকাকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং নানা লোকের কাছে শুনে সে জেনেছে যে পৃথিবীর এ দু'টি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রীরা মানুষের জন্যে প্রায় স্বর্গ কায়েম করে ফেলেছে। উদ্বাস্তু শিবিরে তরুণদের মধ্যে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও কার্ল মার্কসকে নিয়ে বহু আলোচনা শুনেছে সে। এটিই নাকি সবচাইতে প্রগতিশীল চিন্তাধারা। এই তরুণদের অনেকেই তাকে বলেছে যে সকল মানুষকে সমান অধিকার দেয়া, শ্রেণীভেদ দূর করা এবং ধনীদের সম্পদ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়াই সাম্যবাদের লক্ষ্য। কম্যুনিস্ট এজেন্টরা বলত, রাশিয়া আরব জনগণের দুঃখ-দারিদ্র দূর করতে এবং

শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তায় সর্বদাই প্রস্তুত। তাছাড়া সে নিজেও মস্কো রেডিওর আরবী ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানে বহুবারই এই প্রচারণা শুনেছে। কিন্তু আহমদ খলিল খুব তাড়াতাড়িই আবিষ্কার করে ফেলে যে কম্যুনিষ্টরা ঘোর ধর্ম বিরোধী, তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না। কম্যুনিজমের প্রবক্তা কার্ল মার্কস স্বয়ং একজন ইহুদী জানার পর সে এর প্রতি আরো বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। মদীনায় স্ট্যালিনের সন্ত্রাসের শিকার রুশ মুসলিমদের সাথে পরিচিত না হলে মুসলিমদের উপর কম্যুনিষ্টদের নৃশংস অত্যাচারের কিছুই সে জানতে পারত না। ফিলিস্তিনিদের মতো রুশ দখলদারেরা তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করেছে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে। সোভিয়েত মুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা তাদের সন্তানদেরকে যেন ইসলামী শিক্ষা না দিতে পারে সে দিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তাদের জন্যে হজ্ব নিষিদ্ধ। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে তারা যাতে আশ্রয় নিতে না পারে সে জন্যে সীমান্ত পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মুসলমান দেশ থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে নিহত হয়েছে নৃশংসভাবে কিংবা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আহমদ খলিলের বাসার উপরের তলাগুলোতে এরকম কয়েকটি পরিবার রয়েছে। এরা সহায় সম্পত্তি, এমনকি কেউ কেউ পরিবারের শেষতম সদস্যকে হারিয়ে সর্বহারা হয়ে আশ্রয় নিয়েছে মদীনার মাটিতে।

১৯.

চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ থেকে আগত মুহাজিরদের মধ্যে যারা আরবীতে কথাবার্তা বলতে পারে, কোন আরবীয়ের চেয়ে তাদেরকেই বেশি আপনজন বলে মনে হয় আহমদ খলিলের। পক্ষান্তরে ধনী সউদীদের প্রতি তার মনে ক্রমশঃই ঘৃণার সঞ্চার হতে থাকে। তার মনে হয়, তেলের অফুরান পয়সায় এরা যত বিত্তশালী হয়ে উঠছে ততই হারিয়ে ফেলছে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি ও সাধারণ মানবিক গুণাবলী। শহরের এই এলাকায় সমগ্র অংশ ঢুঁড়েও সে নিজেকে ছাড়া অন্য কোন আরবীয়ের দেখা পায়নি। এমনকি তার মত সহায়হীন আরেকজন ফিলিস্তিনিকেও সে খুঁজে পায় না। আসলে আহমদ খলিল জানতনা যে সউদী আরবে আগত ফিলিস্তিনিদের সক্ষম সকলকেই আধুনিক বিভিন্ন শহরে কিংবা জাতিসংঘের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের পর দাহরান অথবা কুয়েতের তেল কোম্পানীগুলোতে চাকরির জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। ফলে নেহাত প্রয়োজন না পড়লে তাদের কেউ মক্কা বা মদীনার মত পুরনো শহরে বসবাসের জন্যে আসতে চায় না।

আহমদ খলিলকে প্রতি বছরই মদীনায় থাকার অনুমতি নবায়ন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসে ধর্ণা দিতে হয়। সেখানে নানা শর্ত। মদীনায় অবস্থানকালে সে সরকারের বোঝা হতে পারবেনা অর্থাৎ তার নিজের জীবিকার সংস্থান নিজেকেই করে নিতে হবে, ভিক্ষা করতে পারবে না এবং আইন শৃঙ্খলার জন্যে সে কোন সমস্যা হয়ে উঠবে না। সে নিজে এখন পর্যন্ত সউদী নাগরিকত্ব গ্রহণের ব্যাপারটি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কারণ তার ভয়, এর ফলে সে মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে ফিরে যাবার অধিকার হারিয়ে ফেলবে। একটি ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। সউদী আরব রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হলেও এখানে মিসরের মত স্বৈরাচার বা নির্যাতন নেই। মিসরের মত এখানের রাস্তাঘাটে গুপ্তচর, গোপন পুলিশ কিংবা সাধারণ পুলিশের সন্ত্রাস নেই। এখানে জীবন ও সম্পত্তির পুরো নিরাপত্তা বর্তমান। হত্যা বা চুরি-ডাকাতির কোন ঘটনা সউদী আরবে ঘটে না। তার মনে হয়, এখানেই সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবেচেয়ে কম অপরাধ সংঘটিত হয়। আবদুল আজিজের দেয়া ছুরিটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই তার এখানে হয়নি। সত্যিকার অর্থে, মদীনা শরীফে সে মুক্তির শ্বাস নিতে পারছে। দীর্ঘকাল কয়েদখানায় কাটানোর পর মুক্তি পাওয়া একজন মানুষ বাইরে এসেই যেমন বুক ভরে মুক্ত পৃথিবীর শ্বাস টেনে নেয়--তার অবস্থাটাও অনেকটা সে রকমই। এখানে তার চলাফেরায় কোন বাধা নিষেধ নেই। তার আব্বার পাঠানো কিংবা তার লেখা কোন চিঠি সেন্সর করে দেখা হয় না।

কাজের শেষে মদীনার অপ্রশস্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আহমদ খলিল। তার একদিকে থাকে খলিফা, অন্য দিকে রশিদ। শীতল মৃদুমন্দ হাওয়া তাদের সারাদেহে স্বস্তির পরশ

বুলিয়ে দিয়ে যায়। মদীনার মাটিও অনেকটা মরুভুমির মতই, কিন্তু শহরের যত্রতত্রই ফুলের বাগান ও খেজুর গাছ চোখে পড়ে। মদিনার খেজুর পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা বলে স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু জাতির লোক এখানে ভিড় জমিয়েছে। ফলে আচার-আচরণ, ভাষা, পোশাক-আশাকে বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে এত সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও সব মানুষই কোথায় যেন এক নিবিড় ঐক্যসূত্রে বাঁধা।

মাঝে মাঝেই মালেক ওহাবের কাছে চিঠি লেখার এ সময় এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করে আহমদ খলিল। তবে তার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। খবরের কাগজগুলো আজকাল গাজা ও সিনাইতে ইসরাইলী আগ্রাসন এবং সুয়েজ খালের অদূরবর্তী পোর্ট সাইদে বৃটিশ ও ফরাসীদের বোমা বর্ষণের খবরে ঠাসা থাকে। এর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের চাপে ইসরাইলীরা অধিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সেগুলো গিয়ে পড়েছে মিসরের হাতে। এসময় সংবাদপত্রে একটি খবর পড়ে সে আতংকিত হয়ে ওঠে। মিসরীয় কর্তৃপক্ষ শত্রুপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে যাদের সামরিক আদালতে বিচার করার কথা ঘোষণা করেছে, মালেক ওহাব তাদের একজন। সামরিক আদালতের একমাত্র শাস্তি যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড, সে কথা আহমদ খলিলের অজানা নয়।

সময় গড়াতে থাকে। মনে দুঃশ্চিন্তা নিয়ে মালেক ওহাবের চিঠির অপেক্ষা করতে থাকে আহমদ খলিল।

একদিন রাতে কাজ থেকে ফিরে আসতেই রশিদ তার হাতে মালেক ওহাবের চিঠি তুলে দেয়। হাতের লেখা দেখে সে বোঝে, চিঠিটা তার আব্বাই লিখেছেন। রশিদ চিঠিটা খোলে। কেরোসিনের বাতির খুব কাছাকাছি নিয়ে সেটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করে সে।

ঃ চিঠিটা পুড়ে যাবে যে! চেঁচিয়ে ওঠে আহমদ খলিল। ওটা আমাকে দাও।

রশিদ চিঠিটা দিয়ে দেয় তাকে। তবে জোরে পড়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। ধীরে ধীরে এবং উচ্চ কণ্ঠে চিঠি পড়তে থাকে আহমদ খলিল।

আল্লাহ পাকের দয়া ও রহমতে সামরিক আদালতে বিচারের সময় আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হই। ফলে খুব তাড়াতাড়িই মুক্তি পেয়েছি। এখন আমি আমার স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে আবার স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেছি। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই--এই স্কুলটিই এখন আমার জীবনের সব কিছু।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো, শিক্ষকতা করা ছাড়া আমার জীবনে এখন আর কোন প্রত্যাশা নেই।

আমি ক্লাসে ছাত্রদের গণিত, বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ইংরেজী এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেই। আমি কখনোই চাইনা যে আমার ছাত্ররা শুধু মাত্র মুখস্থ করুক এবং তা আবৃত্তি করুক। আমি চাই, তারা যেন মূল বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আমি তাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে চাই, আমি

চাই তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করুক। তারা নিজেদের গড়ে তুলুক সত্যকার মানুষ হিসাবে– এটাই আমি কামনা করি।

কিন্তু প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছনো খুবই কঠিন। স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব। আমি সকালে এবং বিকেলে একশোরও বেশী ছেলেকে পড়াই। তাদের শরীরে উপযুক্ত পোশাক নেই। ক্লাসে বসারও নেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। তদুপরি রয়েছে বই-পত্রের অভাব। অনেকের বইয়ের বেশ কিছু পাতাও নেই। প্রয়োজনীয় খাবারও তারা পায় না বলে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ায় তাদের মন বসে না। ফলে, তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি হতাশাগ্রস্ত।

কোন শিক্ষকই ভালো ছাত্রের জন্যে আগ্রহী নয়। আমার মনে হয়, এখানে যারা লেখাপড়া করছে তারা উদ্বাস্তু শিবির থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তা করছে। আমি একজন ছাত্রকে জানি যে একটি বৃত্তি পেয়েছে এবং এখন বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আমি যখনই এসব কথা ভাবি তখনই বিভিন্ন বাধা এসে আমার সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আমি আরো বেশি কাজ করতে চাই, দেখতে চাই যে ছেলেরা দিন দিন আরো উন্নতি করছে ...।”

ঃ একটু থামো। খলিফা ঘুমিয়েছে কিনা দেখে আসি। চিঠি পড়ার মাঝখানে বাধা দেয় রশিদ। আহমদ খলিল বিরক্ত হয়ে বলে– চিঠিটা পড়তে দাও আগে। এতে তোমার আব্বার কথাও লেখা আছে—

“ইহুদীরা গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার পরপরই হালিমা যক্ষা রোগে মারা গিয়েছে। দীর্ঘ দিন থেকেই সে অসুখে কষ্ট পাচ্ছিল। মনসুর এখন আমার সাথেই রয়েছে। তবে তার কোন কাজ নেই। রেশন কার্ডটাই তার একমাত্র সম্বল। আমি তাকে যতটুকু পারি সাহায্য করছি।”

তেল ফুরিয়ে আসায় কেরোসিন আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে এসেছে। আবছা আঁধারে চিঠিটা পড়ে শেষ করে সে ঃ

“তোমার ছেলে হয়েছে জেনে আমি যারপর নাই খুশি হয়েছি। আশা করি, বাচ্চাটি স্বাস্থ্যবান হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে তার দীর্ঘায়ু ও সুখী জীবনের জন্যে দোয়া করছি। তবে আমার বড় আফসোস যে কখনোই আমি ইসমাইল কিংবা আমার অন্য কোন নাতি-নাতনীকে দেখতে পাবো না। তবে আমার দোয়া ও স্নেহ সব সময় তাদের জন্যে থাকবে ।”

সপ্তাহ খানেক পর মালেক ওহাবের চিঠির উত্তর লিখতে বসে আহমদ খলিল। চিঠি লিখতে খুব কষ্ট হয় তার। একটি মাত্র পৃষ্ঠা লিখতেই একঘণ্টার বেশী সময় লেগে যায়। তার হাতের লেখা সাত বছরের একটি বালকের লেখার চেয়ে কোন অংশেই ভালো নয়। কাটাকুটি, শ্রীহীন অক্ষর এবং ভুল বানানে ভরা চিঠিটা দেখে নিজেই লজ্জা পায়। মনে মনে কামনা করে তার আব্বা যেন চিঠিটা আর কাউকে না দেখান। নিজেদের সব খবরই আব্বাকে জানায় সে। হজ্ব করতে আসার পথে খলিফার আলৌকিকভাবে রোগমুক্তি, অবস্থার ক্রমঃ উন্নতি, তার ও রশিদের মরুদ্যানে কাজ করার কথাও লেখে সে।

ভাইকে চিঠি লিখতে দেখে খলিফাও একটি চিঠি লেখার অনুমতি চায়। বিকেল পর্যন্ত সময় লেগে যায় তার।

আহমদ খলিল খলিফার চিঠি পড়ে না। তার মনে হয়, ছোট ভাইয়ের চিঠি তার দেখা উচিত নয়। তবে খলিফার চিঠি লেখার সময় মাঝে মাঝেই সে তাকিয়ে দেখেছে। অপরিসীম আস্থা এবং মনোযোগের সাথে মুক্তোর মতো আশ্চর্য সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে চলেছে খলিফা। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই চিঠিটা পেয়ে তার আব্বা অত্যন্ত খুশি হবেন, এমনকি স্কুলের শিক্ষকদেরও গর্বের সাথে চিঠিটা দেখাবেন তিনি। যাহোক, দু'জনের চিঠি খামে ভরে আঠা লাগিয়ে পোস্ট অফিসে ছেড়ে আসে সে।

এক মাস পর মালেক ওহাবের চিঠি আসে। স্কুলের খবরাখবর সহ মনসুরের শরীরের উন্নতির কথা লিখেছেন তিনি। কিন্তু শেষের দিকে এসে আহমদ খলিলের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। মালেক ওহাব লিখেছেন--

"খলিফার চিঠি আমার জন্যে অপরিসীম দুঃখ ও ব্যথা বয়ে এনেছে। তুমি হয়ত চিঠিটা পড়নি।

খলিফা অসুস্থ একটি কিশোর, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। সউদী আরব ধনী দেশ, সে কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা খুব একটা অসুবিধা হবে না।... তার অবস্থা জটিল এবং সে এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাকে এখন মানুষ বলে গণ্য করাই মুশকিল। আমার কাছে সে এখন মৃত। তোমার কাছে অনুরোধ, আমার কাছে লেখা চিঠিতে কখনোই আর তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করো না ।"

প্রায় সাথে সাথেই মালেক ওহাবের চিঠির উত্তর লিখতে বসে আহমদ খলিল। খলিফার ব্যাপারে চিন্তিত না হওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ জানায় সে। পরে তার আব্বার চিঠিটা নিয়ে ঘরের এমন এক জায়গায় রাখে যাতে সহজে অন্য কারো চোখে না পড়ে।

২০.

বিকেলে কাজ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে আহমদ খলিল। ঘরের মাঝখানে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে খলিফা। যে বাক্সের মধ্যে মালেক ওহাবের চিঠি রাখা ছিল তা খোলা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। সারা ঘরময় ছিটিয়ে আছে কাগজ পত্র। শুধু মালেক ওহাবের চিঠি হাতে ধরে রেখেছে খলিফা।

আহমদ খলিলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেও খলিফার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। চিঠিটা খলিফার হাতে এল কি করে বা সে খুঁজে পেল কিভাবে, আহমদ খলিল ভেবে পায় না। খলিফার মুখের ভাব দেখে কোনই সন্দেহ থাকে না যে চিঠিটা সে ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে। আস্তে করে তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয় সে। খলিফা কোন প্রতিবাদ করে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরে আহমদ খলিল। দরদ ভরা গলায় বলে ঃ 'আব্বা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। আমাদের ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। আমি এবং রশিদই শুধু এখানে আছি। সুতরাং মন খারাপ কর না। তোমার কোন রকম ক্ষতি আমরা হতে দেবনা ...।"

খলিফার মন থেকে ব্যাপারটি মুছে ফেলার জন্যে আহমদ খলিল নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। প্রত্যেকদিন কাজ থেকে ফিরে তাকে নিয়ে লাইব্রেরীতে যেতে শুরু করে।

শেখ হাগমুদ লাইব্রেরীটি মদীনার এক সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত। গলিটি এতই সংকীর্ণ যে পাশাপাশি দুজন লোক হেঁটে যাওয়াও দুষ্কর। শতাধিক বছর আগে তুরস্কের এক সুলতান লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেন। বই-এর সংখ্যা ঈর্ষা করার মত। দেয়াল ঘেঁষে সারি ধরে সাজানো আলমারিগুলোতে ধর্ম, আইন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং সাহিত্য বিষয়ক অসংখ্য বই। কয়েকটি আলমারিতে দুর্লভ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। পাঠকের ভিড়ে লাইব্রেরীটি পরিপূর্ণ। অথচ আশ্চর্য এক প্রশান্তি ও নীরবতা সেখানে বিরাজ করছে। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, এই লাইব্রেরীতে বিদেশী বই নেই বললেই চলে। শুধু আরব বিশ্ব থেকে প্রকাশিত বইগুলো দিয়েই লাইব্রেরীটিকে সমৃদ্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে বলে আহমদ খলিল লক্ষ্য করে।

প্রতিদিন দু'ভাইয়ের অনেকখানি সময় কেটে যায় এই লাইব্রেরীতে। তবে অসুবিধে হলো, লেখাপড়া খুব বেশী না জানার কারণে বহু বই আহমদ খলিল বুঝে উঠতে পারে না। একটি বই তার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেটি হলো প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবন খালদুনের 'আল মুকাদ্দমা'। তিউনিসিয়ার এই সুসন্তান ছয়শো বছরেরও বেশি সময় আগে ইন্তেকাল করেছেন। হাতে লেখা কপি। লাইব্রেরীয়ান

জানান, মুদ্রণ সুবিধা সহজলভ্য হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একজন অজ্ঞাতানামা তুর্কী পণ্ডিত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বইটি কপি করেন। এই হস্তাক্ষর সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। বইটি যাতে আহমদ খলিলের পক্ষে বোঝা সহজ হয় সে জন্যে ইবন খালদুনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তিনি তার সামনে তুলে ধরেন ঃ

"ইবন খালদুনের জন্ম তিউনিসে। তাঁর পুরো নাম আবু জায়েদ আবদুর রহমান ইবন খালদুন। ইসলামী বিজয়াভিযানের গোড়ার দিকে তাদের পরিবার দক্ষিণ আরবের হাদ্রামাউত থেকে প্রথমে তিউনিসিয়া এবং পরে স্পেনে গমন করে। পরবর্তী চারশো বছর ধরে খালদুনের পূর্ব পুরুষরা বসবাস করেন সেভিলে। বরাবরই পরিবারটি মুসলিম শাসন ক্ষমতার সাথে জড়িত ছিল।

স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনকালে প্রায় সকল মুসলমান বিতাড়িত হয়। তাদের সবাই জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে আফ্রিকার দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়। রাজা তৃতীয় ফার্ডিনান্ড সেভিল অধিকার করার পূর্ব মুহূর্তে খালদুন পরিবার তিউনিসিয়ায় হিজরত করে।

স্পেন থেকে আগত মুহাজিররা শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে উত্তর আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। সে কারণে খালদুনের পিতামহ তিউনিসের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন! তার আব্বাও তিউনিসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চাকুরি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান চর্চা ও লেখাপড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইবন খালদুন শৈশবেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। কুরআনে হাফেজ হওয়ার পর তিনি আরবী ব্যাকরণ, কবিতা এবং আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। বিশ বছর বয়সে মরক্কোতে ফেজ এর সুলতানের সচিব পদে চাকুরি গ্রহণের মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা হয়।

কয়েক বছর পর ইবন খালদুন স্পেনে ফিরে গিয়ে গ্রানাডার সুলতানের অধীনে চাকুরি নেন। তাঁকে ক্যাস্টিলের শাসনকর্তা পেদ্রো দি কুয়েলের কাছে দূত করে পাঠানো হয়। সেভিলে পূর্ব পুরুষদের স্মরণীয় কীর্তিসমূহের হতশ্রী দশা দেখে তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসে। খৃস্টান রাজা খালদুনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। তার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলে খালদুনের পূর্ব পুরুষদের সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। ইবন খালুদন এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন– "আমি সব সময়ই আমার পূর্ব পুরুষ, তাদের ঐতিহ্য, আমার জনসাধারণ এবং আমার ধর্মের প্রতি অনুগত থাকবো। আমার নিজেরতো খৃষ্টান হওয়ার প্রশ্নই আসেনা, এমনকি আমার সন্তান কিংবা তাদের সন্তানরাও যেন কোনদিন খৃষ্টান হয়ে বেড়ে না ওঠে।"

এরপর তিনি পরিবার-পরিজনসহ উত্তর আফ্রিকায় ফিরে আসেন। তিউনিসিয়ার নিভৃত জীবনে ৪টি বছর তিনি মুকাদ্দিমা, বিশ্ব ইতিহাস লেখা এবং একই সাথে তিউনিসের জাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে বক্তৃতা দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

এরপর ইবন খালদুন মক্কায় হজ্ব পালন করতে মনস্থ করেন। এসময়ই তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সপরিবারে জাহাজযোগে তিউনিস থেকে মিসরে আসছিলেন তিনি। পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ডুবি ঘটে। আরো অনেকের সাথে তাঁর পরিবারের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা তাঁর জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াত সহ ধর্মচর্চার মাধ্যমে তিনি এই নিদারুণ আঘাত কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস পান। এরপর তিন বছর যাবত তিনি মিসরে মালেকী মযহাব অনুযায়ী পরিচালিত আদালতের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি পূর্বের বাধা পাওয়া হজ্ব সম্পন্ন করেন। মক্কা থেকে তিনি আবার মিসরের পথে রওনা হন।

কিন্তু ভাগ্য আবারও খালদুনকে বির্পয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা। মিসর ফেরার পথে খালদুন কিছুদিন দামেশ্‌কে অবস্থান করেন। এ সময় বর্বর মোঙ্গলরা দামেশ্‌ক অবরোধ করে। শহর এবং লোকজনের জান-মাল রক্ষার উদ্দেশ্যে নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দড়িতে বেঁধে তৈমুর লং এর সাথে আলোচনা চালাবার জন্যে শহরের দেয়ালের নীচে নামিয়ে দেয়া হয়। খালদুন ছিলেন সেই হতভাগ্যদেরই একজন। পরাক্রান্ত তৈমুর লং এই দলে খালদুনকে দেখে বিস্মিত হন। তিনি আরো বিস্মিত হলেন যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে খালদুন তার বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ থেকে তৈমুরলং এর বর্বরোচিত অভিযানের অংশ পাঠ করে কোন ভুল আছে কিনা তা জানতে চাইলেন তার কাছে। খালদুনের দুঃসাহসের তারিফ করে তৈমুর তাকে তার অধীনে চাকুরি দিতে চাইলে খালদুন তা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। মোঙ্গলরা দামেশ্‌কে নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। তবে খালদুনের অনুরোধে বহু লোক প্রাণে রক্ষা পায়। মিসর প্রত্যাবর্তনের পর খালদুনকে পুনরায় মালিকী মাযহাবী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের অধীনে চাকুরি করার কারণে আধুনিককালের কিছু সমালোচক তার মধ্যে দেশপ্রেম না থাকার অভিযোগ তোলেন। কিন্তু পাঠকের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দেশপ্রেমের যে সংজ্ঞা ইউরোপ দিয়েছে, ইসলামে তা অপরিচিত। মুসলিম সভ্যতা যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত–সেই সমস্ত ভূখণ্ডই ছিল ইবন খালদুনের পিতৃভূমি। রাজ্য বা সীমানার বিভাজনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

সুদীর্ঘ জীবনে ইবনে খালদুন পশ্চিমে পেদ্রো দি কুয়েল এবং পূর্ব দিকে তৈমুর লং-এর মতো অনেক নিষ্ঠুর ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছেন। কখনো তাঁর ভাগ্য তাকে রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা করেছে, কখনো তার আশ্রয় হয়েছে কুঁড়ে ঘরে। তিনি যেমন নৃশংস ব্যক্তিদের সাহচর্য পেয়েছেন তেমনি প্রধান বিচারপতির পদও অলংকৃত করেছিলেন। মূর্খদের সাথেও যেমন তার জীবনের বিরাট একটা অংশ কেটেছে তেমনি

পন্ডিতদের সান্নিধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েও তার জীবনের বড় একটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে। অতীতের গৌরবময় ভূমিতেও তিনি পদচারণা করেছেন, অন্যদিকে বর্তমানের জীর্ণদশাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার জীবনে যেমন এসেছে দুঃখ এবং শোক, তেমনি পেয়েছেন অফুরান আনন্দের পরশ। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আত্মোপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে জীবনের বৃহত্তর অর্থ উপলব্ধির প্রজ্ঞা অর্জনে তাঁকে সাহায্য করেছিল।"

লাইব্রেরীয়ানের সাহায্যে মুকাদ্দিমার ৩টি খন্ড পাঠ করে এর অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করে আহমদ খলিল। হঠাৎ করেই একটি পরিচ্ছেদ-এর শিরোনাম তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়–

বিজিত কর্তৃক বিজয়ীর অনুকৃতি ঃ

বিজিতরা চিরকালই তাদের বিজয়ীর অনুকরণ করে থাকে। পোশাক, চালচলন, জীবন যাত্রা, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই অনুকৃতি ঘটে। বিজয়ীরা সব সময়ই তাদের বিজিতদের উপর নিজেদের সবকিছু চাপিয়ে দেয়। বিজিতরাও বিজয়ীর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে কিংবা অন্যবিধ কারণে তা গ্রহণ করে থাকে। এ ব্যাপারটি দীর্ঘস্থায়ী হলে বিজিতের মধ্যে বিজয়ীর হুবহু অনুকৃতি সাধিত হয়। তবে এক্ষেত্রে অন্ধ অনুকৃতিও ঘটে থাকে। তা হয় অসচেতন হওয়া কিংবা ভুলের কারণে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বিজিতরা মনে করে যে তাদের বিজয়ীরা শুধুমাত্র শক্তি–বলের কারণেই তাদের জয় করেনি, উপরন্তু জীবনযাত্রা, ধর্ম বিশ্বাস ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার দরুণই তা ঘটেছে। এক্ষেত্রে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে বিজিতের সার্বিক অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের পরাজয়ের কারণগুলো বিদূরিত হবে। এ কারণেই পৃথিবীর সকল বিজিতকেই তাদের শাসনকারীদের সার্বিক অনুকরণে নিয়োজিত হতে দেখা যায়। আবার এটাও দেখা যায় যে, পরাক্রমশালী প্রতিবেশীকে শক্তিহীন জনগোষ্ঠী অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন স্পেনের বিজিত মুসলিমরা। বর্তমানে স্পেনের সংখ্যালঘু মুসলিমরা পোশাক আশাক, চাল চলনে খৃস্টানদের হুবহু অনুসরণ করছে। এ ক্ষেত্রে যে কোন সতর্ক ব্যক্তির চোখেই অনুকরণকারীর দুর্বলতা ও হীনমন্যতার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

ছয়শো বছর আগে লেখা এই গ্রন্থ থেকে আহমদ খলিল তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের জবাব পেয়ে পায়। তার মনে হয়, এ জবাবটি শুধু তার একার নয়, তাদের জনগোষ্ঠী এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র মুসলিম সমাজের জীবন মরণের প্রশ্নের চেয়ে তা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদ্বাস্তু শিবির থেকে তার আব্বা বা বন্ধুদের এখানে আনার কথা চিন্তাও করতে পারে না সে। তার ইচ্ছে করে তার এই উপলব্ধ সত্যকে তাদের সামনে জোরে পাঠ করতে, কণ্ঠের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে পূর্ব থেকে পশ্চিমের সকলকে জানিয়ে দিতে–এ আশায় যে, যদি একজন লোকও তার কথা শোনে এবং চিরতরে সবকিছু হারাবার বা খুব বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই সতর্ক হয়।

পড়াশোনা শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই লাইব্রেরীর দু'জন সহকারী আহমদ খলিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে একটা বাড়তি সুবিধাও লাভ করেছে সে। আগের কাজ ছেড়ে দিয়ে লাইব্রেরীর সবচেয়ে কাছের মসজিদটার বাগানে কাজ নিয়েছে। ফুলগাছ ও খেজুর গাছের পরিচর্যার কাজ।

ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে ওঠে। পরস্পরের ব্যক্তিগত অনেক বিষয়ই পরস্পরের জানা হয়ে যায়। এদের একজন আবদুর রহমান। দিল্লীর লোক সে। হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। নীচু জাতের একটি মেয়েকে বিয়ে করায় তার বাবা-মা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের এই বাড়াবাড়ি এবং ধর্মের সংকীর্ণতাই আবদুর রহমানকে স্বধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অন্যজন ইনামুল্লাহ্ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার অধিবাসী। কৈশোরে এদেশে আসে বাপ-মার সাথে। বয়স হয়ে গিয়েছিল তাদের। চিরনিদ্রার স্থানটুকু যেন এদেশের মাটিতেই হয়–এটাই তারা চেয়েছিলেন। তাদের সে আশা পূর্ণ হয়েছে। মাতৃভূমির কথা তেমন একটা মনে পড়ে না ইনামুল্লাহ্র। আসলে এদেশটাকেই নিজের দেশ বলে মনে হয় তার। লাইব্রেরী সহকারী হিসেবে সে যে বেতন পায় তা রশিদ এমন কি খলিফার বেতনের চেয়েও কম। তবু তার মনে কোন আফশোস নেই।

২১.

একদিন কাজ শেষে ঘরে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আহমদ খলিল। এমন সময় লাইব্রেরীয়ানকে তার বাগানে দেখে অবাক হয় সে। ধুসর দাড়ি শোভিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ। আহমদ খলিলের কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন ঃ

ঃ বেটা, তোমার ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে একটা কথা বলার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। তার হাতের লেখা এবং আঁকা রেখাচিত্রগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছে যে সে একজন জাত শিল্পী। এরকম আর কাউকেই দেখিনি। এখন, তুমি যদি রাজি হও তবে তাকে আমি ক্যালিগ্রাফি এবং নকশা আঁকার কাজ শেখাব। তবে তুমি চিন্তা করনা, বাগানে তুমি যা পাচ্ছ, কাজ শেখার সময়ে তার চেয়ে বেশিই আমি তাকে দেব।

বার বছরের বালক খলিফা হাঁটুর উপর আড়াআড়ি পা তুলে ঘরের এক কোণে বসে। মেঝেতে চমৎকার কারুকাজ করা একটা গালিচা পাতা। একমনে বই পড়া শুনছে সে। লাইব্রেরীয়ান এসে হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসেন। শিরা ওঠা একটা হাত রাখেন তার কাঁধে। আর তখনই অপূর্ব সুন্দর এক উজ্জ্বল হাসিতে ভরে ওঠে খলিফার মুখ। বহুদিন পর এই প্রথম হাসল সে।

সন্ধ্যার পর রশিদ এবং আহমদ খলিল ঘরে বসেছিল। অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল আহমদ খলিলের। আতংক, দুশ্চিন্তা এবং কি কষ্টে ভরা ছিল সে জীবন। মানুষের স্বাধীনতা যে কি জিনিস তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তারা। সেদিনের তুলনায় আজকের জীবন যাপন তার কাছে একটা স্বপ্নের মত মনে হয়। কোন ভয় নেই, অত্যাচার নেই, নেই বন্দীত্ব। প্রাচুর্য নেই, কিন্তু শান্তি ও তৃপ্তি আছে এ জীবনে। মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে সে।

হঠাৎ মেঝেতে শোয়ানো শিশু ইসমাইলের কান্নার শব্দে আহমদ খলিলের তন্ময়তা কেটে যায়। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে থাকে সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে শিশুটি।

ঃ এটা ঠিক হচ্ছে না--হঠাৎ করে কথা বলে ওঠে রশিদ।

ঃ চুপ! ছেলেটা জেগে উঠবে আবার। রশিদের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলে আহমদ খলিল।

ঃ আমার কিছু নেই অথচ তোমার সবই থাকবে-এটা হতে পারে না। রশিদের কণ্ঠস্বরে চাপা ক্রোধ।

অবাক হয়ে রশিদের দিকে তাকায় আহমদ খলিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। বলে-

ঃ তোমার এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে নাকি?

ঃ অবশ্যই, তোমার সবকিছুই আছে–স্ত্রী, একটি সন্তান এবং আরেকটির পিতা হতে যাচ্ছ তুমি। সুতরাং তুমি এবং আমি এক নই। আচ্ছা বলত দেখি; কেউ যদি তার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে না চায় তখন কেমন লাগবে তোমার? আসলে তুমি কোন কিছু বুঝতে চাওনা । কথা থামিয়ে আহমদ খলিলের দিকে তাকায় রশিদ। সে দৃষ্টিতে প্রচন্ড রাগ এবং হিংসার ছাপ সুস্পষ্ট। তারপর দু'হাঁটুর মধ্যে মাথাটা রেখে স্বগতোক্তির মত বলে চলে সে ঃ আমরা একদনি রাতের বেলা ইহুদীদের পাকা ফসল চুরি করে আনার জন্যে সীমান্ত পেরিয়ে নাহল মিদবারে গিয়েছিলাম। টের পেয়ে গিয়েছিল সৈন্যরা। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতো মেশিনগানের গুলি ছুঁড়েছিল তারা। ওহ্-কেন যে আমি সে দিন মারা গেলাম না!

ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যাতে তুমি আরো ধৈর্য ধর ।

তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে রশিদের গলায়–

ঃ তোমার পক্ষে এভাবে বলাটা খুবই সহজ। তুমি কি ভাবছ বল তো দেখি? তুমি কি চাও যে এভাবেই আমি জীবন কাটাই? ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্রের কোন প্রয়োজন নেই আমার, তাই না?

আহমদ খলিল এগিয়ে যায় রশিদের কাছে। তার একটা হাত রশিদের কাঁধ স্পর্শ করতে যেতেই লাফিয়ে সরে যায় সে। তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে ঃ সরে যাও আমার কাছ থেকে। আমাকে স্পর্শ কর না তুমি।

দিনে দিনে রশিদের মেজাজ ক্রমশইঃ উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যেই সবার সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিয়েছে সে। খাবারের সময় নিজের অংশটুকু খায় ঠিকই, কিন্তু তার পেটে ক্ষুধা বলে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না। দিনের অর্ধেক সময়ই সে তার বিছানায় শুয়ে কাটায়। তার নিস্পন্দ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ছাদের দিকে। সকাল বেলায় আহমদ খলিল ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, তবু সে ফেরেনা।

একদিন কাজ থেকে ফিরে আহমদ খলিল রশিদের কথা জিজ্ঞেস করে জানলো যে, সেই ভোরবেলা বেরিয়ে এখনো সে ফেরেনি। একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে আহমদ খলিল। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা খলিফাকে সাথে নিয়ে রশিদের খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়ে। মদীনার শান্ত, জনহীন রাস্তা ও গলিগুলোতে রশিদকে খুঁজতে থাকে তারা। এই গলিপথগুলো এতোই সংকীর্ণ যে দু'পাশের বাড়িগুলোর ঝুল ছাদগুলো দু'পাশ থেকে পরস্পরের সাথে লেগে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আঁধার নেমে এসেছে। জোৎস্নার আলোয় ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে তারা।

হঠাৎ করে খলিফা তার হাত টেনে ধরতেই চমকে ওঠে আহমদ খলিল।

ঃ ওই যে, ওই বাড়ির গেটের পাশে রশিদকে দেখেছি আমি। উত্তেজিত গলায় বলে সে।

ঃ শ-শ্। আস্তে। আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে রশিদ। চুপ করে এগিয়ে যাই চল।

সন্তর্পণে এগিয়ে যায় দু'জন। সেই বাড়িটার দরজার কাছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে তারা। চাঁদের আলোয় রশিদকে দেখা যাচ্ছে। লোহার গেটের ওপর থুতনি রেখে কারো সাথে কথা বলছে সে। উল্টো দিকে একটি ছায়া মূর্তি চোখে পড়ে। একটি কোমল, মিষ্টি কণ্ঠস্বর কানে আসে।

ঃ মেয়ে লোক— ফিস ফিস করে বলে খলিফা।

ঃ চুপ–নীচু গলায় ধমকে ওঠে আহমদ খলিল।

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে দু'জন। এক সময় মেয়েটির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ কানে আসে।

ঃ মেয়েটি কাঁদছে কেন? প্রশ্ন করে খলিফা।

উত্তর দেয়না আহমদ খলিল। ভাই-এর হাতটি জোরে চেপে ধরে। মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

রশিদ রাস্তায় নেমে আসে। হাঁটা শুরু করতেই তাদের দেখতে পায়। চমকে উঠেই পালিয়ে যাবার জন্য দৌড় দেয় সে।

আহমদ খলিল প্রস্তুত ছিল। একলাফে এগিয়ে গিয়ে রশিদের জামার প্রান্ত ধরে ফেলে সে। বলে—

ঃ পালাচ্ছ কেন? আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

রশিদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। বলে—

ঃ কি করতে পারবে তুমি? মেয়েটি এতিম এবং একা। আব্বা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে এই বাড়িতে চাকরানীর কাজ করছে সে। আজ সে অসুস্থ ছিল। কাজের সময় তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটি দামী প্লেট ভেঙেছে বলে মালিক তাকে মারধোর করেছে এবং এখান থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। সে যে অন্য কোথাও যাবে– সে জায়গা তার নেই ...।

আহমদ খলিল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রশিদের দিকে তাকায়। বলে—

ঃ মেয়েটির কথা যে আসলেই সত্য তা কি তুমি বলতে পার?

রশিদ এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

এরপরে বেশ কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। রশিদের মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিল যে, আহমদ খলিল হয়ত মেয়েটার কোন ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। প্রাণের অস্তিত্ব যেন তার মধ্য থেকে বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

জুমার নামাজ আদায় করে ঘরে ফেরে রশিদ।

আবদুর রহমান এসে হাত ধরলেন তার।

ঃ চল!

রশিদ অবাক হয়।

তবে কথা মত চলতে শুরু করে।

তাদের একটু পিছনে আসছে আহমদ খলিল ও ইনামুল্লাহ্। মসজিদের লাগোয়া একটি ঘরে এসে পৌছে সবাই। মেঝেতে কালো এবং ঘন নীল রং-এর কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা স্তূপ। কাপড়ের আবরণের ফাঁকে একটুখানি বেরিয়ে থাকা পা না দেখতে পেলে স্তূপটা যে কোন মানুষের তা বোঝা মুশকিল হত। আহমদ খলিল এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে মাথার দিকে বোরখার প্রান্তটা উঁচু করে ধরে। রশিদ এই প্রথমবারের মতো স্পষ্ট দিবালোকে মেয়েটির মুখ প্রথমবারের মত দেখতে পায়। চোখ তুলে তার দিকে তাকায় মেয়েটি। তার দৃষ্টিতে ভয়ের ছাপ।

রশিদের কাঁধে হাত রাখেন আবদুর রহমান—

ঃ আহমদ খলিল আপনার এবং এই মেয়েটি সম্পর্কে আমাদেরকে সবই বলেছে। সে জন্যেই তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। তাছাড়া, আপনি অর কতদিন একা থাকবেন...।

সেদিনই বিয়ে হয়ে যায় তাদের। রশিদের হাত ধরে মায়মুনা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতেই তাকে বুকে টেনে নেয় আসমা। সবার মনের এতদিনের অস্বস্তির ভাবটা কেটে যায়। সারা বাড়িতে একটা অনাবিল আনন্দের স্রোত বইতে শুরু করে।

২২.

খলিফার ব্যাপারে আহমদ খলিল ও রশিদ খুব হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ বয়স বাড়লেও দেহ ও মনের দিক থেকে আসলে সে একটি শিশুর মতই রয়ে গেছে। এজন্যে খলিফার ভাগ্যকে দোষ দেয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন ব্যাপারটা একেবারে নতুন দিকে মোড় নেয়। মাত্র কিছুদিন আগে সতেরো বছরে পড়েছে সে। কয়েক মাসের মধ্যেই হালকা পাতলা অপূর্ণ দেহের খলিফা মনের দিক থেকে পরিণত হয় এক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে।

গত পাঁচ বছর ধরে বৃদ্ধ লাইব্রেরীয়ানের তত্ত্বাবধানে খলিফা ক্যালিগ্রাফির কাজে তার বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কালো, গোলাপী লাল, আকাশ-নীল, রুপালি এবং সোনালি রং ব্যবহার করে বহু রকম ডিজাইন তৈরীতে সে চমৎকার দক্ষতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে মদীনাতে তার সমকক্ষ কেউ নেই। তাছাড়া শুধু রং এর ব্যবহারই নয়, বিভিন্ন কাপড়ের উপর নির্ভুলভাবে সুন্দর এমব্রয়ডারির কাজও শিখেছে সে। খলিফা এ শিল্পটিকে খুবই পবিত্র মনে করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আয়াত ও বাণীগুলো লেখার সময় তার হৃদয় যেন এক অলৌকিক অনুভূতিতে ভরে ওঠে।

অবশ্য একথা ঠিক, ক্যালিগ্রাফি শিল্পে সে নিজস্ব কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। সে জানে, এ শিল্প কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, বরং এ হল মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ কালের উত্তরাধিকার। যুগ হতে যুগে, কাল হতে কালে, একজন থেকে আরেকজন, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের মধ্য দিয়ে এ শিল্পের ধারা গতিশীল, প্রবহমান। আর সে কারণেই খলিফা এ শিল্পে তার পূর্বসুরীদের রীতিই অনুসরণ করে চলেছে, নিজস্ব প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সে দিতে পারেনি।

তবু সন্দেহ নেই, খলিফা ক্যালিগ্রাফিতে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। ইতিমধ্যে এর স্বীকৃতিও সে পেয়েছে। মক্কা এবং মদীনার বড় বড় মসজিদে তো বটেই, অনেকের বাড়ির দেয়ালেও তার কাজ শোভা পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের মাধ্যমে সারা সৌদি আরব ও আশপাশের দেশগুলোতেও তার শিল্পকর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু খলিফা এ পর্যন্ত তার কোন শিল্প কর্মেই রেওয়াজ অনুযায়ী স্বাক্ষর দেয়নি, দিতে চায়নি। ফলে মদীনার বাইরে কেউই জানেনা এই চমৎকার সুন্দর ক্যালিগ্রাফিগুলোর স্রষ্টাকে।

মদীনাতেও হাতে গোনা কয়েকজনমাত্র খলিফাকে চিনে ফেলে। শিল্প-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ লোকেরা খলিফার পরিচয় জানার পর তাকে দেখার জন্য ছুটে আসে এবং গভীর বিস্ময়ে তারা যেন একটা ধাক্কা খায়। এ কে? এই কিশোর কি শিল্পী ? তাদের মনে প্রশ্ন জাগে। কেউ কেউ লাইব্রেরিয়ানকে বলে ঃ ছেলেটি পাগল নয়তো? এইটুকু ছেলের পক্ষে এত চমৎকার সৃষ্টি কি করে সম্ভব? তিনি প্রাণপণে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, যে সেগুলো খলিফারই সৃষ্টি, অন্য কারও নয়। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে বলে মনে

হয় না। কেউ কেউ খলিফার প্রতি সহানুভূতিও দেখায়। কোন কোন সময় লাইব্রেরিয়ান না থাকলে তারা খলিফার কাছে তার ক্যালিগ্রাফিগুলো কিনতে চায়। খলিফার ইচ্ছানুযায়ী দাম দিতেও তারা রাজী বলে জানায়। কিন্তু খলিফা তাদের সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। বলে, তার ওস্তাদ অর্থাৎ লাইব্রেরিয়ানের অনুমতি ছাড়া কোন টাকা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পবিত্র কাবার গিলাফ সজ্জিত করার জন্যে খলিফার ক্যালিগ্রাফি এবং ডিজাইন মনোনীত হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে মিসরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এ সৌভাগ্য অর্জন করে এসেছেন। হজ্বের আগে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিসর থেকে কাবা শরীফের জন্যে গিলাফ এসে পৌঁছুত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নাসেরের ক্ষমতারোহণের পর তার বিভিন্ন কার্যকলাপে সৌদী আরব ও মিসরের মধ্যে সম্পর্ক টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এখন তা এতই খারাপ হয়ে উঠেছে, যে, দু'দেশ আর কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। বাদশাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে কাবা শরীফ ঢাকার জন্যে মিসরের গিলাফ আর গ্রহণ করা হবে না। এখন থেকে সৌদী আরবই গিলাফ তৈরীসহ অন্যান্য সজ্জার দায়িত্ব পালন করবে।

ওস্তাদের সাথে খলিফা মক্কাতে পৌঁছে। আরও কয়েকজন শিল্পী ও কারিগরের সাথে সেও কাজ শুরু করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাদুর বিছানো মেঝেতে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করে যায় সে। শুধুমাত্র খাবার বা একটু ঘুমানোর সময় ছাড়া সারাদিন তার কোন অবসর থাকে না। গিলাফের কালো কাপড়ে সোনালী সূতো দিয়ে কারুকাজ সহ কুরআনের আয়াত অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে থাকে সে।

রোজ দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়ার পর ক্লান্তি এসে ভর করে তার শরীরে। দেওয়ালের সাথে বালিশ ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে খলিফা। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্যে মাত্র। ঘুম থেকে জেগে ওঠার সাথে সাথে হাত মুখ ধুয়ে আবার কাজ শুরু করে দেয়। কারো সাথে কথাবার্তা হয় না তার। অন্য কেউও তার সাথে কথা বলায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। আসলে এত নীরবে এবং একাগ্র মনে সে কাজ করে যে তার সহকর্মীরা তার উপস্থিতি বুঝতেই পারে না প্রায়।

মদীনায় বসবাসকারী একজন রুশ মুহাজির খলিফার শিল্পকর্মের খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছিলেন তিনি বহু বছর আগে। ইতোমধ্যে মদিনার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্প অনুরাগী এই লোকটি খলিফার বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি সংগ্রহ করে তাঁর সংগ্রহশালার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। বলা যায়, একেবারে হঠাৎ করেই নিজের বিধবা কন্যার সাথে খলিফার বিবাহের প্রস্তাব পাঠান তিনি।

তাঁর বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। খলিফাকে সাথে করে আহমদ খলিল পৌঁছে সেখানে। কথাবার্তা বলা দরকার। ব্যবসায়ী লোকটি দু'জনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আলাপ শুরু করেন। খলিফা একটি কথাও না বলে সারাক্ষণ অটল গাম্ভীর্যের সাথে বসে রইল। তার হবু শ্বশুর ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তার প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

দেখা গেল, ভদ্রলোক আর বিলম্ব না করে কোন রকম শর্তাদি ছাড়াই তার মেয়েকে খলিফার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন।

খলিফার বিয়ে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু আহমদ খলিল মোটেই ভরসা পায় না। কারণ খলিফার যে অবস্থা তাতে কোন মেয়ের ভার তার হাতে নিঃসংশয়ে তুলে দেয়া সত্যিই কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া সংসারের ব্যাপারে তার কোন ধারণা নেই। অন্ততঃ এ মুহূর্তে যাতে সে বিয়ে না করে এজন্যে খলিফাকে বোঝাতে থাকে সে। কিন্তু অবাক ব্যাপার, বিয়েতে দেরী করতে রাজী হয় না খলিফা।

মক্কা শরীফে কাজ করে এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম বিক্রিবাবদ এ যাবতকালের সঞ্চিত সকল অর্থ আহমদ খলিলের হাতে তুলে দেয়। খলিফা সে অর্থ থেকেই বিয়ের টুকিটাকি কেনাকাটা সারা হয়ে যায়।

খলিফার স্ত্রী শাফিয়ার বয়স তার চেয়ে বেশি, প্রায় ত্রিশ বছর। বছর কয়েক আগে বিধবা হয়েছে সে। কিন্তু আগের স্বামীর ঘরে কোন সন্তান হয়নি তার। আসল বয়সের চাইতে দেখতে তাকে কম বয়সী বলেই মনে হয়। আসলেই বাইরের কারো পক্ষেই তার বয়স বিশ-একুশের বেশি বলে মনে করা কঠিন।

আসমা এবং মায়মুনা এ সংসারে শাফিয়ার আগমনে মোটেই খুশি হয়নি। প্রথম থেকেই মেয়েটিকে পছন্দ করেনি তারা। কারণ, পোশাক বাদ দিলে চেহারা এবং গায়ের রং এর দিক দিয়ে শাফিয়ার সাথে ইউরোপীয় মেয়েদের কোন পার্থক্য ছিল না। আর জন্মগতভাবেই ইউরোপীয় মেয়েদেরকে ঘৃণা করত তারা। কিন্তু কিছুদিন পরই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। শাফিয়া আরবী মোটামুটি ভালোভাবেই শিখেছিল। তাছাড়া আরবীয় পারিবারিক প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সে খুব তাড়াতাড়িই নিজেকে মানিয়ে নেয়। ফলে আসমা ও মায়মুনার সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠতে থাকে।

খলিফা এর আগে কখনো নারীসঙ্গ পায়নি। এখন তার প্রায় সারাটা দিনই স্ত্রীর কাছে কাটে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিমুগ্ধ চোখে সে নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুদ্ধিমতী এবং অভিজ্ঞ শাফিয়ার পক্ষে স্বামীর দুর্বলতাটুকু উপলব্ধি করতে দেরি হয়নি। তাকে খুশি করার প্রাণপণ চেষ্টা করে সে। খলিফার কাছে পৃথিবীকে এত মধুর বলে আর কখনো মনে হয়নি। এক অনাবিল সুখ ও গভীরতর আনন্দের মধ্যে তার দিনগুলো পার হতে থাকে। বছর খানেক পর একটি সন্তান জন্ম নিলে তার এ আনন্দ আরো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একদিন সকালে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে খলিফার ঘুম ভাঙ্গে। ঘর থেকে বেরোতে পারে না সে। কাউকে কিছু না বলে দেওয়ালের গায়ে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থাকে সে। শাফিয়া প্রথমে ব্যাপারটি টের পায়নি। কিন্তু খলিফাকে অনেকক্ষণ একভাবে শুয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হয়। জিজ্ঞেস করার পর খলিফা তাকে মাথা ব্যথার কথাটা জানায়। শাফিয়া সম্ভব অসম্ভব সকল উপায়ে তার কষ্ট দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু খলিফা স্ত্রীর এই ব্যাকুলতার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত না করে নিশ্চল পাথরের মত পড়ে থাকে।

এ রকম বেকায়দায় শাফিয়া আর কখনো পড়েনি। স্বামীকে একটু আরাম দেয়ার জন্যে এত চেষ্টা পরও সে যখন তার সাথে একটা কথাও বলল না, তখন শাফিয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। খলিফা যা করেছে তা এবং যা করেনি সব কিছুর মধ্যেই যেন সে অর্মাজনীয় দোষ খুঁজে পায়। নির্মম কণ্ঠে স্বামীকে তিরস্কার করতে শুরু করে সে–

ঃ আমার আগের স্বামী কখনোই এমন করত না। সে অসুস্থ অবস্থায়ও কঠোর পরিশ্রম করে আমাকে সুখে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আর তুমি! সামান্য মাথাব্যথা নিয়ে এভাবে ঘরে পড়ে আছ দেখে আমার লজ্জ করছে। একদিন কাজ না করলে যার ঘরে খাবার জোটে না তার আবার অসুখ কিসের! কাল থেকে যেন তোমাকে আর ঘরে না দেখি।

রাগে ক্ষোভে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে থাকে শাফিয়া।

খলিফা এক নজর মাত্র স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে।

শাফিয়া ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। তার মনে হয়, এতক্ষণ সে যা বলেছে তাতে খলিফার উপযুক্ত শিক্ষা হয়ে গেছে।

সপ্তাহখানেক পর এমন অবস্থা দাঁড়াল যে শাফিয়া বা তার সন্তানের জন্য শুধু পানি ছাড়া ঘরে খাবার মত কিছুই ছিল না। অথচ এক সপ্তাহ আগেও সংসারের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সবই তার ঘরে ছিল। শাফিয়া এ জন্যে মনে মনে গর্ব বোধ করত। কিন্তু কয়েক দিনের অনাহারে তার গর্ব, সম্মান সবই ধুলোয় মিশে গেছে। খলিফা এদিন ঘরে থাকেনি ঠিকই, কিন্তু স্ত্রী বা সন্তানের মুখে দেবার মত একটি দানাও সে ঘরে আনেনি। শাফিয়ার এ দুঃসময়ে আসমা এগিয়ে আসে। কিভাবে সে যেন ব্যাপারটি জেনে যায় যদিও শাফিয়া তাকে কিছুই বলেনি। নিজের খাবারটুকু থেকে সে বেশির ভাগ অংশই শাফিয়া ও তার সন্তানের জন্য তুলে দেয়।

আরো তিনদিন কেটে যায় এভাবে। দুপুর বেলা লাইব্রেরী থেকে ফিরে আসে খলিফা। তার বগলে কাগজের বিরাট এক বান্ডিল। আকুল আগ্রহে স্বামীর দিকে ছুটে যায় শাফিয়া। এতদিন পরে নিশ্চয়ই বহু কিছু নিয়ে এসেছে খলিফা। কিন্তু বান্ডিলটি হাতে নিয়েই ভুল ভাঙ্গে তার, একতাড়া কাগজ বৈ অন্য কিছু নয়। শাফিয়ার হতাশ এবং বিষাদময় চেহারা দেখে খলিফা বলে--

ঃ "তোমার জন্যে একটা বিশেষ উপহার এনেছি। যত্ন করে রেখে দাও। এগুলো আসলে এক একটা ছবি। গত কয়দিনে অনেক পরিশ্রম করে এঁকেছি।

একটা ছবি হাতে তুলে দেয় সে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে--দেখ তো, এই ছবিটা কেমন? ছবিটি দু'হাতে মেলে ধরে সে।

একটি রক্তাক্ত লাশ। বেয়নেটের আঘাতে সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত। বিমানগুলো বোমা ফেলছে। ইরাক আল মানশিয়া গ্রামটি দাউদাউ করে জ্বলছে। ছবির পটভূমিতে গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে গোলা বর্ষণ করছে ইসরাইলী ট্যাংকগুলো। ছবিটি এত ভয়াবহ, এত জীবন্ত যে মনে হচ্ছে টকটকে লাল রক্তে লাশগুলো রাঙানো এবং ইহুদী সৈন্যরা কাগজের পাতা ছেড়ে এই বুঝি সামনে এসে দাঁড়াল। ছবির কোণায় এই প্রথম বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখেছে খলিফা।

আসমা এবং মায়মুনা কখন এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে খলিফা জানেনা। কিন্তু ছবির সবচেয়ে স্পষ্ট লাশটি দেখে আঁতকে ওঠে আসমা। কারণ সেটি যে তার আব্বার লাশ তা দেখে বুঝতে পেরেছে সে। শাফিয়াও ছবিটি দেখে চিৎকার করে ওঠে এবং সাথে সাথে জ্ঞান হারায়। আসমার মাথার মধ্যেও কেমন যেন ঘুরে ওঠে। শূন্য বোধ হয় সব কিছু। দেয়ালের সাথে শরীর ঠেকিয়ে নিজের পতন রোধ করে সে। মায়মুনা দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসে শাফিয়ার চোখ-মুখে ছিটাতে থাকে। জ্ঞান ফিরে আসে তার। বিড়বিড় করে বলতে থাকে সে--ছবি কি এত জীবন্ত হয়?

অবস্থা দেখে রাগে ক্ষোভে ক্ষেপে ওঠে খলিফা। মুহূর্তে একটানে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে সে। পরমুহূর্তে তা শতটুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়।

এর কিছুক্ষণ পরই সব কিছু জানিয়ে তার আব্বার কাছে খবর পাঠায় শাফিয়া। সে রাতেই শাফিয়ার ছোট ভাই তাকে নিতে আসে। তাদের পুত্র সন্তান রফিকের বয়স তিন মাস মাত্র। ছেলেটি একেবারে বাপের চেহারা পেয়েছে। ফলে তার মধ্যে বাপের স্বভাব থাকতে পারে আংশকা করে ছেলেটিকে ফেলে চিরদিনের মত খলিফার ঘর ছেড়ে চলে যায় শাফিয়া। নিষ্পাপ মাসুম শিশুটির দায়িত্ব এসে পড়ে আসমা এবং মায়মুনার ঘাড়ে।

খলিফা কিন্তু ব্যাপারটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। শাফিয়ার চলে যাওয়ার কোন কারণ সে খুঁজে পায় না। সুন্দরী স্ত্রী যে অনাহারে থেকে কষ্ট পেয়েছে বা পেতে পারে এ বোধটুকুও তার নেই। তাই দু'তিনদিন অপেক্ষা করেও শাফিয়া ফিরছেনা দেখে তার অতীব সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখতে বসে সে। সে চিঠিতে ঘুরে ফিরে শুধু একটাই কথা তার– শাফিয়া যেন জলদি করে ফিরে আসে। কিন্তু বহু চিঠি পাঠানোর পরও কোন উত্তর সে পায় না। তার চেহারায় দুঃসহ যন্ত্রণা এবং গভীর অসহায়ত্বের ছাপ দেখে আহমদ খলিল ও রশিদ বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা জানে, তাদের এ নির্বোধ ভাইটি কোনদিনই এর কারণ বুঝতে পারবেনা কিংবা তারা চেষ্টা করলেও তাকে তা বোঝানো যাবে না।

এ ব্যাপারে আহমদ খলিলেরও করার কিছুই ছিল না। সে খুব ভালো ভাবেই জানে যে শাফিয়াকে কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবারের মত যদি ফিরিয়ে আনা যায়ও, ভবিষ্যতেও একই ব্যাপার ঘটবে এবং তখন পরিস্থিতি আরো বেশি মর্মান্তিক হতে পারে। তাই, প্রতি ওয়াক্তের নামাজের পর দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে সে মোনাজাত করে যাতে সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু না। জীবন ও জগত সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ তার ভাইয়ের যন্ত্রণার উপশম হওয়ার মতো কোন অলৌকিক ব্যাপারই ঘটে না—আল্লাহর ইচ্ছা অন্য রকম বলেই হয়তো। ঘটনা ধারা তার নিজস্ব গতিতেই বয়ে চলে।

খলিফাকে দেয়া শাফিয়ার তালাক নামা কাজীর অনুমোদন পেয়েছে। খলিফা সেটা হাতে নিয়ে একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। সংবিৎ ফিরে পেতেই তার সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে শাফিয়ার আব্বার উপর। খলিফা আহমদ খলিল ও রশিদকে জানায়, শত্রুরা আবার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। শাফিয়ার আব্বা যে তাদেরই একজন এতে তার সন্দেহ নেই। সুতরাং বর্তমানের ঘটনা তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে বলেই সে মত প্রকাশ করে।

২৩.

খলিফার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ বেশি খারাপ হয়ে উঠছে। রশিদ এবং আহমদ খলিল গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে। যত্ন চেষ্টার কোন ত্রুটি তারা করে না। কিন্তু, স্পষ্ট বুঝতে পারে যে খলিফার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, তাদের কিছুই করার নেই।

খলিফার দেহে প্রাণের চিহ্ন যে টুকু আছে তা চোখে প্রায় না পড়ারই মত। সারাটা দিন তার কাটে শুয়ে থেকে। কখনো দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, কখনো বা মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে। সে যে কোথায় আছে এ বোধটুকুও বোধ হয় তার নেই। বিছানা থেকে ওঠা, হাঁটা চলা, কিছুই করে না সে। প্রতিদিন প্রায়ান্ধকার ঘরের জানালা পথ গলে নেমে আসা আলোর দিকে একভাবে চেয়ে থেকে বহু সময় কেটে যায় তার। চুলগুলো বড় হয়ে ঘাড় পেরিয়ে পিঠের উপর নেমে আসার উপক্রম হয়েছে। শরীর অরো শুকিয়ে গেছে। গায়ের ময়লা পোশাক কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। তার ফাঁকে হাড্ডিসার শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখা যায়।

খলিফার সবচেয়ে বড় অসুবিধা সারারাত একটুও ঘুমোতে পারে না সে। আহমদ খলিল প্রায়ই সকালে উঠে দেখতে মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে খলিফা। দু'ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। ঘাড়টা পিছন দিকে বেঁকে এবং মুখের কোণায় গড়িয়ে পড়া লালার দাগ। সে এক টুকরো ভেজা কাপড় এনে গভীর মমতায় খলিফার মুখটা পরিষ্কার করে দেয়।

বেশি গরমের দিনে খলিফা খুব পানির পিপাসা বোধ করে। আহমদ খলিল খুব তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে আসে কোন কোন দিন। বড় বড় কয়েকটি গামলায় পানি ভরে সে আর আসমা দু'জনে মিলে মাথায় ঢালতে থাকে তার। এতে খলিফা কিছুটা সুস্থ বোধ করে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কয়েকদিন কিংবা কয়েক সপ্তাহ তাদের কাউকেই সে চিনতে পারে না। কয়েকদিন পরে হঠাৎ করেই একদিন তার চেতনা ফিরে আসে। তখন সবার নাম ধরে ডাকতে থাকে সে।

এ অবস্থায় খলিফার জন্যে এক নতুন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। ইসমাইল এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। তার মাথায় নিত্য নতুন দুষ্টবুদ্ধির আনাগোনা। হঠাৎ করেই খলিফা তার শিকারে পরিণত হয়। আহমদ খলিল এবং রশিদ যখন বাড়িতে থাকে তখন সে খুবই সভ্য এবং ভদ্র। কিন্তু, প্রতিদিন সকালে কাজের জন্যে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই তার দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নানাভাবে খলিফাকে সে বিরক্ত করতে শুরু করে। প্রথম প্রথম একটু ভয় থাকলেও এক সময় সে আবিষ্কার করে যে শত অত্যাচার করলেও খলিফার বাধা দেয়ার কোন শক্তিই নেই। এতে ইসমাইলের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। এক সময় সে তার এই নতুন খেলায় শরীক হওয়ার জন্যে রাস্তা থেকে সমবয়সী বখাটে ছেলেদেরকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসতে শুরু করে।

আসমা এবং মায়মুনা ইসমাইলকে বাধা দেয়ার চেষ্ট করে ব্যর্থ হয়। আসলে, ইতিমধ্যেই মায়ের শাসনের বাইরে চলে গেছে ইসমাইল। মায়মুনা তখন বাধ্য হয়ে অন্য ছেলেগুলোর মায়েদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। সে অবাক হয়ে দেখে, সব ছেলের মায়েরাই ধর্মপ্রাণ, নামাজী এবং ভদ্র। কিন্তু বখে যাওয়া ছেলেগুলোকে শাসনের ক্ষমতা তাদের নেই। মায়মুনার মতই তারাও একেবারেই অসহায় পড়েছে তাদের ছেলেদের কাছে।

চাচাকে উৎপীড়ন করে খুব আনন্দ পায় ইসমাইল। এর মধ্যে একটা নতুন পথ পেয়ে যায় সে। মানসিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ক একটি মিসরীয় পত্রিকা এনেছিল সে স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন ছবি আছে। শিক লাগানো বন্ধ ঘরের মধ্যে রোগীদের রাখা হয়েছে– এ রকম একটা ছবি পেয়ে মাথায় অদ্ভুত একটা বুদ্ধি খেলে যায় তার। ছবিটা কেটে আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে খলিফার চোখের সামনে তুলে ধরে। তাতে লেখা–এ ভাবেই তোমাকেও ঐ পাগলদের সাথে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হবে।

ছবিটা খলিফাকে দেখাতেই চিৎকার করে ওঠে সে।

আসমা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে। ইসমাইলের হাতে ছবি এবং পত্রিকাটি দেখে ব্যাপারটি বুঝতে বাকি থাকে না তার। একটানে ছবি ও পত্রিকাটি কেড়ে নিয়ে সোজা আগুনে নিক্ষেপ করে।

ক্রুদ্ধ ইসমাইল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একটু পরই সে ফিরে আসে। তার সাথে এক দঙ্গল বখাটে ছেলে। খলিফাকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় তারা। রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। একজন একটা সিগারেট ধরিয়ে তার আগুন ঠেসে ধরে খলিফার গায়ে। মায়মুনা দৃশ্যটা দেখে আতংকে চিৎকার করে ওঠে। ইতিমধ্যে কয়েকজন মিলে খলিফাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে কিল ঘুঁষি মারতে শুরু করে। এক দৌড়ে রাস্তায় ছুটে গিয়ে খলিফাকে টেনে তোলে মায়মুনা। আস্তে আস্তে তাকে ধরে নিয়ে আসতে থাকে ঘরের দিকে।

ঃ দাঁড়া! রাতটা নামলেই হয়। জেনারেল মোশে দায়ানের কাছে আজ তোকে ঠিকই ধরিয়ে দেব। সে তোকে গুলি করে মারবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খলিফাকে ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে কথাগুলো বলতে থাকে ইসমাইল।

কাজ থেকে আজ একটু আগেই ঘরে ফিরে আসছিল আহমদ খলিল। বাড়ির সামনে এসে দৃশ্যটা চোখে পড়ে তার। হতভম্ব হয়ে পড়ে সে। মায়মুনা খলিফাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে পা দিতে সে সংবিৎ ফিরে পায়। ছেলেদের ভিড় ঠেলে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে। কিন্তু বখাটে ছেলেগুলো একেবারে খেপে উঠেছে। বন্ধ দরজায় আঘাত করতে তাকে তারা। আহমদ খলিল এদিক ওদিক তাকায়––যদি কোন পুলিশ চোখে পড়ে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। হঠাৎ হুড়মুড় করে দরজাটা ভেঙ্গে পড়তেই চমকে ওঠে সে। এদের হাত থেকে খলিফাকে বাঁচানো যাবেনা ভেবে আতংকিত হয়ে ওঠে।

এমন সময় দরজার ওপাশে রশিদের গলা শোনা যায়। গভীর স্বস্তিতে আহমদ খলিলের মন ভরে ওঠে। রশিদের প্রচণ্ড ধমকে জমায়েত ছেলেগুলো ভেগে যায়। ইসমাইলের হাত ধরে ঘরে ঢোকে রশিদ।

গভীর দুঃখ ভরা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকায় আহমদ খলিল। বলে–

ঃ এসবের জন্যে দায়ী শুধু তুমি। তুমি না হলে ছেলেগুলো এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারত না। কিন্তু তোমার তো এখন বয়স হয়েছে। এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটাতে তোমার লজ্জা করল না?

ইসমাইলের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে–

ঃ কেউ তার কোন ক্ষতি করতনা। তাছাড়া সে তো একটা অথর্ব মানুষ--কোন বোধই তার নেই, কিছু বুঝতেও পারে না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আহমদ খলিল। এক ঝটকায় ইসমাইলের জামার কলার ধরে কাছে টেনে আনে। তারপর প্রচণ্ড জোরে এক চড় কষিয়ে দেয় সে। ইসমাইল ছিটকে গিয়ে পড়ে মেঝেতে। ভয়ে ও ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে সে। একই সাথে আরো আঘাত ঠেকানোর জন্যে হাত উঁচু করে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। এদিকে আহমদ খলিল ঘরের কোণ থেকে একটি লাঠি কুড়িয়ে এনে নির্মমভাবে পেটাতে শুরু করে তাকে। পিটিয়ে হয়ত ইসমাইলকে মেরেই ফেলত সে। কিন্তু হঠাৎ করেই সংবিৎ ফিরে পায় সে। মেঝে থেকে ইসমাইলকে টেনে তুলে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে। বলে–

ঃ তুমি, যে রকম ব্যথা পাচ্ছ, আমার ভাইটিও এ রকমই যন্ত্রণা পেয়েছে। ফের যদি তার সাথে ইয়ার্কি মারতে দেখি, তোমাকে আমি একদম জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

রশিদ আহমদ খলিলের হাত থেকে ইসমাইলকে রক্ষা করার কোন চেষ্টা করেনি। মেঝেতে বসে খুব যত্নের সাথে খলিফার পুড়ে যাওয়া ক্ষতস্থানে অলিভ অয়েল লাগাতে থাকে। পরে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সব জায়গায় ব্যান্ডেজ করে দেয়।

'শত্রু বিমান। শত্রু বিমান।' হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে খলিফা।

রশিদ খলিফাকে জড়িয়ে ধরে। বাইরে ততক্ষণে মোটর গাড়ির শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। রশিদ বলে--

ঃ ভয় নেই, শত্রুর বিমান চলে গেছে। ভয়ের কিছু নেই।

খলিফার মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে থাকা ঘন কুয়াশা যেন একটু একটু করে পরিষ্কার হতে থাকে। তার দৃষ্টিতে ঘোলাটে ভাবের পরিবর্তে একটি স্বচ্ছ আভা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

রশিদ অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে--

ঃ খলিফা, তুমি, তুমি আমাকে চিনতে পারছ?

খলিফা একটু হাসে। অস্ফুট গলায় রশিদের নাম ধরে ডাকে।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি। রশিদ আকুল আগ্রহে জবাব দেয়।

ঃ আমাকে কিছু খেতে দাও--ফিস ফিস করে বলে খলিফা।

আনন্দে উৎফুল্ল রশিদ এবং আহমদ খলিল সারা ঘর খুঁজে যত খেজুর আর রুটি পায়, সব এনে খলিফার সামনে হাজির করে।

রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। বাতি জ্বালানোর মত কেরোসিন নেই ঘরে। আহমদ খলিল এবং রশিদ খলিফার পাশে বসে। দেহে আঘাতের যন্ত্রণা সত্ত্বেও খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছে সে। আসমা বসে আছে ইসমাইলের পাশে! আহমদ খলিলের পিটুনি খেয়ে বহুক্ষণ ধরে কাঁদার পর অবেশেষে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন কথা না বলে মৌন নির্জনতায় নীরবে বসে থাকে তারা।

সকালে উঠে নিজেই প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে খলিফা। আসমাকে ডেকে তার আছে পানি চায়। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। এত রোগা হয়ে গেছে সে! তার নিজের কাছেই ব্যাপারটি যেন বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তার মনে হয়, এখন বাইরের কেউ তাকে দেখে কোনভাবেই চিনতে পারবে না।

আসমা খলিফাকে লক্ষ্য করেছিল। তার মনের ভাবটা যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করে সে। একটা বালতি হাতে করে সে এগিয়ে যায় একটু দূরের রাস্তায় টিপকলে। কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পর পর তিন বালতি পানি এনে দেয় খলিফাকে। এরপর ঘর থেকে বড় দেখে একটা সাবানের টুকরো নিয়ে আসে। খলিফা সাবানটি হাতে নিয়ে তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পুরু হয়ে জমে থাকা ময়লা ও দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

গোসল শেষ হবার পর খলিফা একটা মিসওয়াক নিয়ে ময়লা হলুদ হয়ে ওঠা দাঁতগুলো মেজে ঝকঝকে করে তোলে। কাঁচি চেয়ে নিয়ে লম্বা নখগুলো কাটে। এরপর রশিদ নতুন কাপড় দিয়ে তার ক্ষতস্থানগুলো খুব সুন্দর করে ব্যান্ডেজ করে দেয়। খলিফার পায়ের ক্ষতটি মারাত্মক হলেও স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করে যে সে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারছে। ব্যথা আছে, তবে মারাত্মক নয় দেখে সত্যিই খুশি হয়ে ওঠে।

আহমদ খলিল ও রশিদ তাদের সবচেয়ে ভালো পোশাক দিয়ে খলিফাকে সাজিয়ে দিয়েছে। দরজার কাছে রাস্তার দিকে চেয়ে সারাটা দিন কাটে খলিফার। রাস্তায় হরেক রকম মানুষের চলমান মেলা। নানা দেশের নানা জাতির লোককে চলাচল করতে দেখে সে। প্রত্যেকেই যার যার জীবন প্রবাহের অন্তর্গত স্পন্দনকে ধারণ করে নিজস্ব গতিতে প্রবহমান। এদের মধ্যে অনেকেরই জীবন একসময় কেটেছে দুঃস্বপ্নের মাঝে, কিন্তু তা আজ তাদের কাছে পুরনো স্মৃতিমাত্র। চলমান জনতার ভিড়ের দিকে চেয়ে খলিফার মনে এ সব কথা উঠে আসে। শীতের সূর্য সারা দিন ধরে ইষদুষ্ণ উত্তাপ নিয়ে আছড়ে পড়ে তার পিঠে। খলিফা নীরবে বসে থাকে।

ধীরে ধীরে খলিফার ক্ষতগুলো সেরে ওঠে। আহমদ খলিল ও রশিদ খুশি হয়। এতদিন খলিফার জন্যে নিজেদের কোন বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে ডেকে আনতে পারত না তারা। এবার আবার তাদের আসা যাওয়া শুরু হয়। খলিফা চুপচাপ তাদের আসরে বসে থাকে, মনোযোগের সাথে কথাবার্তা শোনে। কেউ তাকে কিছু বললে খুব বিনয়ের সাথে তার উত্তর দেয়।

খলিফার সুস্থ হয়ে ওঠার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর বুড়ো লাইব্রেরিয়ান প্রতিদিন সকালে তার সাথে দেখা করতে আসেন। এই বৃদ্ধ, জ্ঞানী মানুষটিকে দেখলেই খলিফার খুব ভালো লাগে। নামাজ শুরু করার জন্যে খলিফাকে উৎসাহ দেন তিনি। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরী থেকে একের পর বই এনে তিনি খলিফাকে ঘরে বসে পড়ার দুর্লভ সুযোগও দিয়েছেন। তাছাড়া প্রায়ই নিজের বাড়িতে রান্না করা ভাত, গোশ্‌ত, ফলমূল নিয়ে আসেন খলিফার জন্যে। তিনি জানেন, খলিফা এগুলো খুবই পছন্দ করে।

একদিন সবচেয়ে উন্নতমানের কালি, কলম, ব্রাশ এবং কাগজ নিয়ে আসেন লাইব্রেরিয়ান। তার ইচ্ছা, অনিন্দ্য সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন ও হাদিসের কপি করা শুরু করুক খলিফা। তিনি দেখেন, দীর্ঘদিনের যত্ন ও আন্তরিকতায় খলিফাকে যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন– তার কিছুই সে ভোলেনি। আগের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর হবে তার এবারের সৃষ্টি, লাইব্রেরিয়ান মনে মনে আশা করেন।

ইসমাইলের চার বছর বয়সের সময় থেকেই তাকে কুরআন শরীফ পড়তে শেখা ও মুখস্থ করার জন্যে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিল আহমদ খলিল। কিন্তু ওস্তাদরা তার ব্যাপারে প্রথম থেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিন যে পাঠ তাকে দেয়া হতো সে তার কিছুই মুখস্থ করত না। তাই জিজ্ঞেস করলেও তার কাছ থেকে কোন জবাব মিলত না। ছেলেকে নিয়ে আহমদ খলিলের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। কিন্তু নিজের অপছন্দের কারণেই ছেলেকে নিচু কাজের কোন পেশায় জড়ানোর কোন ইচ্ছা তার ছিল না। ইসমাইল বড় হয়ে যে কোন সৎ ও কার্যকর পেশা বেছে নিলে তাতে তার আপত্তির কিছু থাকবে না। এ জন্যেই সময়মত ছেলেকে সে শিক্ষালাভের জন্যে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছে।

ইসমাইলের লেখাপড়ার ফলাফল থেকে আহমদ খলিলের ইচ্ছাপূরণের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ইতিমধ্যে লিখতে ও পড়তে শিখেছে সে। অংকেও তার ভালো আগ্রহই দেখা গেল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তার মোটেই কোন মনোযোগ নেই। আরো বেশি অসুবিধা হল এই যে সে যতক্ষণ ক্লাসে থাকে ততক্ষণ সেখানে হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি লেগেই থাকে। শিক্ষকদের পক্ষে চেষ্টা করেও তখন ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসমাইলের উপস্থিতিতে অন্যদের সাহস এবং উৎসাহের মাত্রাও যেন অনেক বেড়ে যায়। মূলতঃ মাদ্রাসায় ভর্তির পরপরই জায়গাটাকে একেবারে গোলমালের আখড়া বানিয়ে ফেলেছে সে। একদিন এক শিক্ষক বিরক্ত হয়ে ইসমাইলকে এক চড় লাগাতেই সে তাকে পাল্টা আরেকটা চড় লাগিয়ে দেয়।

ফল যা হবার তাই হয়। স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। বহিস্কৃত ইসমাইলকে অন্য একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয় আহমদ খলিল। এবার তার ব্যবহার আগের চেয়ে অনেক সংযত হয়ে আসে। কিন্তু লেখাপড়ায় উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

রশিদ প্রায়ই ইসমাইলকে তার সাথে বাগানের কাজে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আহমদ খলিল তাতে রাজি হয় না। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়ারও সৃষ্টি হয়। রশিদ বলে–

ঃ ছেলেটাকে স্কুলে দিয়ে লাভ কি? সে তো লেখাপড়া শিখবেনা। অন্য দিকে এখন থেকে কাজ কর্ম করতে না শিখলে ভবিষ্যতে নিজের পায়েও দাঁড়াতে পারবে না। তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়াই ভালো। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

আহমদ খলিল তার সিদ্ধান্তে অটল। ইসমাইলকে লেখাপড়া শেখাবে। এ ব্যাপারে নিজের মনের কাছ থেকে সমর্থন পায় সে। তাছাড়া মালেক ওহাবের লেখা চিঠিও তাকে সমর্থন যোগায়। মালেক ওহাব লিখেছেন ঃ

"ইসমাইল লেখাপড়া শিখছে জেনে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি। আমি জেনে আরো খুশি হলাম যে রশিদের সন্তানদেরও স্কুলে পাঠানোর জন্যে তুমি চেষ্টার ক্রটি করনি। পিতার কাছ থেকে উৎসাহ এবং ঘরে উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। রশিদের ছেলেমেয়েদের জন্যেও তাই হওয়া স্বাভাবিক। তারা যে শিক্ষা লাভ করছেনা এটা তাদের এবং তাদের ভবিষ্যতেরও জন্যেও দুঃখজনক। যা হোক, রশিদ তার সন্তানদের লেখাপড়া করাতে না চাইলেও তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবে বলেই আশা করি। তোমার ছোটবেলার সেই দুঃসময়ে তুমি যদি লেখাপড়া শিখতে পারতে এবং তোমাকে যদি মুস্তফা এফেন্দীর বাড়িতে দাস হিসেবে না থাকতে হত−তাহলে ভেবে দেখ, তোমার জীবন আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত "

আহমদ খলিল আলমারির ওপর থেকে তার আব্বার চিঠি ভরা বাক্সটা নামিয়ে আনে। অনেকগুলো চিঠি। এক এক করে সবগুলো চিঠি সে আবার পড়তে শুরু করে।

চিঠি পড়ার মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল আহমদ খলিল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সে সংবিৎ ফিরে পায়। ইসমাইলকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয় সে−

ঃ কি ব্যাপার! এত সকালে মাদ্রাসা থেকে চলে এলে কেন তুমি? ছুটির সময় তো হয়নি। শরীর খারাপ করেছে নাকি?

ঃ শিক্ষক পিছন দিকে ফিরতেই বেরিয়ে এসেছি। আমি মাদ্রাসায় আর পড়বনা। বেপরোয়া গলায় জবাব দেয় ইসমাইল।

ঃ ব্যাপারটা কি? শিক্ষক কি তোমাকে আবার মেরেছে? তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার কর না কেন? আহমদ খলিল জিজ্ঞেস করে।

ঃ আব্বা, আপনি সেই চার বছর বয়স থেকে আমাকে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি, খামোখা সেখানে সময় নষ্ট হচ্ছে আমার।

ছেলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় আহমদ খলিল। তবু তার কাছে আসল ব্যাপারটি জানতে চায় সে।

ঃ 'আমি সেখানে শুধু পুরনো কাহিনী আর কুসংস্কারই শিখছি ...।

ঃ 'কি বললে! রাগে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয় আহমদ খলিলের। তোমাকে কি সেখানে কুরআন এবং হাদিস শিক্ষা দেয়া হয় না?

মুখ বাঁকা করে ফেলে ইসমাইল−

ঃ দূর! এগুলোর কোন দাম আছে নাকি। আপনি আমাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিন।

ঃ ওই সব স্কুলে পড়াবার সামর্থ আমার নেই। আহ্‌মদ খলিল জানিয়ে দেয়।

ঃ আপনার কোন খরচ লাগবেনা। আপনি জানেন না, তাই। সরকার সব স্কুল ফ্রি করে দিয়েছে। এইতো, এখান থেকে একটু দূরে এই সে দিন মাত্র একটা স্কুল খুলেছে। আপনি আমাকে সেখানে ভর্তি করে দিন।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করে আহ্‌মদ খলিল। সে জানায়, এসব স্কুল বিদেশীদের ধাঁচে চলে। সেখানকার পড়াশোনা, পোশাক, ব্যবহার, চিন্তাধারা সবই বিদেশীদের মত। সেখানকার ডিগ্রীধারীদের আরবীয় মুসলিম বলে চেনার উপায় থাকে না।

কিন্তু ইসমাইলকে বোঝানো যায় না। সে জানায়, বিদেশী ধাঁচে হলেও ঐ স্কুলেই সে পড়বে। তার মতে, ভালো লেখা পড়া ছাড়াও বহু বিদেশী পত্র-পত্রিকা এবং খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ সেখানে পাওয়া যায়। আর এসব না পড়লে সত্যিকার লেখা পড়া হয় না।

আহ্‌মদ খলিলের অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। চিৎকার করে সে বলে –

ঃ তোমাকে অবশ্যই আগে কোরআন পড়তে হবে। কারণ কোরআনই সকল জ্ঞানের উৎস। তারপর তুমি যা খুশি কর।

ঃ কিন্তু বড় বড় লোকেরা জেট বিমানে চড়ে এক ঘন্টায় শত শত মাইল পাড়ি দিচ্ছে। এই তো, মাত্র গতকালই আমি খবরের কাগজে দেখলাম রকেটে করে চাঁদে মানুষ পাঠানো হচ্ছে। কুরআনে এসব আছে নাকি?

ঃ কুরআন বলছে, আল্লাহ্‌ মানুষকে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌ সকল কিছুর মালিক। তিনি তাঁর যে কোন সৃষ্টিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারেন। কিন্তু তুমিই বলো – মানুষ যদি পৃথিবীতে অত্যাচার, অনাচারই দূর করতে না পারল তবে চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে কি হবে? মহান ব্যক্তিরা নবীর পথ অনুসরণ করেন। যেখানেই যান সেখানেই ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন তারা। এখন খোদা বিরোধীরাই পৃথিবী শাসন করছে। যা কিছু সত্য ও সুন্দর তার সবই তারা ধ্বংস করে দিতে চায়

ঃ 'কিন্তু কুরআন যে সত্য তার প্রমাণ কি? আল্লাহ্‌ কি চিরন্তন? আপনি তার প্রমাণ দিতে পারবেন? তিনি যদি বিশ্বের স্রষ্টা হয়ে থাকেন তবে তাকে সৃষ্টি করেছে কে? জিজ্ঞেস করে ইসমাইল।

ঃ ইসমাইল আমার দিকে তাকাও। আহামদ খলিল ক্রুদ্ধ গলায় বলে। তুমি যে সব বিদেশী বই পড়েছ সেগুলোর নাম বল। কি কি বই পড়েছ তুমি?

ইসমাইল মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্য কথা প্রকাশ করতে তাকে লজ্জিত এবং ভীত বলে মনে হয়। পরে সে বলে – কোন বই পড়ে নয়। আমার মনে হয়েছে। তাই বলেছি।

আহমদ খলিল তার আব্বাকে চিঠি লিখতে বসে ঃ

"আমি বুঝতে পারছিনা যে আমার ব্যর্থতা কোথায়। আমার সন্তানটি এ বয়সেই নাস্তিক হয়ে উঠেছে। তার জন্যে আমি খুবই শংকিত। কারণ সে কিছুই জানে না। ফলে চারদিকে প্রতিদিন যে অশুভ প্রবণতার প্রসার ঘটছে তা প্রতিরোধ করার সাধ্য তার নেই। এই পবিত্র শহরেও সেই অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আমার। আমি জানিনা আমি কি করব। আপনি লিখে জানান আমি এখন কি করতে পারি....

মালেক ওহাব খুব তাড়াতাড়িই চিঠির উত্তর দিলেন –

"ইসমাইল ঠিকই করেছে। পিতা হিসাবে বর্তমান দুনিয়ার হালচাল এবং ভবিষ্যত সম্পর্কেও তার সকল প্রস্তুতির দায়িত্ব তোমার উপর বর্তেছে। শুধুমাত্র আধুনিক স্কুলের শিক্ষাতেই তা সম্ভব। পুরনো ধরনের মক্তব-মাদ্রাসাগুলো– যেখানে শুধু তোতা পাখির মত কুরআন মুখস্থ করা শেখানো হয়, সেগুলো আজ অনেকখানি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তারা শুধু মুখস্থই করায়– কিন্তু কুরআনের বাণীর তাৎপর্য শেখায় না বা বুঝতে সাহায্য করে না। ফলে তারা আমাদের সন্তানদের আজ এবং কালকের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কিছু শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমার পরামর্শ, ইসমাইলকে এবং রশিদকে বলে তার সন্তানদেরকেও স্কুলে ভর্তি করে দাও। স্কুলের পর তারা মসজিদে কুরআন শিক্ষা করবে। তুমি কুরআনের অর্থ তাদের বুঝিয়ে দিও। অতীতে নয়, বর্তমানে বাস করছ তুমি, এটা মনে রাখতে হবে। তোমাকে প্রগতি এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে। তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। ইসমাইল যে সব প্রশ্ন করেছে তাতে গতানুগতিক চিন্তাধারার অনুসরণের বদলে প্রশ্নের আকারে জানার আগ্রহ ফুটে উঠেছে। তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে সে বড় হবার আগেই তার মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে

২৪.

ইসমাইলের মাদ্রাসা ত্যাগের সপ্তাহখানেক পর রশিদ বাগানের মালিককে অনুরোধ করে তার জন্যেও কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু কাজে ইসমাইলের মন বসেনি। মরুদ্যানে নানা রকম তরি-তরকারির চাষ করা হয়। এগুলোর যত্ন করাই ইসমাইলের কাজ। কিন্তু কাজে তার একান্ত অবহেলা দেখে ক'দিনেই মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আহমদ খলিলকে ব্যাপারটা জানায় রশিদ।

ইসমাইলকে ডাকে আহমদ খলিল। হয় পড়াশোনা অথবা ঠিকমত কাজ করতে হবে বলে তাকে জানিয়ে দেয় সে। নইলে বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়া হবে বলেও হুঁশিয়ার করে দেয়।

ইসমাইল নিজেই তার জন্যে কাজ খুঁজে নিয়েছে। প্রতিবেশী দোকানদারদের মালপত্র বয়ে এনে দোকানে তুলে দেয় সে। বিনিময়ে পয়সা পায়। হজ্বের মওসুম এসে গেলে তার আয়ের খুব চমৎকার একটা পথ খুলে যায়। বিদেশী হাজিদের বিভিন্ন পবিত্র স্থান পরিদর্শনের গাইড হিসেবে কাজ শুরু করে সে। এভাবে মাত্র দু'সপ্তাহেই সে যা রোজগার করে তা আহমদ খলিলের এক মাসের আয়ের চেয়েও বেশি।

আহমদ খলিল ইসমাইলকে ডেকে টাকা চাইতেই রেগে ওঠে সে–

ঃ এ টাকা আমার, আমি আয় করেছি।

আহমদ খলিল তার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়। বলে ঃ এটা হতে পারে না ইসমাইল। শুধু নিজের না, অন্যদের কথাও তোমাকে ভাবতে হবে। টাকাগুলো তুমি বাজে খরচে নষ্ট করে ফেলবে। দেখা যাবে যে আমরা যখন শুধু এক টুকরো রুটি চিবুচ্ছি – তখন তুমি ভালো খাবার বা মিষ্টি খেয়ে টাকাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছ।

ঃ আব্বা! আপনি আমার দিকে দেখুন তো! চেঁচিয়ে বলতে থাকে ইসমাইল – আমার কি কোন ভালো পোশাক আছে না আপনি কোন দিন কোন ভালো পোশাক আমাকে কিনে দিয়েছেন? দেখুনতো, এই ছেঁড়া নোংরা পোশাক পরে রাস্তায় লোকের সামনে বের হতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার।

পিতা সন্তানের মধ্যে কোন সমঝোতা হয় না ।

একদিন রাতে ইসমাইল চুপচাপ বসে একমনে নানা কথা ভাবছিল। হঠাৎ আসমার ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় সে। তার হাতে একটি থালায় কিছু খেজুর এবং ঘরে তৈরি কেক। বলে –

ঃ তোর চাচা সারাদিন কিছুই খায়নি। এই খাবারগুলো তুই ওকে খাইয়ে দে বাবা।

ঃ ঠিক আছে, মা।

আসমা পরম স্নেহে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে ঃ 'আমি জানি তুই খুব লক্ষী ছেলে। এখন খলিফাকে খাইয়ে দে। আমার হাতে অনেক কাজ জমে আছে। আসমা চলে যায়।

খলিফা নিজের মধ্যে বিভোর হয়েছিল। ফলে ইসমাইলের উপস্থিতি একেবারেই টের পায়নি সে। ইসমাইল শান্তভাবে ক'টি খেজুর তুলে নিয়ে তার মুখে পুরে দেয়। খলিফা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। কিন্তু তাকে খেতে দেয়া হচ্ছে এই বোধটুকু জাগামাত্র ক্ষুধার্তের মত হা করে আরো খাবারের জন্যে মুখ এগিয়ে দেয় সে। ঠিক সে মুহূর্তেই খলিফাকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারে ইসমাইল। খলিফা ছিটকে পড়ে মেঝেতে। কিন্তু সে চিৎকার করে না বা কেঁদে ওঠে না। স্থির দৃষ্টিতে ইসমাইলের দিকে চেয়ে থাকে সে – তাতে কোন রাগ বা বিদ্বেষের চিহ্ন নেই, আছে শুধু একরাশ নীরব বিষাদ।

ইসমাইল এই দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার মনে হয়, চোখের দৃষ্টি দিয়েই খলিফা তার অপকর্মের জন্যে তাকে অভিযুক্ত করছে।

ঃ খবরদার আমার দিকে ওভাবে তাকাবে না। চিৎকার করে ওঠে ইসমাইল। সে খলিফার দৃষ্টি থেকে সরে যাবার জন্যে ঘরের অন্য দিকে এগিয়ে যায়। কিন্ত খলিফার চোখ দু'টি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। সেই নির্ণিমেষ চাহনি সহ্য করতে না পেরে অবশেষে দু'হাতে মুখ ঢাকে সে। তবুও ইসমাইল স্পষ্ট অনুভব করে যে খলিফার বিষাদমাখা অকম্পিত দু'টি চোখের দৃষ্টি তার উপর আছড়ে পড়ছে।

ঃ চোখ নামাও, চোখ নামাও বলছি! আবার চিৎকার করে ওঠে ইসমাইল।

একগাদা নোংরা কাপড়ের স্তুপে সাবান মাখার কাজে ব্যস্ত ছিল আসমা। ইসমাইলের উঁচু গলা শুনে ছুটে আসে সে।

ঃ কি ব্যাপার! কি হয়েছে ইসমাইল?

ঃ কিছু না মা, তোমার কাজে যাও তুমি। ইসমাইল নিস্পৃহ গলায় মাকে বিদায় করে।

এসময় হঠাৎ করেই ইসমাইলের মনে হয় – সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। তার চারপাশে সব কিছু দুলতে থাকে। এক গভীর আতংকের মধ্যে কোন দূর থেকে যেন তার কানে ভেসে আসতে থাকে –

সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। তখন প্রত্যেককে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। বলা হবে, আমলনামা' পাঠ করে দেখ।

কিন্তু যার 'আমলনামা' তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি দেওয়া না হত আমার 'আমলনামা' এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার সমাপ্তি হত। আমার ধন সম্পদ আমার কোন কাজেই এলনা। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। তখন ফিরিশতাদের বলা হবে, ধর, তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

সে মহান আল্লাহ্য় "বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহিত করত না....." '

ইসমাইলের ঘুম ভাঙ্গে পরদিন সকালে। গত রাতের ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তার। খলিফার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এবারের বছরটি খুব খারাপ যাচ্ছে। ভালো আবহাওয়া না থাকায় মরুদ্যানে খেজুরের ফলন একেবারেই কম। ফলে আহমদ খলিল ও রশিদের কাজের মজুরির পরিমাণও কমে এসেছে। মালিক এখন আর তাদের আগের মত খেজুর বা শাক-সব্জি দেয় না। কারণ এগুলো বাজারে বিক্রি করে নিজের জন্যে অর্থ আয়ই বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে তার।

আহমদ খলিল এবং রশিদ দু'জনেই বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। তাদের যে আয় তাতে মালিকের কাছ থেকে এ ধরনের দান বা সাহায্য ছাড়া দিন চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে! এমনিতেই বাজারে অন্যান্য জিনিসের মত খাবারের দামও যথেষ্ট চড়া। এক অর্থে তাদের সাধ্যের বাইরে। ফলে খারাপ আবহাওয়ার বছরটি যেন তাদের জন্যে একটা দুঃসময়কেই ডেকে নিয়ে আসে। খাবার কষ্টের দিন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রশিদ এবং আহমদ খলিলের চেহারা কিংবা আচার আচরণ দেখে কারো তা বোঝার উপায় থাকে না।

তবে খলিফার প্রতি যত্নের কোন ত্রুটি হয় না। রশিদ এত কষ্টের মধ্যেও খলিফাকে ঠিকমত খাওয়ানো অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু খলিফার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি চোখে পড়ে না। এখন সে এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, হাঁটা তো দূরের কথা, একা একা বিছানায় উঠে বসার শক্তিও তার নেই। তাই শুধু শুয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ঘরে ফিরেই খলিফাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আহমদ খলিল। তার সারা শরীর নীল হয়ে এসেছে ঠাণ্ডায়। তাড়াতাড়ি করে নিজের গায়ের গরম কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দেয় সে। যত দ্রুত সম্ভব হাত পা ম্যাসেজ করে দিতে থাকে। কিন্তু তাড়াহুড়া করে ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল আহমদ খলিল। তাই খোলা দরজা দিয়ে প্রতিবেশিদের দু'এক জন ভিতরে উঁকি দিতে শুরু করে। খলিফার এই অবস্থা দেখে বাড়ীর তৃতীয় তলার বাসিন্দা বোখারার এক উদ্বাস্তু দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে ভারি একটা কম্বল নিয়ে আসে, জড়িয়ে দেয় খলিফার গায়ে। সমরখন্দ থেকে আসা অন্য এক মুহাজির তার ঘর থেকে একটা গদি ও রাবার শীট নিয়ে আসে। সিনকিয়াং এর এক চীনা মুসলিম নিয়ে আসে একটি বালিশ। এই বিপদ মুহূর্তে কোন ইতস্ততঃ না করে আহমদ খলিল ও রশিদ প্রতিবেশিদের সাহায্যটুকু কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে। খলিফাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকে তারা।

খলিফার সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হোক এটা আহমদ খলিল বা রশিদ কেউই চায়না। তাই কাজ থেকে দু'জনেই ছুটি নিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও খলিফার পাশ থেকে দূরে সরেনা তারা। খলিফা একা থাকবে এবং হয়ত সে মহূর্তেই একটা খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে –এ আশংকায় মসজিদের জামাতে শামিল হওয়াও বাদ দেয় তারা। পরিবর্তে

দু'জনে ঘরেই নামাজ আদায় শুরু করে। কিন্তু এত করেও খলিফার অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। সারাদিনের প্রায় সকল সময়ই তার কাটে অচেতন অবস্থায়। কিছু সময়ের জন্যে সে যখন জেগে থাকে তখন খেতে চায়। একটি পাত্রে কিছুটা দুধের সাথে মধু মিশিয়ে তাকে খেতে দেয়া হয়। কখনো কখনো আরো বেশি চায় সে। কিন্তু দেয়া সম্ভব হয় না আর নেই বলে। ব্যর্থতার এই জ্বালা আহমদ খলিল ও রশিদের বুক থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস বের করে আনে। তারা জানে, এর বেশী কিছু করার সামর্থ তাদের নেই। তারা এও বোঝে যে খলিফার বাঁচারও তেমন আশা নেই। রশিদ তাকে তসবিহ্ এনে দেয়। শুঁয়ে শুয়ে আল্লাহর নাম তিলাওয়াত করে খলিফা।

খলিফা নিথর হয়ে শুয়েছিল। সে জেগে কি ঘুমিয়ে আহমদ খলিল ও রশিদ তা বুঝতে পারেনা। হঠাৎ করে খলিফার চিৎকারে চমকে ওঠে তারা। সে বলছে–

ঃ না, না, তোমরা আমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিও না। তোমাদের দোহাই লাগে। আমি ডাক্তারের কাছে যাব না এখান। থেকে আর কোথাও যাবনা আমি। তার গলায় গভীর আকুলতা ঝরে পড়ে।

ঃ না, না, তোমাকে কোথাও পাঠাবো না আমরা – আহমদ খলিল ভাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে– তুমি আমাদের সাথেই থাকবে, এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও।

দুজনে খলিফার কাছে নীরবে বসে থাকে অনেক সময়। সূর্য ডুবে যায়, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। কিন্ত কোন আলো জ্বলে ওঠে না। ঘরে কেরোসিন নেই, কেনার মত পয়সাও নেই। রাত গভীর থেকে ক্রমশঃ গভীরতর হতে থাকে। আহমদ খলিল ও রশিদ বসে থাকে ঘুমহীন চোখে।

এক সময় রাত শেষ হয়। ভোরের আভাস দেখা দেয়। খলিফা জেগে ওঠে আহমদ খলিলের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে শোনানোর অনুরোধ করে সে।

অবাক হয় আহমদ খলিল। বলে–

ঃ আমার কাছে তো কোরআন শরীফ নেই। ঠিক আছে, যতটুকু মনে আছে পড়ে করে শোনাচ্ছি। শোন ঃ

"যখন তাদের বলা হয়, যা তোমাদের সামনে ও তোমাদের পিছনে আছে সে সম্পর্কে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার।

আর যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর, তখন কাফিররা মুমিনদের বলে, 'যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আহার করাতে পারতেন আমরা কেন তাদের আহার করাবো ?

তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

তারা বলে , তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে

বল, তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা তাদের আঘাত করবে তাদের বাক- বিতন্ডাকালে............

যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন তারা কবর হতে উথিত হয়ে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের। কে আমাদের নিজেদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল?

সে হবে কেবল এক মহানাদ: তখনি তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।

আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

এদিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে...... পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম'। আর হে অপরাধিগণ! তোমরা পৃথক হয়ে যাও। এ সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

আমি আজ তাদের মুখ মোহর করে দেব। তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং পদযুগল সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

মানুষ কি দেখেনা আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে বিতন্ডাকারী!

সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে?

বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ।

তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে যায়।

অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

পাঠ শেষ হওয়ার পর আহমদ খলিল ভাইয়ের মাথাটি তার দু'হাতে তুলে ধরে। তার মনে হয়, এক বোঝা খেজুরের পাতাও বোধ হয় খলিফার চেয়ে ওজনে বেশি ভারি হবে। তার শরীরের কোথাও মাংস নেই বললেই চলে। শুধু ফ্যাকাশে চামড়া দেহের হাড়গুলো ঢেকে রেখেছে।

ঃ আমাকে একটা মিসওয়াক দাও-ক্ষীণ কণ্ঠে বলে খলিফা।

আহমদ খলিল ঘরের কোণে রাখা খেজুরের ডালের গোছা থেকে তার জন্যে একটি মিসওয়াক তৈরি করে। খলিফার কষ্ট হবে মনে করে একদিক থেঁতলে নরম করে দেয় সে। খলিফা দুর্বল হাতে কোন রকমে দাঁত মাজন করে।

সহসা ভাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে খলিফা–

ঃ আচ্ছা, আমি মারা যাওয়ার পর তুমি ও রশিদ আমার সাথে আসবে তো?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই!

ঃ কতদিন পর?

ঃ যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয়। তবে আমার মনে হয়, খুব তাড়াতাড়িই আমরা তোমার সাথে মিলিত হব এবং তখন আর কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। যাই হোক, এখন তুমি একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর– ভালো বোধ করবে।

কিছুক্ষণ পর আহমদ খলিলের একেবারে গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে খলিফা। তার কোমল মৃদু নিঃশ্বাসের স্পর্শ পায় সে। আরো কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে খলিফা তাকায় ভাইয়ের দিকে––নিষ্পলক সে চাহনি! আহমদ খলিল খলিফার চোখে চেয়ে থাকতে পারে না, মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। কিছু সময় পর আবার ফিরে তাকায়। খলিফার দৃষ্টি তখনো তার দিকেই নিবদ্ধ দেখতে পায় সে। কিন্তু ইতোমধ্যেই হালকা দুধ-সাদা রং একটা পর্দা যেন কে বিছিয়ে দিয়েছে সেই চোখে।

আহমদ খলিল খলিফাকে সোজা করে শুইয়ে দেয়। পরম যত্ন ও স্নেহে তার চোখের পাতা বন্ধ করে। সে লক্ষ্য করে, বয়সের হিসেবে এবার মাত্র বাইশে পড়েছিল খলিফা। কিন্তু মৃত্যুর আগেও যেমন ছিল মৃত্যুর পরও তার চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে সেই নিষ্পাপ শিশুর সারল্য।

২৫.

আহমদ খলিল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গভীর বিষাদ এবং একাকীত্ববোধ তাকে ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। তার মনে হয়, একমাত্র রশিদ ছাড়া এই বৈরী পৃথিবীতে আপন বলে কেউ নেই তার। খুব হতাশ বোধ করে সে।

ইসমাইলের ব্যাপারটি তার জন্যে আরো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। স্ত্রী আসমার গর্ভে এ পর্যন্ত আটটি সন্তান এসেছে। কিন্তু একমাত্র ইসমাইল ছাড়া তার আর সবকটি সন্তানই শিশু অবস্থায় মারা গেছে। তাই ইসমাইলই আসমা বা তার একমাত্র আশা-ভরসা। অথচ আহমদ খলিলের মনে হয়, ইসমাইল তার কাছে একজন আগন্তুক বই নয়। সে যে পৃথিবীতে বাস করে–ইসমাইলের বাস সে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, যদিও এখন পর্যন্ত একই ঘরে বাস করছে তারা। তার মনে হয়, তবে কি পিতা হিসেবে তার ব্যর্থতা কিংবা বিরাট কোন ভুলের জন্যেই তার একমাত্র সন্তানটি এ রকম হয়ে গেল? অতীত হাতড়ে ফেরে সে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও এমন কোন ভুল খুঁজে পায় না সে। বারবার তার মনে প্রশ্ন জাগে–কেন, কেন এমন হলো ইসমাইল, তাদের দু'জনের মধ্যে আজ এত বেশি পার্থক্য যে ইসমাইলকে নিজের পুত্র বলে ভাবতেও কষ্ট হয় তার। আসলে এরকম একটা সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই যেন ভালো ছিল।

ইসমাইল নির্মম, স্বার্থপর, লোভী, হিংসুক। সকল রকম খারাপ গুণের প্রকাশ ঘটেছে তার স্বভাব ও চরিত্রে। কারো দুঃখ দুর্দশায় তার কোন সহানভূতি নেই। কারো প্রতি কোন সম্মান বা শ্রদ্ধাও নেই তার। ভালো বা মন্দ নিয়ে তার কোন বাছ-বিচারও নেই। তার যা ইচ্ছে সে তাই করে, কারো খুশি বা অখুশিতে তার কিছুই যায় আসে না। ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে না সে, কোন অপরাধ বা ক্ষতিকর কাজ করলে কোন গ্লানি বা অনুশোচনা তার মধ্যে দেখা যায় না। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেও কারো লাভ নেই। কারণ, কোনক্রমেই নিজের দোষ স্বীকার করে না সে। বহু চেষ্টা করেও আহমদ খলিল ছেলের স্বভাব সংশোধন করতে পারে না।

রাতের আঁধার যখন ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসে, সমস্ত কল-কোলাহল থেমে গিয়ে নেমে আসে অটুট-অটল নীরবতা, আহমদ খলিল তখন জায়নামায বিছিয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে। আর একটি সন্তানের জন্যে আল্লাহর কাছে ব্যাকুলভাবে আর্তি জানায় সে।

কিন্তু তার আর্জি পূরণ হয় না।

একদিন এশার নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিল আহমদ খলিল। একটি বালককে দেখতে পায় সে। মসজিদের বারান্দায় পিলারের গোড়ায় খালি মেঝেতে সে শুয়ে আছে। এর আগে বহুদিন তাকে এখানে দেখলেও কোন কৌতূহল জাগেনি তার

মনে। কিন্তু আজ কি মনে করে বালকটির দিকে সে এগিয়ে যায়। কাছে পৌঁছতেই বালকটি ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে এবং কাঁদতে শুরু করে। পকেট থেকে একমুঠো খেজুর বের করে তার হাতে দেয় আহমদ খলিল। কান্না থেমে যায় তার। আহমদ খলিল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে--ছেলেটি অন্ধ।

ঃ কে আপনি? ছেলেটি জানতে চায়।

ঃ তোমার বন্ধু। আহমদ খলিল উত্তর দেয়।

ঃ আচ্ছা আপনি কি বলতে পারেন, আমার আব্বা-আম্মাকে কোথায় খুঁজে পাব?

ঃ ইনশাআল্লাহ, কাল সকালে উঠেই তাদের খোঁজ শুরু করব আমরা। এখন তুমি আমার সাথে চল, কেমন?

ছেলেটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে সে। তার নাম আবদুর রাজিক।

পরের কয়েকটি সপ্তাহ মদিনার অলি-গলিতে তন্ন তন্ন করে ছেলেটির পিতা-মাতাকে খুঁজে বেড়ায় আহমদ খলিল। কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

একদিন মসজিদের বৃদ্ধ ইমাম ডেকে পাঠান আহমদ খলিলকে। বলেন–

ঃ ছেলেটার ব্যাপারে অনেক আগেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এর মাঝে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার জন্যে মক্কা চলে যাওয়ায় আর কিছু বলা হয়নি। ফিরে এসেই শুনলাম, আবদুর রাজিককে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছ তুমি। অবশ্য তোমার বন্ধুরাই আমাকে জানিয়েছে তা।

ঃ আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, তার আব্বা-আম্মাকে আমি কোথায় পাব? গত কয়েকদিনে বহু খুঁজেছি আমি। কিন্তু পাইনি। আহমদ খলিল বলে।

ঃ আমি যদি সে সময় এখানে থাকতাম তবে ব্যাপারটা তোমাকে জানাতে পারতাম। এক বেদুইন গোত্রে আবদুর রাজিকের জন্ম। মরুভূমিতে এক ধরনের চক্ষুরোগ হয়। এতে দু'চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়। আবদুর রাজিকেরও তাই হয়েছে। বেদুইনরা যাযাবর জাতি। কোথাও স্থির হয়ে দিন কাটানো তাদের স্বভাবে নেই। এই চলমান জীবনে আবদুর রাজিক তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, গত বছর হজ্জ করতে এসে ছেলেটিকে এখানে ফেলে আবার মরুভূমিতে ফিরে গেছে তারা। আমরা দেখাশোনা না করলে এতদিন না খেয়েই হয়ত মারা যেত সে। তার নামও বদলে দেয়া হয়েছে। কারণ বেদুইনরা সাধারণতঃ তাদের সন্তানদের ইসলামী নাম রাখে না। আবদুর রাজিকের আসল নামও হয়ত অন্য কিছু ছিল। আমরা সেটা তাকে জিজ্ঞেস করিনি বা প্রয়োজনও বোধ করিনি। যাহোক, আবদুর রাজিকের ধারণা–সে হারিয়ে গেছে এবং তার পিতামাতা তাকে এখনো খুঁজে ফিরছে। কিন্তু আমরা তাকে সত্যি কথাটা এখনো বলতে পারিনি ..।

ইমাম সাহেবের কাছে কথাগুলো শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আহমদ খলিল। ছেলেটিকে দত্তক নেবে সে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই সে আবদুর রাজিকের প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার মনে হয়, কোন ঐশী ক্ষমতাবলে যদি তার পিতা-মাতা ফিরে এসে তাকে দাবী করেও তবু তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব

হবে না। যে পিতা-মাতা আপন সন্তানকে এ রকম নিষ্ঠুরভাবে পথে ফেলে যেতে পারে–তাদের প্রতি ঘৃণায় তার মন বিষিয়ে ওঠে।

দিন কেটে যেতে থাকে। আসমা এবং মায়মুনা আবদুর রাজিককে নিজের সন্তানের মতই ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু ইসমাইল তার আচার-আচরণে আবদুর রাজিকের প্রতি তার অপছন্দের কথা প্রকাশ করতে মোটেই ইতস্ততঃ করে না। আহমদ খলিল ইসমাইলের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসে, এটা তার কাছে একেবারেই অসহ্য মনে হয়। ক্ষিপ্ত এবং হিংস্র হয়ে ওঠে সে। মনে মনে আবদুর রাজিককে জব্দ করার পথ খুঁজতে থাকে।

ইসমাইল বাসায় থাকা অবস্থায় আবদুর রাজিককে যারপর নাই উত্ত্যক্ত করে বলে আহমদ খলিল কাজে যাবার সময় তাকে সাথে করে নিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করে সে। অন্ধ হলেও কোন গাছ ছুঁয়ে বা তার পাতা নেড়ে দেখে এবং কোন ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে খুব আনন্দিত হয়ে ওঠে সে। তার জীবন কেটেছে মরুভূমিতে। তাই, এই গাছপালার সমারোহ ভরা বাগান তার কাছে যেন বেহেশতের স্বাদ বয়ে আনে। এক গুচ্ছ সবুজ পাতার মধ্যে সে মুখ ডুবিয়ে দেয় অপার আনন্দে। তার আঙ্গুলগুলো পাতার গায়ে অদ্ভুত মমতায় খেলা করে। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে অবাক হয় আহমদ খলিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাতা স্পর্শ করে ও ঘ্রাণের সাহায্যে গাছ চেনার কায়দা শিখিয়ে দেয় তাকে।

বছর খানেক কেটে যায়। আহমদ খলিলের মনে হয়, আবদুর রাজিককে এখন স্কুলে পাঠানো উচিত। প্রত্যেক দিন কাজ থেকে ফেরার পর তাকে নিয়ে সে লাইব্রেরীতে যেতে শুরু করে। বিভিন্ন বই থেকে বাছাই করা অংশগুলো সে জোরে জোরে তাকে পড়ে শোনায়। আবদুর রাজিকের জন্যে লাইব্রেরীতে ব্রেইলী পদ্ধতিতে পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে পড়তে বা লিখতে না পারলেও শুধু শুনেই পবিত্র কুরআনের বহু অংশ এবং বেশ কিছু কবিতা মুখস্থ করে ফেলে সে। এই গুণের কারণেই তার স্কুলে ভর্তি হওয়া খুব সহজ হয়ে যায়।

এর কয়েকদিন পর আবদুর রাজিকের মাদ্রাসার শিক্ষক আহমদ খলিলকে ডেকে পাঠান। দেরি না করে তার সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হয় সে। তাকে দেখে খুশি গলায় বলতে থাকেন তিনি–

ঃ আবদুর রাজিক সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। তা এ কারণে যে, এখানকার সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের মধ্যে সে নিজেকে অন্যতম বলে প্রমাণ করেছে। আপনিতো জানেন, এ মাদ্রাসাটি মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত। সেখান থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই একজন অধ্যাপক আসছেন। আপনি সম্মতি জানালে তিনি আবদুর রাজিকের একটি মৌখিক পরীক্ষা নেবেন। আমরা ধারণা, সে এতে পাশ করবে। আর তাহলে সে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে বৃত্তি পাবে। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন কি করবেন।

আহমদ খলিল তার কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলে–

ঃ এ ব্যাপারে আমার কোনই আপত্তি নেই। আপনি যা ভালো মনে করেন– তাই হবে।

আবদুর রাজিক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছে। আহমদ খলিল তার কায়রো যাত্রার গোছগাছ করায় ব্যস্ত। বলা যায়, তার জীবনে সবচাইতে আনন্দের সময় এটি। আবদুর রহমান এবং ইনামুল্লাহ্ আবদুর রাজিকের জন্যে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কয়েক জোড়া জামা-কাপড় নিয়ে দিয়েছেন। আসমা এবং মায়মুনা সেগুলো ধুয়ে, সেলাই করে ব্যবহারোপযোগী করে তুলেছে।

পোশাকগুলো পুরনো হলেও আবদুর রাজিকের মনে কোন দ্বিধা নেই। কারণ সে জানে, যে সব ছেলে বৃত্তি পেয়েছে তারাও এ ধরনের পোশাকই নিয়ে যাচ্ছে। কারণ শুধু মাত্র গরীব বা সহায় সম্বলহীন অথচ মেধাবী ছেলেদেরই এ বৃত্তি দেয়া হয়। ইনামুল্লাহ্র ১৩ বছরের ছেলে করিমও এই বৃত্তি পেয়েছে। অন্ধ আবদুর রাজিকের দেখা শোনা করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়।

যাত্রার আগের দিন আনন্দ ও উত্তেজনায় আবদুর রাজিক সারারাত ঘুমাতে পারে না। কিছু সময় পরপরই আহমদ খলিলের বাহু স্পর্শ করে যাত্রার সময় হয়েছে কিনা জানতে চায় সে।

সকাল বেলা ছেলেকে নিয়ে হাজির হন ইনামুল্লাহ্। নিজ নিজ লটবহর নিয়ে তারা বাস স্টেশনের দিকে রওনা হয়। আহমদ খলিল আবদুর রাজিককে আলিঙ্গন করে অনেকক্ষণ তাকে বুকের মধ্যে ধরে রাখে। এই বিদায় বেলা তাকে ঘিরেই তার সত্যিকারের অপত্য স্নেহ উথলে ওঠে। এটা সেটা উপদেশ দেওয়ার পর সে বলে–

ঃ বেটা, পড়াশোনায় কোন গাফলতি কর না। সব কিছু শেখার চেষ্টা কর। ইনশাআল্লাহ্ তুমি একজন বড় বিদ্বান হতে পারবে।

আবদুর রাজিক জবাবে কিছু বলতে পারে না। বিপুল আবেগে কিছু বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সে। অবশেষে বাস এসে গেলে সে ও করিম তাতে উঠে বসে।

বাস ছেড়ে দিতেই একটি প্রচণ্ড শূন্যতা বোধ আহমদ খলিলের বুকে ধাক্কা দেয়। আবদুর রাজিকের অবর্তমানে সে যে কি ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে, সে কথা ভেবে মন অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে ওঠে। সে জানে, তার পড়াশোনা শেষ হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। এর মধ্যে শুধু মাত্র বছরে একবার, রমজান মাসে বাড়ি আসার অনুমতি পাবে সে। বড় দীর্ঘ সময়, আহমদ খলিল ভাবে। তবে একই সাথে মনের মধ্যে খুশির একটা অনুরণন উপলব্ধি করে। বাসটি দূর দিগন্তে অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে।

২৬.

রশিদের ছেলেরা ফিলিস্তিনি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এর পিছনে কিছু কারণ ছিল। একেবারে শিশুকাল থেকেই রশিদ তার ছেলেদেরকে বারংবার ফিলিস্তিনের ইতিহাস শোনাত। সে তাদের শোনাত তার ছোট বেলায় শোনা সকল কাহিনী, ইরাক আল-মানশিয়া, নেগবার কথা এবং যে যুদ্ধের ফলে তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে উৎখাত হতে হয়েছে তার কথা। সে ফিলিস্তিনের একটি বিশাল ম্যাপও সংগ্রহ করেছে। এটা ঝুলিয়ে রাখা আছে ঘরের দেয়ালের সাথে। এই ম্যাপে শুধু গুরুত্বপূর্ণ আরব নগর ও শহরই নয়, প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা রয়েছে। তবে এখন আর সেগুলোর চিহ্নও নেই। যুদ্ধের পর ইহুদীরা গ্রামগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত বসতি গড়ে তুলেছে। রশিদ এই ম্যাপে ইরাক আল-মানশিয়ার নামের নীচে লাল কালির দাগ দিয়ে রেখেছে। সে লেখাপড়া জানেনা ঠিকই, কিন্তু তার চেনা জায়গগুলো চট্ করেই দেখিয়ে দিতে পারে।

রশিদের ছেলেদের কেউই লেখাপড়া জানেনা। অবশ্য তারা কুরআন ও হাদীসের অনেক অংশ মুখস্থ করেছে। কিন্তু স্কুলে লেখা-পড়া করার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল শুধু যুদ্ধে। রশিদ তাই তাদেরকে যুদ্ধের ইতিহাস শোনাত। যৌবনে ফেদাইনদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার সময় নাহল মিদবারের ইহুদীদের কাছে সে কিভাবে ত্রাস হয়ে উঠেছিল, ছেলেদের সে গল্প শুনিয়েছে রশিদ। সে বলে, এখনকার গেরিলারা তাদের সময়ের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, বেপরোয়া এবং সুসংগঠিত। যাই হোক, রশিদ জানায় যে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে ছেলেরা যদি অংশগ্রহণ করে রশিদ তাকে নিজেরই অংশগ্রহণ মনে করে সান্ত্বনা লাভ করবে।

তবে শিগগিরই তারা জানতে পারে যে অধিকাংশ গেরিলা গ্রুপই মার্কসের সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের ধ্যান ধারণায় দীক্ষা নিয়েছে। রাশিয়া ও চীন থেকে পালিয়ে আসা তুর্কিস্তানী মুসলিম প্রতিবেশীদের কাছে কম্যুনিজমের স্বরূপ সম্পর্কে রশিদ ও তার ছেলেরা অনেক কিছুই শুনেছে। লেখাপড়া জানেনা বলে তারা খবরের কাগজ পড়তে পারে না। তাই ফিলিস্তিন সম্পর্কে রেডিও স্টেশনের খবর ও মন্তব্য শোনার জন্যে প্রায়ই কাছের কফিখানায় যেত তারা। অবশেষে আব্বা-মা সহ আত্মীয় স্বজনদের বিদায় জানিয়ে একদিন তারা আম্মানের পথে রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে ইখওয়ানুল মুসলেমুন প্রভাবিত গেরিলা দলে যোগ দেয় তারা।.

জন্মভূমির কথা মনে হলেই আহমদ খলিলের মন এক অবর্ণনীয় ব্যথায় ছেয়ে যায়। সে লক্ষ্য করে, আজ এতদিন হল সে ইরাক আল মানশিয়া ছেড়ে এসেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি তার। তার সন্তান ফিলিস্তিনের নাম শুনেছে, কিন্তু কখনো চোখে দেখেনি। এ প্রসঙ্গ যখনি মনে হয় তখনি ইসমাইলের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

একদিন ছেলেকে ডাকে সে। বলে--

ঃ আচ্ছা ইসমাইল! তুই তো শুনেছিস যে ইহুদীরা প্রতিদিনই একের পর এক আমাদের এলাকাগুলো দখল করে নিচ্ছে। তারা অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। এমন কি তারা জেরুজালেমের মসজিদ এবং হেবরনে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মসজিদটিও দখল করে নিয়েছে। এখন তারা সেগুলোকে নাকি সিনাগগে (ইহুদীদের উপাসনালয়) পরিণত করতে চাইছে। মুসলমানদের সেখানে নামাজ আদায়ও তারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তারা আগামীতে মক্কা ও মদীনায় হামলা চালাতে তেলআবিব থেকে যে জঙ্গী বিমান পাঠাবে না তা কে বলতে বলতে পারে? এরপরও কি তুই গেরিলা দলে যোগ দিবি না?

ইসমাইল কাঁধ ঝাঁকায়। বলে–

ঃ আচ্ছা, আপনি কি এসব কথা বাদ দিতে পারেন না?

ঃ তা হলে তুই কি করতে চাস, বল।

ঃ আমি চাকরির খোঁজে জেদ্দা যেতে চাই। এখানে তো আমার করার কিছু নেই। এ ধরনের প্রাণচাঞ্চল্যহীন, নিভৃত স্থানে পড়ে থাকতে আমার মন চায় না। আসলে গোরস্থানের জন্যেই জায়গাটা উপযুক্ত।

আহমদ খলিল একথা শুনে গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে–

ঃ ইসমাইল, তুমি এখন আর ছোট নও। তোমার ভালো কিসে হয় সে চিন্তা তুমিই করবে।

ঃ রফিক আর আমি জেদ্দা যাব। সেখানে চাকুরি খুঁজব। ইসমাইল বলে।

খলিফার ছেলে রফিক এখন বেশ বড় হয়েছে। ইসমাইলের সাথে তার খুব মিল। আহমদ খলিল আর কোন কথা বলে না।

ইসমাইল চিঠি লিখেছে। সে ও রফিক জেদ্দায় মার্কিন মালিকানাধীন কোকাকোলা কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। কিছু টাকাও পাঠিয়েছে সে। টাকার পরিমাণ দেখে আহমদ খলিল বিস্মিত হয়। এর আগে সে এত টাকা এক সাথে কখনো দেখেনি কিংবা নিজে উপার্জনও করেনি।

কোন সন্দেহ নেই, ইসমাইল ও রফিক একমাসে যা পায় তা তার সারা বছরের রোজগারের সমান। এ টাকা থেকে সে কিছু ভালো খাবার কিনে আনে। আসমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন পোশাক এবং এক জোড়া চামড়ার তৈরি স্যান্ডেলও নিয়ে আসে। এ সময় কায়রোতে পড়া-শোনা করতে থাকা আবদুর রাজিকের কথা মনে হয় তার। বাকি টাকাগুলো তাকে পাঠাতে মনস্থ করে সে। পরে মালেক ওহাবের কাছে ইসমাইল ও রফিকের চাকুরি পাওয়া ও টাকা পাঠানোর খবর দিয়ে চিঠি লিখতে বসে সে।

ছেলেরা ফেদাইনদের সাথে যোগ দেয়ার পর থেকে রশিদের কাছে চিঠি লেখে। কোন চিঠি এলেই রশিদ তা আহমদ খলিলের কাছে নিয়ে যায়। সে জোরে জোরে সবাইকে চিঠি পড়ে শোনায়। চিঠিগুলো পড়ে সে খুব আগ্রহ বোধ করে। রশিদের ছেলেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নেয়ার কথাও এতে লেখে। আহমদ খলিল তা পড়ে শোনাতে গিয়ে নিজেও শিহরণবোধ করে।

একদিন শহরের দৈনিক কাগজটির ওপর চোখ বুলাচ্ছিল আহমদ খলিল। হঠাৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথাই ফোটেনা। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় রশিদের ছেলেদের গ্রুপ ফটো ছাপা হয়েছে। ইসরাইলে সাফল্যের সাথে একটি অভিযান শেষ করে নিজেদের শিবিরে ফিরে এসেছে তারা। তারপরই ছবিটি তোলা হয়েছে। পত্রিকাটি কিনে নিয়ে বাড়ির দিকে ছোটে সে। রশিদ ঘরেই ছিল। তাকে ছবিটা দেখিয়ে সংবাদটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে শোনায়। রশিদের বুকটা পর্বে ভরে ওঠে। পলকহীন চোখে সে পূর্ণ যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত, মেশিনগান কাঁধে, মাথায় কাফিয়াহ্ জড়ানো ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে দেখে তার আশা যেন আর মিটতে চায় না।

সময় বয়ে চলে। ফিলিস্তিনের মুক্তির যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। এর মাঝে তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজের পাতাগুলো এখন যুদ্ধের নানা খবর ও ঘটনায় পূর্ণ। ইসরাইলীরা গাজা দখল করে নিয়েছে। আহমদ খলিল তার আব্বার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে ওঠে। অবিলম্বেই তার এ চিন্তা দুশ্চিন্তায় রূপ নেয়। কারণ কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে যাবার পরও মালেক ওহাবের কোন চিঠি তার কাছে আসেনি। প্রতিদিন সে ডাক পিয়নের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ঠিকই আসে—কিন্তু আহমদ খলিলের জন্যে কোন চিঠি আসে না। হতাশ আহমদ খলিল আব্বার এ যাবতকালের লেখা চিঠিগুলো সযত্নে নাড়াচাড়া করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। মদীনায় আসার পর গত পঁচিশ বছরে এই প্রথম উপর্যুপরি কয়েক মাস মালেক ওহাবের চিঠি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হল সে।

চার মাসের নীরবতার পর অবশেষে মালেক ওহাবের চিঠি আসে। সে চিঠি সেন্সর করা। তবু তা থেকে গাজার অবস্থাটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে আহমদ খলিলের চোখের সামনে। গাজা এখন একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জুড়ে কারফিউ, মধ্যরাতে ঘরে ঘরে তল্লাশী, গেরিলাদের আশ্রয় কেন্দ্র সন্দেহে বাড়ি-ঘর বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া, নির্বিচার গ্রেফতার, বন্দীদশা, নির্যাতন এবং যখন যাকে খুশি গুলি করে হত্যা করা এখন গাজার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ইহুদীরা স্কুলে প্রচলিত পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে। তার বদলে তারা চালু করেছে তেলআবিবের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম। ফলে মালেক ওহাব এখন ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে যতটুকু সম্ভব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

মালেক ওহাবের অসহায়ত্বের কথা ভেবে আহমদ খলিলের মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। অনেক ব্যাপারেই মালেক ওহাবের সাথে তার মতের মিল ছিল না। কিন্তু রক্তের টান যাবে কোথায়? তারা আজ বিতাড়িত, ভিন্ন দুটি স্থানের বাসিন্দা। দু'জনের মধ্যে অদেখায় পার হয়ে গেছে দীর্ঘ দুটি যুগ। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় তো তাদের রক্তের বন্ধন এবং হৃদয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। সে ব্যাকুল হয়ে বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই সীমান্ত পেরিয়ে মালেক ওহাবকে মদিনা চলে আসার জন্য চিঠি লেখে। জীবনের বাকী দিনগুলো একসাথে কাটানোর উদগ্র আকাঙ্ক্ষার কথাও চিঠিতে ব্যক্ত করে সে। তার মনে হয়, মালেক ওহাব এবার নিশ্চয়ই মদিনায় চলে আসবেন।

মালেক ওহাবের উত্তর আসে। সে চিঠি পড়ে হতাশ হয় আহমদ খলিল। তিনি লিখেছেন, স্কুলটাকে চালু রাখা এবং ছেলেমেয়েদের যতটা সম্ভব রক্ষা করা তার কর্তব্য। এই কর্তব্য ফেলে তিনি যেতে পারেন না।

এরপর আরো ছয়মাস কেটে যায়। আব্বার কাছ থেকে আর কোন চিঠি আহমদ খলিল পায়নি। হঠাৎ একদিন একটি চিঠি এসে হাজির। সীলমোহর লক্ষ্য করেই এক অজানা আশংকায় তার বুক কেঁপে ওঠে। চিঠিটা গাজা থেকে নয়, আম্মান থেকে পাঠানো হয়েছে। শরীর কাঁপতে থাকে তার। তড়িঘড়ি করে চিঠিটা খুলে ফেলে সে। এ চিঠি লিখেছেন মনসুর। কয়েকটি লাইন পড়ার পরই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

মনসুর লিখেছেন ঃ

"আম্মানের রাস্তায় পেশাদার চিঠি লেখকদের দিয়ে এ চিঠি লিখছি। কারণ আমি নিজে লিখতে জানিনা।

ইহুদী দখলে আসার পর থেকে গাজার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। গেরিলাদের গুপ্ত হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ইসরাইলী সৈন্যরা গ্রাম ও স্কুলগুলোর উপর নাপাম বোমা ফেলতে শুরু করে। তোমার আব্বার স্কুলের উপরও একটি বোমা পড়ে। বহু ছেলেমেয়ে তাতে মারা যায়। অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মালেক ওহাবকে বার বার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল যে তিনি যদি ইহুদীদের নির্দেশমত স্কুলে না পড়ান তবে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাই হোক, তিনি শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু শিবির ত্যাগ করার বিশেষ অনুমতি লাভ করেন এবং স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে শহরে যান। ফেরার পথে প্রধান রাস্তাটি পার হওয়ার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাতাল ইহুদী সৈন্য বোঝাই একটি জিপ তাকে ধাক্কা দেয়। তিনি সাথে সাথেই ইন্তেকাল করেন। আমি তার সাথে ছিলাম। এই হত্যার প্রতিবাদ জানাতেই সৈন্যরা এসে আমাকে পেটায়। তারা আমার ঘর তল্লাশি করে অস্ত্রের খোঁজে। তবে কিছুই পায়নি। এরপর শুধু মাত্র আল্লাহর করুণা এবং আমার বন্ধুদের সাহায্যে আমি পালিয়ে জর্দানে চলে আসি। এখন আমি একেবারেই বৃদ্ধ, একা। কাজ করে খাবারও শক্তি নেই। আমি জানিনা, আমার ভাগ্যে কি আছে ... ...।"

আহমদ খলিল আর দেরি না করে ইসমাইলের সর্বশেষ পাঠানো টাকা মনসুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তবে মনে হয়, আব্বাকে সে হারিয়েছে। মনসুর এখন না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরবেন। তার চেয়ে তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসা ভালো।

কিছুদিনের মধ্যেই মনসুর মদিনায় এসে হাজির হন। বয়সের ভারে ন্যুব্জপ্রায় চাচাকে দেখে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারেনা আহমদ খলিল। দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে।

২৮.

ইসমাইল এখন নিয়মিতভাবে টাকা পাঠায়। সত্যি বলতে কি, আহমদ খলিল তার জীবনে এই প্রথম স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে। জীবনে সাধ অনুযায়ী খাবার সৌভাগ্য তার কখনো হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় এখন তার যা খুশি, মন যা চায়, তাই সে খেতে পারে। কিন্তু সেদিকে এখন আর তার কোন লোভ নেই। বয়স হয়ে গেছে। আগের মত পরিশ্রম করতে পারে না। অল্পতেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর বেশ কিছু দিন থেকে বিকেলে জ্বর আসছে। রাতে কাশির উপদ্রব। তবুও কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকতে পারে না।

একটু আগেই কাজে এসেছে আহমদ খলিল। বাগানের গাছগুলোর যত্ন নিতে নিতে হঠাৎ করেই খুব অবসন্ন লাগে তার। কাজ রেখে কাছে মসজিদের দিকে চলতে শুরু করে। এ সময়টায় মসজিদে একেবারে ফাঁকা থাকে। সুতরাং নিরিবিলি একটু বিশ্রাম নেয়া যাবে বলে সে ভাবে। কিন্তু মসজিদে পৌঁছে তার মনে হয় মাথায় মধ্যে সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ে সে।

কতক্ষণ কেটে গেছে আহমদ খলিল জানেনা। জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুভব করে একজোড়া কোমল হাত থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। চোখ খুলে তাকায়। রাত নেমে এসেছে। তবে সঠিক সময় সে বুঝতে পারে না। সারা দিন কি তাহলে এখানেই কেটেছে? নিজেকে প্রশ্ন করে। এ সময়ই আসমাকে দেখতে পায় সে। একরাশ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে আসমা চেয়ে আছে তার দিকে।

আরো একটু সময় কেটে যায়। অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে আসমাই প্রথমে কথা বলে--

ঃ তোমার শরীর এত দুর্বল, তা আমি বুঝতে পারিনি। চল, ঘরে চল। কয়েকদিন পুরো বিশ্রাম নেবে তুমি।

আসমা তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে। আহমদ খলিল শরীরের অবশিষ্ট শক্তিতে নির্ভর করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আসমার কাঁধে ভর করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ইসমাইল। অসুস্থ আহমদ খলিল শুয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে তার মুখেও ফুটে উঠেছে উদ্বেগ ও আশংকা। নিজেকে এ-বাড়ীর এক আগন্তুক বলে মনে হয় তার। গত তিন বছরের মধ্যে একবারও বাড়ি আসেনি সে। জেদ্দায় জীবনের ভিন্নতর অর্থ খুঁজে পেয়েছে। সত্যি বলতে কি, জীবন যে এত সুন্দর, বিশাল এবং উপভোগ্য হতে পারে–এ বাড়িতে থাকাকালে ইসমাইল কখনোই তা বুঝে উঠতে

পারে নি। এই মুক্তির স্বাদই তাকে বাড়ির দিকে ফিরতে বাধা দিয়েছে এতদিন। একথা ঠিক, অত্যন্ত জরুরী খবর না হলে সে আসত না।

আহমদ খলিলের মারাত্মক অসুস্থতার খবর দিয়ে আবদুর রহমান টেলিগ্রাম করেছিলেন ইসমাইলকে। সাথে সাথেই চলে এসেছে ইসমাইল। তবে আসার আগে জেদ্দার এক ডাক্তারের সাথে কথা বলে এসেছে সে। তাদের কোম্পানির ডাক্তার। আহমদ খলিলকে নিয়ে গেলেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি ইসমাইলকে কথা দিয়েছেন।

অবশেষে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ইসমাইল ধীরে ধীরে আহমদ খলিলের কাছে গিয়ে বসে।

আহমদ খলিল চোখ খুলে তাকায়। মার্কিনীদের মত পোশাক পরা ইসমাইলকে চিনতে তার যেন খুব কষ্ট হয়। বলে--

ঃ ইসমাইল! তুমি এখন আমেরিকানদের কোম্পানিতে কাজ করছ। পোষাক-আশাকও তাদেরই মত। এখন তোমাকে দেখতেও তো তাদের মতই মনে হচ্ছে।

ঃ আমরা কারখানায় এরকম পোশাকই পরে থাকি আব্বা- ইসমাইল জানায়। নিজেদের পোষাক পরে কারখানায় ঢোকা নিষেধ। কারণ, ঢিলে-ঢালা জোব্বা যে কোন সময় মেশিনের সাথে জড়িয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সে যাক। আমি যে টাকা পাঠিয়েছি তা আপনি কি করেছেন?

ঃ আমি তার সবই আবদুর রাজিককে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ, আমি চাইনি তার পড়াশোনায় বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোক।

কথাটা শুনে ইসমাইল নীরব হয়ে যায়। এই পালিত ভাইটিকে সে সহ্যই করতে পারে না। সে জানে, তার আব্বা আবদুর রাজিককে খুবই ভালবাসে, এমনকি তার চেয়েও অনেক বেশী। ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়েও সে তা সংবরণ করে সে। বলে-

ঃ আমি ঐ টাকা থেকে আপনাকে এক জোড়া জুতা এবং কয়েক প্রস্থ ভাল পোশাক বানাতে বলেছিলাম। আপনি বোধ হয় তা করেননি, তাই না?

আহমদ খলিলের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। চিৎকার করে বলে-

ঃ কোন ছেলে তার বাপকে কি করতে হবে না হবে তা বলে দেয় বলে আমার জানা ছিল না। জুতা দিয়ে আমি কি করব শুনি? সারা জীবন তো জুতা পায়ে না দিয়েই কাটল। আমি যে স্যান্ডেল কিনেছি-তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।

ঃ আমরা এখন আর গরীব নেই। আপনার এখন ভালো পোশাক পরা উচিত। আমার আব্বাকে কেউ ভিক্ষুক মনে করুক, আমি এটা চাই না। ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বলে একটু চুপ করে থাকে ইসমাইল। পরে খুব নরম স্বরে বলে-

ঃ আমি আপনাকে দুঃখ দিতে চাইনি আব্বা। ঠিক আছে, এসব কথা থাক। এখন আপনি আমার সাথে চলুন। জেদ্দায় ভালো ডাক্তার দিয়ে দেখাব আপনাকে।

ইসমাইলের কথা শুনে রশিদও ভাইকে অনুরোধ করে বলে–

ঃ ঠিকই বলেছে ও। তুমি জেদ্দায় চল। আমিও তোমার সাথে যাব। তোমার দেখাশোনার জন্যে এমনিতেই লোক দরকার হবে।

ঃ তার দরকার হবে না। ইসমাইল বলে। কারণ আপনি ডাক্তার বা নার্স কোনটাই নন। খুব কাটা কথা তার।

আসমাও যেন এই ইসমাইলকে চিনতে পারছিলনা। তার মনে হয়, এ তার সন্তান না, অন্য কেউ। ইসমাইলকে বিশ্বাস করতেও যেন তার মন চায় না। তার এ ধরনের উদ্ধত মেজাজ বা কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর আসমার মোটেও ভাল লাগে না। কিন্তু স্বামীর অবস্থা চিন্তা করে সবকিছু ভুলে যেতে চায় সে। আহমদ খলিলকে লক্ষ্য করে বলে–

ঃ ইসমাইল তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। তোমার অবশ্যই যাওয়া উচিত। শরীরটা একটু সুস্থ হলেই আপনি চলে আসবেন।

আহমদ খলিল প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আসমার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। তার দু'চোখে পানি টলমল করছে। তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে এক গভীর আকুতি। কিছুই বলা হয় না তার।

আহমদ খলিল যা ধারণা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বড় শহর জেদ্দা। তার মনে পড়ে, প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রথম হজ্ব করার জন্যে এখানে এসেছিল সে। এত বছরে জেদ্দা আমূল পাল্টেছে। সেই সংকীর্ণ পথ আর নেই। তার স্থান দখল করেছে প্রশস্ত মহাসড়ক। জেদ্দা প্রাচ্যের এক সাধারণ শহর থেকে আজ পরিণত হয়েছে পাশ্চাত্যের এক মহানগরীতে। পুরোনো ভবনগুলোর সবই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। রাস্তায় আরবীয় পোশাক পরা লোকের সংখ্যা অবশ্য প্রায় আগের মতই। কিন্তু প্রশস্ত এভিনিউ, বহুতল ভবন, অফিস, স্টেশনারী দোকান, মার্কিন ও জাপানী গাড়ির ভিড় জেদ্দাকে একেবারে বদলে দিয়েছে।

ক্লিনিকের ডাক্তার আহমদ খলিলকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছে। যক্ষা হয়েছে তার। রোগের অবস্থা মারাত্মক। তবে এখনো চেষ্টা করে দেখা যায়। সে জন্যে দীর্ঘ সময় লাগবে।

জেদ্দার আমেরিকান হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে আহমদ খলিলকে। হাসপাতালটিতে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না ভেবে ইসমাইল খুশি হয়ে ওঠে।

হাসপাতালে আসার প্রথম দিনেই বড় রকমের একটা ধাক্কা খায় আহমদ খলিল। রোগীদের গোসল করানোর একটা ব্যাপার আছে সেখানে। সে নিয়মানুসারে তাকেও গোসলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আহমদ খলিলের মনে হয়, সে এক স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করেছে। সাদা মোজাইক করা ঘর। তাতে বিশাল এক ব্যাথটাব। ইষদুষ্ণ পানিতে অর্ধেক ভরে আছে সেটা। সাথের নার্সটি গায়ের পোশাক-আশাক খুলে বাথটাবে তাকে নেমে পড়তে বলে।

আহমদ খলিল জীবনে কখনো এরকম ভাবে গোসল করেনি। সে নার্সটির বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

ঃ কি ব্যাপার! দেরি করছেন কেন? তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। আপনাকে গোসল করাতে হবে না?

নার্সটির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ গোসলখানার চারিদিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকায় আহমদ খলিল। তার মনে হয়, এর চেয়ে মেয়েটিকে খালি হাতে ধরে হত্যা করা কিংবা তার হাত তার শরীর স্পর্শের আগেই তার মৃত্যু হওয়া অনেক ভাল।

ঠিক এ সময় গোটা ছয়েক মেয়ে কলরব করতে করতে সেখানে ঢুকে পড়ে। এরা সব প্রশিক্ষণার্থী নার্স। এদের একজন নার্সটিকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে–

ঃ কি ব্যাপার?

ঃ লোকটি কাপড় খুলে গোসল করতে রাজী নয়। তোমরা আমাকে সাহায্য কর তো!

মেয়েগুলো খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

লজ্জা এবং অপমানে আহমদ খলিল লাল হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ক্রোধে সারা শরীর কাঁপতে থাকে তার। তবু দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করে সে।

আহমদ খলিলকে যে ঘরে আনা হয়েছে, সেখানে চারটি শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটিই খালি। একটিতে এক শিশু। আহমদ খলিলের সেদিকে নজর দেয়ার মত শক্তি ছিল না। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে শুয়ে পড়ে। বিছানাটা মোটেই আরামদায়ক মনে হয়না তার। তাছাড়া এত অপ্রশস্ত যে পড়ে যাবার ভয় দেখা দেয় তার মনে।

এ সময় খুব পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর কানে আসে তার। ইসমাইল।

ঃ আব্বা ওরা যা করতে বলে আপনি তাই করবেন। তা হলে খুব শিগগিরই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি রোজই একবার করে এসে আপনাকে দেখে যাব।

ইসমাইল চলে যাবার অল্প পরই অন্য একটি নার্স একটি ট্রলিতে খাবার নিয়ে ভিতরে ঢোকে। জিভে পানি এসে যায় আহমদ খলিলের। অনেকটা ছোঁ মেরে ট্রে থেকে বড় এক টুকরা গোশ্ত তুলে নেয়। কিন্তু মুখে দেবার আগেই নার্সটি তার হাত ধরে

ফেলে এবং তাকে একটি কাঁটা চামচ ধরিয়ে দেয়। জীবনে কোনদিন যেন দেখেনি–এমনভাবে কাঁটা চামচটি দেখতে থাকে আহমদ খলিল। এখানে কোন রোগীকে হাত দিয়ে খেতে দেয়া হয় না– নার্সটি জানায়।

কাঁটা চামচ দিয়ে গোশ্থতের একটি টুকরো তোলে আহমদ খলিল। কিন্তু মুখে দেবার আগেই সেটি নিচে পড়ে যায়। মুহূর্তেই সাদা চাদর নোংরা হয়ে ওঠে।

ঃ আপনি তো দেখছি একেবারে ছেলে মানুষের মতো কাজ করেন–নার্সটি বিরক্ত গলায় বলে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছি।

ঃ বের হও, বের হয়ে যাও এখান থেকে। আমাকে একা থাকতে দাও। গর্জে ওঠে আহমদ খলিল।

চাদর দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়ে সে।

এরপর আর একজন নার্স আসে। আহমদ খলিল এই আর্ধউলঙ্গ মেয়েগুলোকে দেখার কিংবা নিজের মুখ তাদের দেখানোর কোনই আগ্রহ বোধ করে না।

রাত বেড়ে চলে। ঘুমানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করে সে। কিন্তু অপরিচিত এবং আরামদায়ক এই পরিবেশে কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। সারারাত লড়াই করার পর অবশেষে ভোর বেলার দিকে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে।

কিছুটা বেলা হবার পর সাদা কোট পরা একদল ডাক্তার তার কাছে এসে হাজির হয়। একজন নার্স একটা ট্রলিতে করে একগাদা ভীষণ দর্শন যন্ত্রপাতি এনে শয্যার পাশে রাখে।

ডাক্তাররা তার জামা খুলে খুব সতর্কতার সাথে ভালো করে পরীক্ষা করে।

এক তরুণ ডাক্তার আহমদ খলিলের শুকনো হাড্ডিসার আঙ্গুলগুলো নেড়ে চেড়ে সেগুলোতে আরো মাংস দরকার বলে মত প্রকাশ করে। আহমদ খলিলের কাছে ব্যাপারটি লজ্জাকর মনে হয়। এদের ব্যবহার এবং আচার-আচরণের মধ্যে হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না সে।

একজন ডাক্তার অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলে–

ঃ রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আসলে আমি এ পর্যন্ত যক্ষ্মার যতগুলো ঘটনা দেখেছি এটা তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। এ রোগীর দু'টো ফুসফুসই আক্রান্ত হয়েছে। আজ বিকেলেই বেশি আক্রান্ত ফুসফুসটি অপারেশন করতে হবে।

ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে চলে যায়।

আহমদ খলিল এতক্ষণে একা হয়। ঘুমের অভাবে তার চোখ দুটো জ্বালা-পোড়া করতে থাকে। গতরাতে ভোরের দিকে সামান্য সময়ের জন্যে ঘুম এসেছিল তার। এখন সে খুবই ক্লান্তি বোধ করে। বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করে সে। কিন্তু ঘুম আসে না। তার মনে হয়, মেঝের উপর শুতে পারলে বোধ হয় ঘুম আসত।

আধো জাগরণ আধো ঘুম অবস্থায় বহুদূর থেকে এক অপার্থিব সুরেলা ধ্বনি তার কানে প্রবেশ করতে থাকে। মসজিদ থেকে আজান দেয়া হচ্ছে। আহমদ খলিল পুরোপুরি জেগে ওঠে। আজানের ধ্বনি শুনে সে অনেকটা আরাম বোধ করতে থাকে। মসজিদের মিনার দেখার জন্যে ব্যগ্র হয়ে জানালার কাছে এগিয়ে যায় সে। কিন্তু না। হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনের পাথরের দেয়াল ছাড়া তার চোখে আর কিছুই পড়ে না।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আহমদ খলিলের। আসমার মুখ চোখের সামনে কয়েকবারই দেখতে পায় সে। কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বহু গুণে বড় দেখায় সেই মুখ। তার দরদভরা গলার স্বরও শুনতে পায় সে। কিন্তু আবেগভরে তাকে আলিঙ্গন করতে যেতেই সে সরে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরই সে আবার ফিরে আসে। সাথে দত্তক পুত্র আবদুর রাজিক। আহমদ খলিল আশ্বস্ত হয় যে তারা তার সাথে এক ঘরেই আছে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন আরাম রোধ করতে থাকে।

আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে যায় তার। নার্স এসেছে ট্রে নিয়ে। বিভিন্ন রকম খাবার তাতে। কিন্তু আহমদ খলিল সেগুলো চেয়েও দেখেনা। চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে পড়ে থাকে সে। খাবারগুলো অস্পর্শিতই থেকে যায়।

স্মৃতির গভীরে ডুবে যায় আহমদ খলিল। ইরাক আল-মানশিয়ার ধুলোভরা সংকীর্ণ পথে নিজেকে হেঁটে যেতে দেখে সে। পাকা গম খেতের শীষগুলো বাতাসের দোলায় দুলছে। যতদূর চোখ যায় সোনা আর সোনা। আহমদ খলিল স্পষ্ট অনুভব করে-লাঙ্গলের পিছনে হাঁটতে এবং আঙ্গুলের চাপে উর্বর মাটির দলাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে পারলে তবেই সে সত্যিকারভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে।

তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সালাহ্-উদ্‌দীন আইউবীর কথা। সে দেখে, তেজী আরবী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার গাজী সালাহউদ্‌দীন উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটে চলেছেন জেরুজালেমের দিকে, তার পিছনে হাজার হাজার দুর্ধর্ষ মুসলিম ঘোড়সওয়ার। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত সওয়ারীর দল তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আহমদ খলিল তাদের মধ্যে তার ছেলে ইসমাইলকেও দেখতে পায়। সে বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে বলছে-ফিলিস্তিন আমাদের, চিরকাল তা আমাদেরই থাকবে।

ঃ সবচেয়ে ভালো হয়, তোমরা একে ঘুমের ওষুধ দিতে শুরু কর। সে অচেতন হয়ে পড়লে হুইল স্ট্রেচারে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে এস। তার ফুসফুসটি অপারেশন করতে হবে। একজন ডাক্তার তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেন।

আহমদ খলিলের আচ্ছন্নভাব কেটে যায় কথাগুলো কানে যেতেই। লাফ দিয়ে শয্যার উপর উঠে বসে সে। আগুন ঝরা চোখে ডাক্তারদের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টি দেখে ডাক্তাররা হকচকিয়ে যায়।

কয়েকটি মুহূর্ত এমনিভাবে কেটে যায়। অবশেষে একজন ডাক্তার তার মুখে মাস্ক পরানোর আদেশ দেয়।

আহমদ খলিল নিজেদের আর স্থির রাখতে পারে না। এক ধাক্কায় শয্যার পাশে রাখা টেবিল থেকে সব যন্ত্রপাতি মেঝেতে ফেলে দেয়। তারপর বিছানা থেকে উঠেই দৌড় দেয় দরজার দিকে। পাঁচ-ছয়জন ডাক্তার দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে তাকে। কিন্তু আহমদ খলিল তখন উন্মত্ত প্রায়। তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। ডাক্তারদের ঘুঁষি ও লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে যায়। তবে এ সময় আরো কয়েকজন এটেন্ড্যান্ট এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং কাবু করে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

একজন নার্স অন্য একজন রোগীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা দেখে দৌড়ে আসে সে। চিৎকার করে বলে–

ঃ হায় আল্লাহ! এসব কি হচ্ছে এখানে?

ঃ লোকটির সাংঘাতিক জ্বর। সে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। একজন ডাক্তার জানায়।

পরদিন সকালে ইসমাইল তার আব্বাকে দেখার জন্য এলে ডাক্তাররা তাকে ডেকে পাঠায়।

ঃ আপনার আব্বা যাতে ঘরে বসে ব্যবহার করতে পারেন এরকম কিছু ঔষধ দিচ্ছি। এতে তার রোগ আর বাড়বেনা বলেই বিশ্বাস। আর এই ট্যাবলেটগুলো যদি তিনি ঠিকমত খান তবে অনেকটা আরাম পাবেন।

ইসমাইলের মুখ একেবারে সাদা হয়ে যায়। সে আমতা আমতা করতে করতে বলে–

ঃ কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। মাত্র ক'দিন আগেই তিনি ভর্তি হয়েছেন। আপনারাই বলেছিলেন দীর্ঘদিন এখানে থাকতে হবে। কিন্তু এখন ... ...।

ডাক্তার তার মাথা ঝাঁকান–

ঃ কথাটা বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার মনে হয় সত্য কথাটাই বলা উচিত। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তার জন্যে সত্যিই আমাদের আর কিছু করার নেই। তাছাড়া আমরা এখানে তাদেরই রাখি যাদের সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

ইসমাইল অনেকটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বলে–

ঃ কিন্তু আপনারাই বলেছিলেন, নতুন নতুন ঔষধ, সর্বাধুনিক অস্ত্রোপচার, এই রোগ ভালো হতে অবশ্যই বাধ্য।

ঃ যে রোগী আমাদের সাথে সহযোগিতা করে না তার জন্যে আমাদের কিছুই করার নেই। তাছাড়া আপনি তাকে এমন সময়ই এনেছেন যখন রোগ চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে। সার্বক্ষণিক পরিচর্যা ছাড়া আপনার আব্বা দু'তিন মাসও বাঁচবেন কিনা সন্দেহ আছে।

ইসমাইল যখন আহমদ খলিলকে দেখতে তার শয্যার কাছে এসে পৌঁছল, সে তখন দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে।

ঃ আব্বা!–ইসমাইল ডাকে।

আহমদ খলিল ফিরে তাকায়। কিন্তু তার অভিব্যক্তি পরিষ্কার বলে দেয় সে সে ছেলেকে দেখে মোটেও খুশি হয়নি।

ঃ আব্বা! ডাক্তাররা বলছেন আপনার আর এখানে থাকার দরকার নেই। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নার্সের দিকে ফিরে তাকায় ইসমাইল–

ঃ মেহেরবাণী করে তাকে একটু ঠিকঠাক করে দিন। আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আহমদ খলিলের মুখে এক অপার্থিব উজ্জ্বল হাসি ফুটে ওঠে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে পানি একটি শিশুর মত খুশি হয়ে ওঠে সে। আসমা, রশিদ, সবাই তার ফিরে যাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তার মনে হয়, এই মানুষগুলোর প্রিয় মুখ দেখতে পেলেই সে আবার ভালো হয়ে উঠবে।

২৯.

হাসপাতালের যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসতে কয়েক মাস চলে যায়। কোন কোন দিন গভীর রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখে হাত পা অসাড় হয়ে আসে আহমদ খলিলের। সে দেখে, হাসপাতালের অপ্রশস্ত শয্যা থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে সে এবং পাশে দাঁড়ানো নার্স তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করছে। আহমদ খলিল তখন অস্থির আতঙ্কগ্রস্ত মন নিয়ে আসমাকে খোঁজে। আসমা জেগে ওঠে। আহমদ খলিলের মুখে, মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে দেয়, শরীরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে এবং আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে সে বাড়িতেই আছে।

ডাক্তারদের দেয়া ওষুধগুলো খেয়ে আহমদ খলিলের কোন উপকার হয়নি। তার কাশি বাড়তেই থাকে। জ্বরও চলছে একটানা। কোন কাজ করার মত শক্তি এখন আর তার নেই। সারাদিন কাটে ঘরে। বসে বসে আসমার কাজ করা, চলাফেরা লক্ষ্য করে সে। বলা যায়, রোগ শয্যার এই হাঁফিয়ে ওঠা জীবনে আসমার উপস্থিতিই তার একমাত্র স্বস্তি ও শান্তি।

শীতকাল এসে যায়। ঘরের বারান্দায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকে সে। উজ্জ্বল সূর্যালোককে সে যেন প্রাণপণে টেনে নিতে থাকে নিজের শরীরের ভিতরে। এ সময় তার রোগ জীর্ণ দেহে একটুখানি যেন প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। কখনো কখনো সুঁই ও সুতা দিয়ে ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই করতে বসে সে। এ কাজগুলো আগে আসমাই করত। কিন্তু এখন সময় কাটেনা বলে সে নিজে থেকেই কাজটি চেয়ে নিয়েছে।

একদিন দুপুরে ইসমাইলের চিঠি আসে ঃ

"আব্বা, তিন মাস আগে আমি কোকাকোলা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন দাহরানে আমেরিকান তেল কোম্পানিতে নতুন চাকরি নিয়েছি। আগের কাজে ভবিষ্যত উন্নতির তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই তেল কোম্পানিতে আমার জন্যে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে বলে মনে হচ্ছে......।"

এরপরের দিনগুলোতে ইসমাইলের কাছ থেকে আরো চিঠি আসে। এগুলোতে সে দাহরানে তার আনন্দময় জীবনের কথা, সুস্বাদু ও মূল্যবান খাবারের বর্ণনা, সুন্দরী তরুণীদের সাথে সাক্ষাত, সমুদ্রে সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা লাভ, গ্রামোফোনে গান শোনা প্রভৃতির উচ্ছ্বাসময় বিবরণ দেয়। বন্ধুদের সাথে একত্রে ফটো তোলা এবং টেলিভিশন দেখার কথাও লেখে সে। আহমদ খলিল অবাক বিস্ময়ে তার ছেলের চিঠিগুলো শুধু পড়ে যায়, কোন জবাব দেয় না।

আবদুর রহমান সম্প্রতি একটি টেলিভিশন কিনেছেন। বলা যায় বাধ্য হয়েই। তার ছেলেমেয়েরাই জোর করে কিনিয়েছে। ফলে অনেকেই এখন টেলিভিশন দেখার সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ আহমদ খলিলের কাছে এসে অভিযোগ করে যে আরবে টেলিভিশন আসার পর থেকে সমাজে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা এখন আর বাবা-মার কথা শুনতে চায় না। টেলিভিশনে দেখা নিত্য নতুন ফ্যাশনের প্রতি তাদের প্রবল রকমের ঝোঁক। এমনকি টিভি তারকাদের আচার-আচরণ পর্যন্ত তারা নকল করতে শুরু করেছে। আহমদ খলিল শোনে, কিছু বলে না। সে জানে খৃস্টানদের হাতে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা। তারা এখন সেগুলোর মাধ্যমে ঘরে ঘরে তাদের অপ-সংস্কৃতির থাবা ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এভাবেই সমগ্র মুসলিম জাহানকে প্রতিরক্ষাহীন ও অসহায় করে ফেলতে চাইছে।

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তন যা এতদিন ছিল শুধু বাইরে এবং যার বিস্তার ছিল মন্থর, টেলিভিশনের প্রচলনের ফলে তার প্রসার ঘটছে ভয়াবহ দ্রুতগতিতে। শাসক অভিজাত শ্রেণী আজ পুরনো জীবনধারার লোকদের জন্যে লজ্জাবোধ করতে শুরু করেছে। দেশকে এখন ইউরোপীয় ধাঁচে ঢেলে সাজাতে তারা সংকল্পবদ্ধ। এর ফলও দেখা যাচ্ছে। মদীনাতে ইতিমধ্যেই তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহর জন্যে একটি বৃহৎ স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারা পুরনো ভবনগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে। সে সব জায়গায় তৈরি হচ্ছে ইউরোপীয় ধাঁচের ভবন। রাস্তাগুলোকে সুন্দর ও প্রশস্ত করার জন্যে তা বিদেশী তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হচ্ছে। লোকজনকে আরো বিলাসী ও আরাম-আয়েশভোগী করার নিত্য নতুন বিদেশী পণ্যে ছেয়ে গেছে বাজারগুলো।

এখানেই শেষ নয়। আঘাত আসছে অন্যভাবেও। শহরগুলোকে সুন্দর করে সাজানোর অজুহাতে পুরনো এলাকাগুলো ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেয়া হয়েছে। এর প্রথম শিকার হয়েছে মুহাজিরদের আবাসিক এলাকা। সরকার নাকি এ এলাকাগুলোর জন্যে লজ্জাবোধ করে। তাদের কাছে এটা শ্রীহীন এলাকা মাত্র। কিন্তু আহমদ খলিলের কাছে এটা তার দ্বিতীয় আবাস ভূমি। গত পঁচিশ বছর ধরে সে এখানে আছে। এখানেই রয়েছে তার সকল প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। কিন্তু খুব শীগগিরই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হচ্ছে। সে শুনেছে, আগামী বছরে সমগ্র এলাকাটাই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের বাড়িঘরগুলো যে সড়কে আছে, পুনর্গঠনের পর এটা হবে গাড়ি পার্কিং এলাকা। আহমদ খলিলের মত লোকদের এতে ক্ষতি হবে। তবে জমির মালিকেরা ক্ষতি পূরণ পাবে। সে ভেবে পায়না, এ ব্যাপারে সে কি করবে এবং কোথায়ই বা যাবে?

৩০.

রমজান মাস এসে যায়। আব্দুর রাজিক ফিরে এসেছে। তাকে পেয়ে ইসমাইলের কথা একেবারে ভুলে যায় আহমদ খলিল। সে তাকে দেখে আর শিহরিত হয়। আবদুর রাজিকের বয়স এখন কুড়ি বছর। অত্যন্ত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহী সে। তার ব্যবহারের মধ্যে ভদ্রতা ও নম্রতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এক চিঠিতে আবদুর রাজিকের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জানিয়েছিলেন যে, সে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী। এখন তার মধ্যে আর সেদিনের সেই বালক সুলভ আগ্রহ-ঔৎসুক্য নেই। তার মুখে এখন দুঃখ ও কষ্টের ছায়া। সে আর কায়রোতে ফিরে যেতে চায় না। বলে-

ঃ কায়রোতে যে কি ধরনের সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছে, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের এর গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিশের হাত থেকে কেউই নিরাপদ নয়। তাদের নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়ছে। আমি কোন চিঠিতেই এ ব্যাপারে আপনাকে লিখতে পারি নি। কেননা দেশের বাইরে পাঠানো সকল চিঠিই সেখানে খুলে দেখা হয়। আমার প্রায় সকল বন্ধুই ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সদস্য। হাতে একটু সময় পেলেই আমরা প্রতিবেশী গরীব ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে তাদের কুরআন শিক্ষা দেই এবং সাধ্যানুযায়ী খাবার ব্যবস্থা করি। আমার বন্ধুরা এত প্রিয় যে তাদের কাজের সাথে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়তেই আমার ইচ্ছা হয়েছে। আমি অঙ্গীকার করেছি যে তারা যত দুঃখ কষ্টই ভোগ করুক না কেন, আমিও তাদের সাথে থাকব। কিন্তু তারা আমাকে অনুরোধ করেছে যেন দেশে ফিরে আমি তাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক না রাখি। এরপরই তাদের সবাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কোন অপরাধ নেই, তবু পুলিশ তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। কারাগারে আটক করে রেখেছে। অন্যরা যে কে কোথায় তা আমি জানি না। আমি আর কায়রোতে ফিরতে চাই না। আমার অনুরোধ, আপনি আমার উপর এ ব্যাপারে কোন চাপ দেবেন না।

কিন্তু আহমদ খলিল তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সে বলে তাদেরকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আল আজহারে হস্তক্ষেপ করার সাহস তাদের হবে না। সুতরাং তোমার পড়াশোনা শেষ করতেই হবে।

আবদুর রাজিক কায়রো ফিরে যায়। মাস খানেক পর তার জবানীতে এক বন্ধুর হাতে লেখা চিঠি আসে ঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া রেক্টর একটি নতুন আইন জারী করেছেন। এখন থেকে কোন ছাত্রই আর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়তে কিংবা দাড়ি রাখতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে নতুন আইন অনুযায়ী এখন থেকে কোন ছাত্রকে বিদেশী পোশাক পড়তে না দেখা না গেলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। সব ছাত্রই আদেশটি সানন্দে মেনে নিয়েছে, আমি ছাড়া। এখন আমি ক্রমাগত হয়রানির শিকার হচ্ছি। ক্লাশের সকল ছাত্রই আমাকে বিদ্রূপ করে। তারা আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া আখ্যা দিয়েছে। আমার জীবন এখন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। শুধু মাত্র আমার শিক্ষকরাই এখানে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু তারাও নিরুপায়। সরকারের আইনের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করণীয় নেই। আল আজহার এর এখন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তা এতটাই যে আজ থেকে সাত বছর আগে আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম, আজ আর তাকে সেই বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ বলে চেনার উপায় নেই। এখানে এমন কিছুই নেই যার পরিবর্তন হয়নি।"

চিঠিটা পড়ে আহমদ খলিলের মুখে সুগভীর যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে। সে ধীরে ধীরে চিঠিটি ভাঁজ করে পাশে রেখে দেয়। তার মনে পড়ে, অতি সম্প্রতি বাদশাহ্‌র ইচ্ছায় ও কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির আগ্রহে মদীনায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই সকলের প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে তা। এখন আবদুর রাজিককে যদি এখানে ভর্তি করানো সম্ভব হয় তবেই সে পড়াশোনা চালাতে পারবে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তার মন অনেকটা হালকা হয়ে ওঠে। রেক্টর আবদুল আজিজ বিন বাজ-এর কাছে তার দত্তক পুত্রের দুঃখ-দুর্দশা ও সকল ঘটনা সবিস্তারে জানিয়ে একটি পত্র দেয় সে।

মদীনার নতুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে আহমদ খলিল গভীরভাবে অভিভূত হয়। আবদুল আজিজ বিন বাজ-এর সাথে দেখা করে সে। তিনি আগেই আহমদ খলিলের চিঠিতে সব জানতে পেরেছিলেন। আল-আজহার থেকে আবদুর রাজিক এখানে এসে পৌঁছলেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার ভর্তি ও পড়াশোনার সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

আবদুর রাজিকের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার দিন গুণতে থাকে আহমদ খলিল।

আবদুর রহমান এবং ইনামুল্লাহ্‌র বাড়ি রোজ একবার করে যাওয়া আহমদ খলিলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের দেখে সে খুশি হয়। মনে হয়, সব অসুখই তার সেরে গেছে। এমনকি অসুখ যে আছে, এ কথাটি সে ভুলেও উচ্চারণ করে না। বন্ধুদের কাছে আবদুর রাজিকের কথা, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, শেখ আবদুল আজিজ বিন বাজ-এর সাথে সাক্ষাত ইত্যাদি ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলে যায়।

একদিন ইনামুল্লাহ্‌ একটি খবরের কাগজ কিনে আনেন। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল বিশাল হরফে কালো বর্ডার দিয়ে একটি খবর পরিবেশন করা হয়েছে। মিসরের

প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। বহু নিষ্পাপ মানুষের রক্তে যার হাত রঞ্জিত, সেই স্বৈরাচারী শাসক আর নেই! আহমদ খলিলের বিশ্বাসই হতে চায় না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। নয়া শাসক সম্ভবত অপেক্ষাকৃত কম কঠোর হবেন এবং মিসর হয়ত নতুন করে বেঁচে উঠবে। এমনকি ইখওয়ানের পুনর্জাগরণও হয়ত হতে পারে– সে ভাবে।

খবরের কাগজ থেকে আরো কিছু স্বস্তিকর সংবাদ পায় আহমদ খলিল। মুহাজিরদের আবাস স্থানগুলো ভাঙ্গা এবং পার্কিং লট তৈরির কাজ একবছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আহমদ খলিল ও অন্যদের বসবাসের অনুমোদনের সময়সীমাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আহমদ খলিল কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে এখন।

এক বছর পেরিয়ে যায়। ডাক বিভাগের লোক একটি চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর ইসমাইলের হাতের লেখা দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ছিঁড়ে চিঠিটি বের করে আহমদ খলিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ সেটা না পড়ে বুকের সাথে চেপে ধরে রাখে সে। চিঠিটা খুলতেও ভয় হয় তার। আবদুর রাজিক, রশিদ, মনসুর এবং আরো দুজন বন্ধু সবাই ঘিরে আছে তাকে অধীর আগ্রহে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে রশিদ তার বলিষ্ঠ হাতটি অতি সন্তর্পণে আহমদ খলিলের কাঁধের উপর রাখে। চিঠিটা খুলে পড়ার জন্যে নরম গলায় অনুরোধ জানায় সে।

আহমদ খলিল ধীরে ধীরে চিঠিটা খোলে। পড়তে শুরু করে সে ঃ

"আব্বা, কিছুদিন আগে আমি আরামকো তেল কোম্পানির চীফ একাউন্ট্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছি। আমার বেতন এখন অনেক। আমি দাহরানের অ্যামেরিকান কোয়ার্টারে বাস করার বিশেষ অনুমতি পেয়েছি। এখন রোযার মাস। সে কারণেই আমি ছুটিতে রয়েছি। একটি কথা। আমি বিবাহ করেছি। মেয়েটি খৃস্টান। কিন্তু খুবই ভাল। এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য শিগগিরই বাড়ি আসছি। এমনও হতে পারে যে এ চিঠি পাবার আগেই আমি বাড়ি পৌঁছে যাব ”

মনসুর খুব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন–

ঃ ইসমাইল তো এখানে এসে আমাদের খুঁজেই পাবে না। শহর কর্তৃপক্ষ এসব বাড়িঘর ভাঙ্গার জন্য আবার আদেশ জারি করেছে। আগামী দু' থেকে তিনদিনের মধ্যে আমাদের এ এলাকা ছেড়ে যেতে হবে।

ঃ আপনি এত চিন্তা করবেন না তো। আহমদ খলিল তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। ইনামুল্লাহ্ এবং তার ছেলে কথা দিয়েছে যে অন্য কোন স্থান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের কাছে থাকতে পারব।

এ সময় ভীষণ কাশি শুরু হয় তার। একটু পর কাশির বেগ প্রশমিত হলে উঠে দাঁড়ানোর জন্যে আবদুর রাজিকের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। আবদুর রাজিক তাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে এবং পরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

এবারের রমজানে অসুস্থতা সত্ত্বেও রোজা রাখছে আহমদ খলিল। সূর্য ডুবতে শুরু করে। রশিদ ও আহমদ খলিল নীরব বসে ইফতারের সময় ঘোষণা করে কামানের শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

এ সময় দরজায় কারো করাঘাতের শব্দ হয়। রশিদ দরোজা খুলে দেয়। ইসমাইল দাঁড়িয়ে। তার পরনে একটি চমৎকার সুন্দর ধূসর রঙের বিজনেস স্যুট, গলায় টাই, হাতে ধরা একটি বিশাল স্যুটকেস। রশিদকে উদ্দেশ্য করে সে বলে–

ঃ চাচা, আপনারা কি আমার চিঠি পেয়েছেন? আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। এ জন্য আমি খুবই দুঃখিত। একে তো বিমানে কয়েক ঘণ্টা দেরি। তারপর এখানে আসতে ট্যাক্সি পেতেও অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এক যন্ত্রণাকর নীরবতার মধ্যে রশিদ এবং ইসমাইল অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে একে অপরিচিতের মত। পরে ইসমাইলই নীরবতা ভাঙ্গে–

ঃ আব্বা কোথায়?

ঃ ভিতরে এস। রশিদ তাকে আহ্বান জানায়।

ইসমাইল ভিতরে ঢোকে। সবার দৃষ্টি আছড়ে পড়ে তার ওপর। সাধারণ ভদ্রতা হিসেবে ভিতরে ঢোকার সময় পায়ের জুতো জোড়াও খোলেনি সে।

আহমদ খলিল কষ্ট সত্ত্বেও উঠে বসে। একটি বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায় সে। আব্বাকে দেখে ইসমাইলের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। সবকিছু বিস্মৃত হয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়।

আহমদ খলিলের বুকের মধ্যে আবার কাশি শুরু হয়। কাশির দমকটা সামলে নিয়ে পুত্রকে আলিঙ্গনের জন্যে হাত দু'টি বাড়িয়ে দেয় সে। কিন্তু কোন কুষ্ঠরোগী যেন তাকে স্পর্শ করছে– এমন ভাবে ইসমাইল তার আব্বার কাছ থেকে এক লাফে দূরে আসে। আহমদ খলিলের মুখে গভীর ব্যথার ছাপ ফুটে ওঠে। তা লক্ষ্য করে ইসমাইল বলে–

ঃ আব্বা। আপনি দয়া করে ভুল বুঝবেন না। যক্ষ্মা খুবই ছোঁয়াচে রোগ। সে জন্যেই......।

কিন্তু ইসমাইল স্পষ্ট উপলব্ধি করে, তার বক্তব্য তার আব্বার মনে কোনই রেখাপাত করেনি। সে মুখ অপমানে ও আশাভঙ্গের কারণে কঠিন হয়ে উঠেছে। সেও তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বলে–

ঃ মা কোথায়? আমি তার সাথে দেখা করব।

রশিদ আঙ্গুল তুলে দেখায়। সেদিকে এগিয়ে যায় ইসমাইল।

পর্দার ওপাশে মায়মুনার সাথে আসমা তখন রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। মাত্র কয়েকটি বছর। কিন্তু এরই মধ্যে তার মায়ের চেহারায় বয়সের যে ছাপ পড়েছে তা দেখে ইসমাইল বিস্মিত হয়। আসমার সারা মুখে বলি রেখা, সুদীর্ঘ কালো চুল সাদা হয়ে

গেছে। সে মাকে জড়িয়ে ধরে, তার গালে চুমু খায়। কিন্তু ইসমাইল অনুভব করে তার মায়ের কাছ থেকে কোন সাড়া মেলে না।

এ সময় কামানের আওয়াজ শোনা গেল। আসমা বলে–

ঃ ইফতারের সময় হয়ে গেছে। দাহরান থেকে মদীনা অনেক দূরের পথ। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ খুব। যাও, হাত মুখ ধুয়ে ইফতারে বস।

পর মুহূর্তেই আসমার কথায় ইসমাইল যেন ছোট বেলার সেই নিজেকে খুঁজে পায়–

ঃ আজ দুম্বার গোশ্‌ত এবং ভাত রান্না করেছি। তুই তো খুব পছন্দ করতি এ খাবারটা, তাই না?

সবার সাথে ইফতার করতে বসে ইসমাইল। কিন্তু এভাবে মেঝেতে বসে খাওয়ার অভ্যাস নেই তার বহুদিন। অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে খাওয়া শুরু করে সে।

সবার খাবার শেষ হয়ে যেতে থাকে। আসমা ইসমাইলের দিকে চেয়ে দেখে— সে কিছুই খায়নি।

ঃ তুই তো কিছুই খাচ্ছিস না বাবা। এ খাবারটা তো তোর খুব পছন্দের ছিল।

ঃ না মা, আসলে তেমন খিদে নেই আমার।

ঃ ঠিক আছে, খিদে না থাকলেও কিছুটা তোকে খেতেই হবে– আসমা শান্ত গলায় বলে।

ইসমাইল আর নিজেকে সামলাতে পারে না।

ঃ আঃ মা! এই অদ্ভুত ভাবে বসে খাবার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।

পর মুহূর্তেই যেন ঘরের বাতাস থমকে যায়। একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে চেপে বসে। থেমে যায় সমস্ত শব্দ। এমন একটা প্রতিক্রিয়ার কথা ইসমাইল কল্পনাও করেনি। তার মনে হয়, এক দৌড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সে। তার আফসোস হয়, কেন সে বাড়ি ফিরতে গেল। এই ঘর, বাড়ি, পরিবেশ, আব্বা, মা, আত্মীয় স্বজন কিছুই আজ আর তার নিজের নয়। সবকিছুর সাথেই তার বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে সে। খড়ের মাদুর, কয়েকটি বালিশ আর দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটি পানির কলস এদের সম্বল মাত্র।

অবশেষে আহমদ খলিল ছেলের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করে—

ঃ তুমি চিঠিতে লিখেছিলে যে কাজের শেষে নৈশ স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করেছ। সে অনেক আগের কথা। আমার ধারণা এর মধ্যে তুমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছ। এ সাথে তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাহিত্য পড়েছ, বিখ্যাত কবিদের সম্পর্কে শুনেছ এবং এবং দু একটি কবিতাও নিশ্চয়ই সুন্দর করে আবৃত্তি করতে পার। কবি লবিদের নামও তুমি শুনেছ বলেই আমার ধারণা। আমার অনুরোধ, তুমি এই মহৎ কবির একটি কবিতা আমাকে আবৃত্তি করে শোনাও।

ঃ আমি তার কবিতা জানি না।

ঃ তাহলে কুরআনের কিছু আয়াত শোনাও।

ঃ নৈশ স্কুলে কুরআনের ক্লাশে আমি যোগ দেইনি।

ঃ তাহলে তুমিই বল যে তুমি এতদিন কি শিখেছ?

ঃ সবই। আমি ইংরেজি, কারিগরি বিদ্যা, রসায়ন, ইলেকট্রনিকস, হিসাব, ব্যবসা প্রশাসন । আব্বার দিকে তাকায় ইসমাইল— আমি যে নামগুলো বললাম আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?

ঃ হ্যাঁ, খুব ভালভাবেই বুঝেছি। আমি আরো বুঝেছি যে তুমি নামায পড় না এবং রোযাও রাখ না, তাই না?

প্রচণ্ড ক্রোধে ইসমাইলের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। বলে—

ঃ অতীত মৃত। আব্বা, আপনি যে কখন এ সত্যটা উপলব্ধি করবেন তা আমি জানি না। হাজার হাজার বছর আগেকার কিতাব এবং চিন্তাধারা নিয়ে আপনি এখনো বসে আছেন। আপনার জীবনধারা সেই প্রাথমিক যুগের লোকদের মত। আপনি কি বুঝতে পারেন না যে আজকের সমস্যা সমাধানে অতীতের কিছুই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না! কিন্তু রাজা-বাদশাহ্দের দিন আজ শেষ হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রই এখন একমাত্র সমাধান। এদেশ বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

এ পর্যায়ে এক ভিন্নতর উত্তেজনায় ইসমাইল টান টান হয়ে ওঠে। সে বলে চলে—

ঃ আপনি আমার ঈমানের কথা জানতে চান? আমি মনে করি, সউদীরা ইসলামকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সেই আদিকাল থেকে আমরা কুরআন-হাদিস মুখস্ত করে আসছি এবং করেও যাব যতদিন না বিরক্ত হয়ে উঠি। কর্তৃপক্ষ এখনো বল-প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের উপর ধর্মকে চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাদের নিজেদের জীবনেই তো ধর্ম পালিত হয় না। এক্ষেত্রে কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তাতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? সব ধরনের প্রচারণা সত্ত্বেও এখানে আমরা দেখছি আধুনিকতা কিভাবে প্রসার লাভ করছে। এখন আমাদের জেগে ওঠার সময় এসেছে। হ্যাঁ, আব্বা, আমার ঈমান আছে। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ তার নিজের চেষ্টাতেই উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবনযাত্রায় পৌছতে পারে। যখন আমরা মধ্যযুগীয় পন্থায় বাদশাহদের দ্বারা শাসিত হচ্ছি, প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে বসে আছি, ক্ষুধা, অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য আমাদের নিত্য সঙ্গী, যখন আমাদের শিশুরা ক্ষুধা এবং অনাহারে মারা যাচ্ছে তখন কোন ধর্মতাত্ত্বিক, কবি কিংবা দার্শনিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের প্রয়োজন বাঁধ, কারখানা, বৃহৎ শিল্প এবং যন্ত্রপাতি। আমাদের দরকার অনেক অনেক স্কুল এবং হাসপাতাল.........।

ঃ আমি কখনো তোমাকে বলিনি যে আমাদের এসবের প্রয়োজন নেই। সকল জ্ঞানই ভালো, কিন্তু তা খারাপ তখনি যখন তা ভুলপথে চালিত হয়। সকল বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, শিক্ষক ও সমাজ নেতারা যদি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে কাজ করত, তাহলে কি ভালোই না হত? কিন্তু তারা নির্লজ্জ স্বার্থপর ছাড়া কিছু নয়। তারা সবাই আমাদের শত্রু অথবা আমাদের শত্রুদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা এখানে কাজ করছে আমাদের ভালোর জন্যে নয়, বরং তারা চাইছে যেন আমরা ঈমান হারিয়ে ফেলি এবং বিদেশীদের মত হয়ে উঠি। গরীবদের জন্যে তাদের কোন সহানুভূতি নেই, বরং আমাদের তারা ঘৃণা করে। যারা নতুন জীবনে অগ্রসর হতে চায়না তারা তাদের ঘৃণার পাত্র। তারা যা চাচ্ছে তা এমনিতে যদি না হয় এমনকি তারা শক্তিও প্রয়োগ করবে। ঔষধ, যন্ত্রপাতি এবং বই হল তাদের অস্ত্র। আমরা যদি মূর্খ এবং অলস হয়ে থাকি, আমরা শুধু দুর্বল হতে দুর্বলতরই হতে থাকব এবং যদি আল্লাহ রক্ষা না করেন তবে আমরা প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে তাদের সেবাদাসে পরিণত হব। আমার অল্প বয়সেই আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই স্কুলে পড়ার সময় এবং যখনি সুযোগ পেয়েছি তখনই আমি জ্ঞান অর্জন এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নের চেষ্টা করেছি। আর এ কারণেই ইসলামী ও ইউরোপীয় এ দু'টি সভ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পেরেছি। আমি মনে করি নিজেদের ক্ষতির সুযোগ না রেখে আমাদের জঘন্যতম শত্রুর কাছ থেকেও শেখার মত কিছু থাকলে তা শিখতে পারি। আমি নিজেকে কোন পণ্ডিত নয়, সারাজীবন এবং এখনো একজন কৃষক হিসেবেই মনে করেছি ও করি। সেই ছোটবেলা থেকেই মাটির প্রতি আমার টান ছিল। কিন্তু আমি দেখেছি, আমাদের জমিগুলো জোর করে কেড়ে নেয়া হচ্ছে, সেই সম্পত্তি আবার দেয়া হচ্ছে অন্যদের, সেখানে আমাদের বলে কিছুই থাকেনি। আজকের জীবনযাত্রায় একজন কৃষকের কোন ঠাঁই নেই, কোথাও না। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার জীবনের এটা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। শত্রুকে প্রতিরোধ করতে, তার সাথে যুদ্ধ করতে অবশ্যই লেখাপড়া শেখা ছাড়া আর উপায় নেই। ইসমাইল, আমরা যদি আগের মত আবারও পৃথিবীতে মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করতে চাই তবে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান, সম্পদ ও শক্তি অর্জন করতে হবে.......।

ঃ সে পুরনো দিনের কথা ভুলে যান আব্বা। এখন যার শক্তি আছে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করছে শক্তিহীনেরা। উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং উন্নত জীবনের দিকেই এখন মানুষের যাত্রা।

ঃ ইসলাম মৃত নয়। আল্লাহ চিরজীবী। ঈমানদারদের হৃদয়ে তার স্থান অবিনশ্বর। বিদেশী জীবন যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অচিরেই দুর্নীতি, ক্ষয় এবং দুর্বলতার কারণে এর পতন ঘটবে। যারা ঈমানদার তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মনে রাখবে যে আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী। আমি এটুকু বুঝি।

ঃ আপনি কিছুই বুঝেন নি। অধৈর্য এবং বিরক্ত ইসমাইল বলে।

ঃ আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ধনী ব্যবসায়ীরা দিন দিন অর্থলোভী হয়ে উঠেছে যে কারণে রুটি, ময়দা, খাদ্যশস্য, রান্নার তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। থাক সে কথা। আচ্ছা তোমার স্ত্রীর কথা বল এবার। চিঠিতে লিখেছ যে সে একজন খৃষ্টান। তো, তুমি কি করে ভিন্ন ধর্মের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে?

ঃ এটা কোন ব্যাপারই নয়। কারণ সে নামেই শুধু খৃস্টান। আমরা কোন বিশেষ প্রথা বা আচারে বিশ্বাসী নই। সে আমার মতই মুক্তমনা। আর এ কারণেই আমরা একে অন্যের কাছাকাছি আসতে পেরেছি। বলা যায়, সে আমার চেয়েও বিদ্রোহী। তার আব্বা একজন গোঁড়া ধর্মযাজক। তিনি এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে তার পক্ষে আমাদের এই বিবাহ মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আমার স্ত্রীর মা অর্থাৎ আমার শাশুড়িও আমাদের বিয়ে মেনে নেন নি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি একজন আটপৌরে, সাদাসিধে, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়– এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারি না। আপনার মত আমার স্ত্রীকে সারাজীবনের জন্যে ঘরের মধ্যে দাসী করে রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী নিজেকে পর্দায় ঢেকে যবুথবু হয়ে রাস্তায় বেরোবে এটা আমি কল্পনাও করি না। আমি চাই আমার স্ত্রী হবে আমার জীবনের চলার পথের সঙ্গিনী। প্রতি বছর একটা বাচ্চা দেয়াই তার কাজ নয়। আজকের দিনে মহিলারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তারা পুরুষের মতই সমান অধিকার ভোগ করছে এবং সকল ক্ষেত্রে অংশ নিচ্ছে। আমার স্ত্রী অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রি নিয়েছে। তাকে আমি যত ভালোবাসি, এতটা আর কাউকে কোনদিন বাসিনি। সে অত্যন্ত সুন্দরী এবং চমৎকার একটি মেয়ে। শিগগিরই তার সাথে আপনার দেখা হবে। সে বর্তমানে সন্তান সম্ভবা। এ জন্যে তাকে খুব তাড়াতাড়িই হাসপাতালে পাঠাতে হবে..........

আহমদ খলিলের দৃষ্টি কঠোর হয়ে ওঠে–

ঃ তুমি আমার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিয়ে করেছ, এমনকি বিয়ের সময় আমাকে জানাওনি পর্যন্ত। সুতরাং তাকে দেখার ইচ্ছে আমার নেই। আমি জানি এসব মেয়েরা কেমন হয়। তো, তুমি তাকে হাসাপাতালে পাঠাবে কেন?

ঃ আদিম ব্যবস্থায় এবং অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে আমার সন্তানদের জন্ম হোক, আমি তা চাই না। আমি সুপরিকল্পিতভাবে জীবন-যাপন করতে চাই। সে কারণেই দু'টি–– খুব বেশি হলে তিনটির বেশি সন্তান আমার প্রয়োজন নেই। আমি তাদের সুষ্ঠুভাবে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করতে চাই। আপনার মত আটটি সন্তানের মধ্যে সাতটিকেই আমি হারাতে চাইনা।

আহমদ খলিল গর্জে ওঠে–

ঃ চুপ কর! তোমার এত বড় স্পর্ধা যে আমার মৃত সন্তানদের সাথে আমাকে জড়িয়ে কথা বলতেও তোমার বাধে না? সন্তান দেবার মালিক আল্লাহ্, তাদের নিয়ে যাবার মালিকও তিনিই। তুমি তা নিয়ে কথা বলার কে?

ঃ আমি সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি এ ব্যাপারে আপনার সঠিক জ্ঞানের অভাব ছিল। যাই হোক, আপনি আমার সাথে দাহরান চলুন। এরা তো মাত্র তিনদিন সময় দিয়েছে জায়গা ত্যাগ করতে। এটা খুবই ভালো যে, এই নোংরা ঘর-বাড়িগুলো ভেঙ্গেচুরে শহরটাকে নতুন করে গড়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এটা আরো ভালো এ জন্যে যে এখন আপনি বাস্তব অবস্থাটা এবং আজকের দুনিয়া সম্পর্কেও কিছুটা বুঝতে পারবেন। আসলে এ কারণেই আমি এতদূর থেকে ছুটে এসেছি। আপনি এবং মা আমার সাথে চলুন। জীবনের শেষ ক'টি দিন একটু আরাম করুন। রশিদ চাচা এবং মনসুর দাদার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব বহন করতে পারবে।

এখান থেকে উৎখাতের পর ইসমাইল ছিল আহমদ খলিলের শেষ ভরসা। কিন্তু এখন তার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় তার কাছে একটি দিন কাটানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার আরো মনে হয়, ইসমাইলের কাছে যাওয়ার চাইতে রাস্তায় দিন কাটানোও অনেক ভালো। কিন্তু কথাটা ইসমাইলকে বলতে কষ্ট হয় তার–

ঃ আচ্ছা, রফিক তোমার সাথে বাড়ি এল না কেন?

ইসমাইল মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। বলে–

ঃ সে কাজে খুবই ব্যস্ত। বাড়ি আসার মত তার সময় নেই।

ঃ ইসমাইল, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমি গত তিন মাস যাবত তার কাছ থেকে কোন চিঠি পাই না। অথচ সে প্রতি সপ্তাহেই আমার কাছে চিঠি লিখত। তুমি জান, তার আব্বা-মা নেই। সেই ছোট বেলা থেকেই তাকে আমি চোখে চোখে রেখেছি। তার শেষ চিঠিতে মনে হয়েছিল–সে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। আমি চাই, তুমি সত্য কথা বল।

ইসমাইলের দৃষ্টি আবার মেঝের দিকে নেমে আসে। সে নিজেকে সংবরণের চেষ্টা করে। পরে বলে–

ঃ আব্বা, আপনি কি জানেন না সে মারা গেছে?

হঠাৎ করে কাশির দমকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আহমদ খলিল। একটুখানি সামলে নেবার পরই সে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে–

ঃ রফিক মৃত? এ কথা এতদিন জানাও নি কেন?

ঃ রফিক ব্লেড দিয়ে তার কব্জির রগ কেটে ফেলেছিল। আমি ঘরে এসে দেখি, একতাল রক্তের মধ্যে সে পড়ে আছে। সাথে সাথে ডাক্তার ডেকে পাঠাই। কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার আগেই সে মারা যায়। আব্বা! বিশ্বাস করুন, তার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই।

আহমদ খলিলের কণ্ঠে যেন বজ্রের আওয়াজ শোনা যায়–

ঃ ইসমাইল, আমার দিকে তাকাও। সত্য কথা বল, কি হয়েছিল?

আহমদ খলিলের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যা চমকে দেয় ইসমাইলকে। সে কম্পিত গলায় বলে–

ঃ আমাদের কোম্পানী নতুন এয়ারকন্ডিশন্ড অফিসের জন্যে প্রধান হিসাব রক্ষকের সহকারী পদে একজন মাত্র লোক চেয়েছিল। হয় রফিক অথবা আমি। আমি জানতাম, এ চাকুরি সে করতে পারবে না। সে যোগ্যতা তার ছিল না। তাকে বাদ দিয়ে আমিই চাকরিটি নেই।

আহমদ খলিল এসে ইসমাইলের কাঁধ চেপে ধরে। কান্না ভেজা গলায় সে বলে–

ঃ তুমি তোমার আপন চাচাতো ভাই, আপন রক্তের লোকের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছ। এটা কি করে পারলে তুমি?

ঃ আব্বা, আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, আমি খারাপ কিছু করিনি।

ঃ হায় খোদা! তুমি তো অন্য একটা চাকরি খুঁজে নিতে পারতে। ইসমাইল, তুমি যা করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। তুমি দিন-রাত নামাজ পড়, আল্লাহ্র কাছে তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও। হয়ত আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ঃ না আব্বা। আমি তা করব না। লোকে ব্যাপারটা জানুক, চাই না। এ সামান্য ঘটনার জন্যে আমার চাকুরি, খ্যাতি, নতুন বাসা, স্ত্রী, আগত সন্তান সব কিছু হারাবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। আমি পারিনা আমার ভবিষ্যত আশা ও স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিতে। আপনি বুঝবেন না যে একটা ভালো চাকুরির জন্যে লোকে কি করে। আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনি আমাদের ঠিকমত খেতে দিতে পারেন নি? আমার মনে আছে, কত রাত আমি না খেয়ে থেকে ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদেছি। এই অভাবের জন্যেই আজ আমার জীবন এরকম হয়ে গেছে।

ঃ ইসমাইল, কৃতজ্ঞতা বলতে তোমার কিছুই নেই। আমার যা ছিল তার সবই তোমাকে দিয়েছি। তোমার পিতা হিসেবে আমার আর কি করার ছিল? তুমি কি মনে কর যে তুমি আল্লাহ্ এবং তার বিধি বিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছ? এই জীবনই যে সব নয় এবং একদিন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, তা কি ভুলে গেছ? আল্লাহর ইচ্ছাতেই তুমি জীবিত রয়েছ। তিনি যে কোন মুহূর্তে তোমার জীবন নিয়ে নিতে পারেন। কিয়ামতের দিন অবশ্যই সকল কৃতকর্মের জন্যে তোমাকে জবাব দিতে হবে।

ইসমাইল আড়ষ্টভাবে হাসে। বলে–

ঃ আমি সে জন্যে একটুও ভীত নই। আমি যুবক। আমার সামনে এখনও বহু সময় পড়ে আছে।

আহমদ খলিল শান্ত স্বরে বলে–

ঃ আমি মুসলমান। একজন মুসলমান খারাপ সব কিছুকেই ভয় করে। তুমি আল্লাহর কাছে তার রহমত ভিক্ষা চাও। নইলে মৃত্যুর চেয়েও তোমার খারাপ কিছু ঘটতে পারে।

ইসমাইল অস্থিরভাবে তার টাই ঠিক করে। বলে–

ঃ আব্বা, আমাকে এখন যেতে হবে। আর দেরি হলে শেষ বাসটাও পাব না আমি।

সহসা আহমদ খলিল অপরিসীম শক্তিতে ইসমাইলের দু'টি কাঁধ চেপে ধরে–

ঃ না, তোমার আর জেদ্দা যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঃ আব্বা, আমাকে যেতে দিন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ইসমাইল আহমদ খলিলের কাছ থেকে ছোটার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়।

আহমদ খলিল গম্ভীর কণ্ঠে বলে–

ঃ ইসমাইল, আমার চোখের দিকে তাকাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তার আব্বার গভীর কালো, বিশাল চোখ দু'টির দিকে তাকায়। সে চোখে ভিন্ন এক দ্যুতির খেলা লক্ষ্য করে সে।

ঃ আব্বা, আমাকে যেতে দিন, সময় চলে যাচ্ছে।

আহমদ খলিলের কাছ থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ইসমাইল। স্যুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আহমদ খলিল তার পিছন পিছন দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কিন্তু ইসমাইল একবারের জন্যেও ফিরে তাকায় না।

আবার একদফা কাশি ওঠে। আহমদ খলিল দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। আসমা এগিয়ে যায়। তাকে ধরে এনে শুইয়ে দেয় বিছানায়। রশিদ আহমদ খলিলের কপালে হাত রাখে। প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করে সে। তাড়াতাড়ি একটি লেপ দিয়ে তার শরীর ঢেকে দেয়।

জ্বরে আহমদ খলিলের গলা শুকিয়ে গেছে। রশিদ তাকে একটু পানি খাইয়ে দেয়। সে আবার শুয়ে পড়ে। কথা বলতে কিংবা নড়াচড়া করতে খুব কষ্ট হয় তার।

আসমা, রশিদ, আবদুর রাজিক আহমদ খলিলকে ঘিরে বসে আছে। চোখ খুলে তাদের দেখতে পায় সে। তার হঠাৎ মনে হয়, সে ফিরে গেছে ইরাক আল-মানশিয়ায়। নানাকে দেখতে পায় সে। একদল তরুণের সাথে কথা বলছেন তিনি। ইউসুফ মালিক মাঠে কাজ করছেন। তার নিজের ঘরটি আবার মেরামত করা হয়েছে, নতুন সাদা রং দেয়া হয়েছে তাতে। যেন একটি শ্বেত কপোতের নীড়। ছোট খলিফা এবং আবদুল আজিজ বাড়ির আঙ্গিনায় খেলা করছে। আহমদ খলিল ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তার মা খাদিজাকে দেখতে পায়। তাঁতে কাপড় বুনছেন তিনি। তার দিকে চেয়ে হাসেন খাদিজা। এত সুন্দর হাসি আর দেখেনি সে। ঘর থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে যায় আহমদ খলিল। যতদূর চোখ যায়— মাঠের পর মাঠ জোড়া ফসল আর ফসল— বাতাসে পেকে ওঠা গমের শীষগুলো দোল খাচ্ছে, যেন বিশাল এক প্রান্তরের উপর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ সোনালি চাদর এবং তা ঢেউ খেলে চলেছে বাতাসে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে আহমদ খলিল–

ঃ এ কি? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? আবদুর রাজিক। তুমি কোথায়? আমার চোখে সব অন্ধকার কেন?

ঃ এই তো, আমি আপনার পাশেই বসে রয়েছি আব্বা। কি হয়েছে আপনার? এমন করছেন কেন? আবদুর রাজিক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে।

ঃ তুমি পবিত্র কুরআনের শেষ দু'টি সূরা আমাকে পড়ে শোনাও– যাতে আশ্রয় ও নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। তোমার ব্রেইলী কুরআন শরীফটি কি সাথে করে নিয়ে এসেছ? জলদি করে পড়।

ঃ জ্বি না, আমি তা কায়রোতে রেখে এসেছি। তবে তার দরকারও নেই। সূরা দু'টি আমার মুখস্ত।

আবদুর রাজিক তিলাওয়াত করে ––

"বল, আমি স্মরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে
অনিষ্ট হতে রাত্রির যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়
এবং সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে ঃ

ঃ থেম না, থেম না বেটা। শেষ সূরাটিও আমাকে পড়ে শোনাও। আমি আতংকগ্রস্ত। আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি–আহমদ খলিলের গলায় অসীম আকুতি ঝরে পড়ে।

আবদুর রাজিক তিলাওয়াত করে যায়–

"বল, আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,
মানুষের অধিপতির,
মানুষের ইলাহের কাছে।
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
জ্বিন কিংবা মানুষের মধ্য হতে।

ফিলিস্তিনের আকাশ

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

গল্প গ্রন্থ

সকালের প্রতীক্ষা (১৯৯৪)

গবেষণা/প্রবন্ধ গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা (২০০০, দ্বি. স. ২০০৩)
বাঙালি মুসলিম আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ (২০০৫)

সম্পাদিত গ্রন্থ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৯৬, দ্বি. স. ২০০৩)
ছোটদের শহীদ জিয়া (২০০৪)
সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী (২০০৪) (যৌথ)
শেখ ফজলল করিম রচনাবলী (২০০৪) (যৌথ)

সংকলিত গ্রন্থ

ভাষা থেকে স্বাধীনতা (২০০৪)
কলম ও কালির মানুষ-প্রথম খণ্ড (২০০৪)
কলম ও কালির মানুষ-দ্বিতীয় খণ্ড (২০০৪)
ঈদঃ আনন্দের উৎসব ত্যাগের শিক্ষা (২০০৪)